"ভক্তি"

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

No..............
Date..............
CALCUTTA

২৭শ বর্ষ

(১৩৩৫ ভাদ্র হইতে ১৩৩৬ শ্রাবণ)

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

মাসিলা ভক্তি-নিকেতন
পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী জেলা—হাওড়া

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৹
নমুনা প্রতিখণ্ড ৵৹ আনা

ভক্তি ২৭শ বর্ষের সূচীপত্র

নববর্ষে মঙ্গলাচরণ—প্রাচীন ১

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম—ডাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চন্দ্র ২

কৃপাসিন্ধু দাস—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৩

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত—ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ ১৬, ৬৭, ১২৭, ১৮৭, ২৫০, ২৮৩, ৩১৯, ৩৬৫

দণ্ডপ্রসাদ—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী বি-এল ২১

বৈষ্ণবধর্ম্মের অবস্থা—ভবঘুরে ২৯ ১০৯, ১৭১, ২০., ৩৫৬

বটক্ষীর—শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর কবিরাজ ৩৩,

নিবেদন—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট ৩৬

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য— ৪১, ৭৫, ১১৪, ১১৬, ১৫১, ১৮১, ২৪৭, ২৭৮, ৩১৩, ৩৪৬, ৩৮১, ৪১১

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা— ৪৫, ৩১৫

গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কথা— ৪৮, ১২০

কোথা যাব ?—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯

জ্ঞানাভিমান শূন্যতা—শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায় বি, এ, ৫১,

ধর্ম্মপত্রিকার উদ্দেশ্য—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দেব ৫৩

হিমালয় গমন বা কেদার বদরী ভ্রমণ কাহিনী—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট ৫৫, ১০১

বৈরাগ্যের প্রবোধ—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা ৬১

সঙ্কলন— ৭৮, ১৪৬

শোকসংবাদ— ৭৯, ৩৪৯

স্বাভিষ্ট—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক ৮১

ভক্তি সাধনে আনন্দ—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২

শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা ৮৬

বলিদান—শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫

এস মা—শ্রীযুক্ত সোমনাথ সেন ৯৭

কুটস্থ কৈলাস—শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায় বি,এ ৯৯

আত্মনিবেদন—শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার পাল ১১০
প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা— ১১৩, ২১৫, ৩৪৪, ৩৮০
শোকোচ্ছ্বাস—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামী ১১৫
গৌরলীলাগীতিকাব্যের আলোচনা—
ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ, এম, বি ১১৭
প্রার্থনা— ১২১, ২৮১, ৩৫০
ব্রহ্ম হরিদাস আবাহন—শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস ১২৩
সত্যের শিক্ষা—শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায়, বি,এ, ১২৪
নিতাই আমার অকূলের বন্ধু—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় ১২৬
কৃতজ্ঞতা—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা ১৩৫
সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদন—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র অধিকারী ১৫৪
নিতাই গুণ—শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী ১৫৪
পাঁচালী কাব্যে ভক্তিরসের উপকরণ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি, এ, ১৫৫
ভারতে সভ্যতার চরম অবস্থা—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬০
শ্যাম-শ্যামাদর্শনে—শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক ১৬৯
প্রশ্নোত্তর—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন ১৭৬
প্রতিধ্বনি—বসুমতি হইতে ১৮০
আদনের পথে—শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী ১৮৫
তীর্থচিন্তা—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা ১৯৪, ২১৮, ২৬৩, ৩০১
ভ্রম—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯
বিশ্বহিতে অন্ধপ্রেম—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৭
শুধিতেছে ধার—শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২১৪
একবার এস দয়াময়—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৭
সংসারের সুখ—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা ২১৫
নূতন মানুষ—সম্পাদক ২৩৩
শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর বংশাবলী—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট ২৩৭
শ্রীরাসলীলার কণাভাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় ২৪০
কে নবীন সন্ন্যাসী—শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার রায় বিদ্যাবিনোদ ২৪৬
ভ্রম সংশোধন—সম্পাদক ২৪৭
শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব—প্রাচীন ২৪৯

গৌর—শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ চৌধুরী ২৬২
দীনশরণ—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
আধুনিক সাহিত্যে ভগবদ্ভক্তির উপকরণ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি,এ, ২৭০
প্রতীক্ষা—শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২৭৮
প্রাণের কথা—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮২
মায়া—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ দাস— ২৯৪
ভারতী স্মৃতি—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৫
শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম—শ্রীযুক্ত অমূল্যানন্দ রায় ভট্ট ৩০৭
সময়—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ ৩০৯
শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী—শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী ৩১০
আর কবে ডাকিব তোমায়—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৮
শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণ গৌরাঙ্গ—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় ৩২০
ভক্তসুরেশ—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা ৩২৯
অনন্তভক্তি—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী ৩৩৫
আরাধনা— ৩৪২
নির্ভর—শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫২
বংশীধারা—শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৩
একটী গান—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫[illegible]
গৃহী বৈষ্ণব সমস্যা—শ্রীযুক্ত হরমোহন দাস ৩৬১
হরিদ্রা—শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর কবিরাজ ৩৭৭
অচিন্—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৮২
বর্ষশেষে দু'টো কথা—সম্পাদক ৩৮৩
ব্রজবালার কৃষ্ণ সাধন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ৩৮৫
গৌরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ ৩৯৪
গান—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪০২
বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা সম্বন্ধে পত্র—শ্রীযুক্ত সদানন্দ শর্ম্মা ৪০৩
শ্রীশ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ৪০৬

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভাদ্র
১৩৩৫

নববর্ষে মঙ্গলাচরণ

(প্রাচীন)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দম্ ॥"
"ত্যক্ত্বা সুদুস্তজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দম্ ॥"
"বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল বেশম্ ॥"

— o —

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম

(ডাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চন্দ্র লিখিত

(আজি) আনন্দে মগন পুর নারীগণ
গোপবৃন্দসনে নন্দভবনে ।
গোপরাজ নন্দ করিছে আনন্দ
পেয়ে চিদানন্দ-নন্দনে ॥
ছিল এতকাল নীরব রজনী,
গোকুল চন্দ্রমা উদিল যখনি,
যতেক রমণী করে শঙ্খ-ধ্বনি
প্রতিধ্বনি তার উঠেরে গগনে ॥
গভীর নিশীথে নিদ্রিত যে ছিল
কৃষ্ণ-চন্দ্রোদয়ে সকলে জাগিল
(বলে) কে দেখিবে চল সে নিলকমল
নন্দালয় আলো ক'রেছে কেমন ॥
এ শুভ সংবাদ শুনিল যখনি
যুবতীর দল ছুটিয়া তখনি
জয় জয় রবে পুত্র ঘেরে সবে
মাতিল মধুর মঙ্গল কীর্ত্তনে ॥
মাতা যশোমতি পুত্রপেয়ে কোলে
করেন চুম্বন বদন কমলে
বাৎসল্যের ভরে স্তনে ক্ষীর ঝরে
(তাহা) অখিলের পতি ধরেন-বদনে ॥

ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্লেশ নাহিক বেদন
পুত্র মুখ-পদ্ম করি নিরীক্ষণ
সকৌতুকে শিশু   হাসেরে যখন
(মায়ের)   আনন্দের সীমা থাকেনা প্রাণে ॥
ছন্ন ভাবে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কত যে আসিল দিব্য কলেবর
হ'ল সুর নরে   গন্ধর্ব্ব কিন্নরে
মধুর মিলন মধুময় ক্ষণে ॥
ত্রিভুবন ভরি উঠিল উল্লাস
ভূলোকে গোলক হইল প্রকাশ
"জয় পীতবাস"   "জয় পীতবাস"
আকাশ ভরিল জয় জয় গানে ॥

—*—

কৃপাসিন্ধু দাস

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহোদয় লিখিত।)

হাসির কথা, হাসির কথা, হাসির কথা,—"ভগবান্ আবার বাক্য মনের অগোচর!" হইতে পারে—কামনা-কিঙ্কর কর্ম্মসহচরের তিনি মনোবচনের অগোচর, কিন্তু যাহার প্রাণ জীবের প্রতি দয়ায় বিগলিত,—আর্ত্তের আর্ত্তি-নাশন—ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-নিবারণ এবং বিপন্নের বিপদ বিমোচনের জন্যই যাহার ধন-প্রাণ সর্ব্বদা বিনিযুক্ত, ভগবান্ তাহার দূরে নন্,—দ্বারে—আর্ত্ত অতিথিরূপে নিয়ত বর্ত্তমান।

যতই তুমি সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত করিয়া নন্দনকাননের কুঞ্জে কুঞ্জে পারিজাত সৌরভ উপভোগ করিবার জন্য—স্বর্গরমণীর সুখদ সঙ্গের জন্য

কর্ম্মমার্গ ধরিয়া অগ্রসর হইবে, জানিও—ততই ভগবান্ তোমার বাক্য ও মনের অতীত হইতে থাকিবেন! আর যতই তুমি বিলাসবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে, জানিও ততই ভগবান্ তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবেন। আত্মসুখের বাসনায় ভগবানের মুখ দেখা যায় না, পরের সুখের বাসনার ভিতরেই ভগবানের মুখ ফুটিয়া উঠে। দীনের দুঃখ দূর করিবার জন্য তুমি একপদ অগ্রসর হও, ভগবান্ তোমার দিকে শত পদ অগ্রসর হইবেন। আর্ত্তের আর্ত্তি দর্শনে তুমি অশ্রু-বর্ষণ করিলে ভগবান্ কমলার অঞ্চল লইয়া সেই অশ্রু মুছাইয়া দিবেন। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ করিলে তো কথাই নাই,তিনি ক্ষুধার্ত্ত অতিথিবেশে তোমার আবাসে আসিয়া তোমার সকল ক্ষুধার চির-নিবৃত্তি করিয়া দিবেন। দাতার অগ্রগণ্য কৃপাসিন্ধু দাসের চরিত্র আলোচনা কর, এ কথায় আর অবিশ্বাস থাকিবে না।

উৎকলদেশের পশ্চিম প্রান্তে লীলাবতীপুর। কৃপাসিন্ধু দাসের নিবাস সেই গ্রামে। ব্রাহ্মণ জাতি। তিনটী পুত্র দুইটি কন্যা। সকলেই সুন্দর, সকলেই গুণধর। স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধাবতী। তাঁহার চরিত্র অতি বিচিত্র। অমন পতিভক্তি ভুবনে দেখা যায় না। পতি ব্যতীত অপর দেবতাই তিনি জানিতেন না—পূজিতেনও না। আর জীবে দয়াই বা কত? এ বিষয়ে তিনি পতির সহিত একসমান। কৃপাসিন্ধু দাস নামেও কৃপাসিন্ধু গুণেও কৃপাসিন্ধু। সকলকেই তিনি আপনার মত ভালবাসিতেন,—সকলের সুখ-দুঃখ নিজের মতই মনে করিতেন। একদিকে ভগবৎপ্রেমে তাঁহার নয়ন নিত্য অশ্রুবর্ষণ করিত, অপর দিকে জীবের দুঃখেও তাঁহার নেত্রে অশ্রুধারার প্রবাহ বহিত। পত্নী যেমন তাঁহাকেই দেবতারূপে ভজনা করিতেন, তিনিও তেমনি শ্রীভগবান্ নারায়ণকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা-রূপে ভজনা করিতেন। তা বলিয়া কি অপর দেবতায় অবজ্ঞা করিতেন?

না না—তা নয়, তাঁহাদেরও তিনি ইষ্টদেবতার পরিকররূপে পূজা করিতেন। পতি যেমন এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না, ইষ্টদেবতাও সেইরূপ এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না। পতিব্রতা যেমন শ্বশুর শ্বাশুড়ীরও সেবা-পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু পতির সম্বন্ধ ধরিয়া। নৈষ্ঠিক সাধকেরও ধরণ সেইরূপ; তাঁহার আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধ ধরিয়াই তিনি অপরের আরাধনা করিয়া থাকেন। পৃথক দেবতারূপে নহে। কৃপাসিন্ধু দাস একজন নৈষ্ঠিক বিষ্ণু-ভক্ত। অপর দেবতার অবজ্ঞা করা কি, তিনি তাঁহার দেবতা বিষ্ণুকে জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট দেখিয়া—সকলকেই পূজা করিতেন—সকলের প্রতিই প্রীতি প্রকাশ করিতেন। মুখেও বলিতেন—শরীরধারি-মাত্রেই শ্রীহরির শ্রীমন্দির। কৃপাসিন্ধু দাস এই মন্দিরে মন্দিরে মদনমোহন বিরাজ মান দেখিতেন।

কৃপাসিন্ধু দাস শুধু ভক্ত নন, ধনবান্‌ও বটেন। কিন্তু বিলাস-ব্যসনে এ অর্থের এক কপর্দ্দকও ব্যয়িত হইত না। সে দেশে এমন কোন সৎকর্ম্ম ছিল না, যাহার মূলে কৃপাসিন্ধু দাসের অর্থ অধিক মাত্রায় বা সম্পূর্ণ মাত্রায় না থাকিত। কিন্তু কালের কি খেলা বলা যায় না, এই মুক্তহস্ত মহাত্মার সকল অর্থই ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। একে একে পুত্র-কন্যাগুলিও অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট রহিলেন মাত্র সাধ্বী শ্রদ্ধাদেবী, আর স্বয়ং কৃপাসিন্ধু দাস।

তাঁহারা কি এ অবস্থায় দুঃখিত বা চিন্তিত হইলেন না? হাঁ, হইলেন বই কি, কিন্তু সে দুঃখ বা চিন্তায় তাঁহাদিগকে অণুমাত্রও কাতর করিতে পারিল না। কেননা, জগদ্বাসীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদের যে বিপুল দুঃখ, সেই দুঃখ তাঁহাদের এ সামান্য দুঃখকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বড়র স্বভাবই সে ছোটকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লয়; বড় আওয়াজ ছোট আওয়াজকে আপনার মধ্যে লয় পাওয়াইয়া দেয়; তাই সকলের দুঃখ

ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনার—ভিতর তাঁহাদের নিজের দুঃখ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারা হইয়া গেল।

এখন তাঁহাদের একমাত্র দুঃখ বা চিন্তা,—তাই তো, যদি এই সময় দ্বারে কোন বিপন্ন ব্যক্তি বা ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে কি করিয়া তাঁহাদের বিপদ বা ক্ষুধা দূর করিব? হায়! হায়! অমুক দেশে আজ জলপ্লাবন, অমুক দেশে আজ দুর্ভিক্ষ, অমুকের আজ গৃহদাহ হইয়াছে, অমুক আজ ঔষধ অভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে, অমুকের আজ কন্যাদায়, অমুকের আজ ঋণের দায়, হায় হায় আরতো কাহাকেও কিছু সাহায্য করা কিংবা কাহারও কোন অভাব মোচন করা আমাদের দ্বারা হইবে না?

পতি-পত্নী নিজের বিষয় একটুও না ভাবিয়া কেবল এইরূপ ভাবনাই ভাবেন, আর দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ করেন। এ অশ্রুর কি যে অপার মহিমা বলা যায় না। তাহার অণুপরমাণুও যেন শান্তিময় ভগবানে ভরা। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে ভাসিয়া উঠেন—আর তাঁহারা তাঁহাকে লইয়াই সকল ভুলিয়া যান। দুঃখ কষ্ট আর তখন কিছুই থাকে না। থাকে কেবল—আনন্দ।

বলি, হাঁ ঠাকুর, সহস্রমুখ দুঃখ রূপ শেষ সর্পই কি এই অশ্রুর সাগরে ভাসমান, আর তাহারই উপর কমলা-সেবিত তুমি সুখ-শয়ান? এই অশ্রু—এই দুঃখের ভিতরেই কি সুখময়—ঐশ্বর্য্যময় তোমার স্থির মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়? হায়! হায়! দুঃখের ভিতর সুখের বাসা,—কান্নার মাঝে হাসির বাসা, সন্তাপের ক্রোড়ে শান্তির বাসা, বিষের মধ্যে অমৃতের বাসা এ মায়ারহস্যের উচ্ছেদ কে করিবে?

পতি-পত্নীর দৈব-পীড়নের আর অন্ত নাই; পুত্র গিয়াছে, কন্যা গিয়াছে, বিষয় গিয়াছে, বৈভব গিয়াছে, ঋণের দায়ে মাণ্ডও গিয়াছে। পতিব্রতার

অলঙ্কার গিয়াছে, গৃহের আসবাব পত্র বাসন-কোশন সকলই গিয়াছে, পুরাতন বস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। পাওনাদার আসিয়া বাড়ীর ঘর দ্বার সকলই দখল করিয়া বসিয়া আছে। সামান্য বাড়ী ঘর যাহা অবশিষ্ট ছিল অনলদেব তাহাকেও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ত্যক্ত রন্ধন-শালাটুকুই এখন পতিপত্নীর একমাত্র থাকিবার স্থান। এমন কিছু অর্থও নাই যে, আর এক বেলা আহার চলে। শ্রদ্ধাদেবী এইবার যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আজ তিনি নিজে না খাইয়া পতির অজ্ঞাতসারে পতিকেই পরিতোষপূর্ব্বক অন্ন আহার করাইয়াছেন; কিন্তু কল্য কি হইবে? উপবাস করিয়া নিজেই বা তিনি কয়দিন থাকিতে পারিবেন? কাজেই তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া স্বামীর নিকট দুইটা কথা বলিতে হইল। বেশী কথা বলা তাঁহার স্বভাবও নয়, বলিতেও বড় বেশী পারিলেন না, কেবল বলিলেন, নাথ! অবস্থা তো সকলই দেখিতেছেন, বুঝিতেওছেন, এখন উপায়? ভিক্ষা করিতে তো পথের বাহির হইতে পারি না, নচেৎ উপায় না থাকিয়াও ছিল।

কৃপাসিন্ধু দাস এত বিপদেও স্থির—ধীর। পত্নীর কথা শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন—

"আস্তু অদৃষ্টে অছি যাহা।
অবশ্য ভূঞ্জিব না তাহা?"

আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাতো অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে? তা আর চিন্তা করিয়া কি হইবে বল? উপায় সেই শ্রীহরির কৃপায়। তিনি কৃপা করিয়া অন্ন দেন, আহার করিব, নচেৎ উপবাসী-ই থাকিব।

পতিব্রতা পতির কথায় সামান্য একটু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—কথা প্রকৃত বটে, কিন্তু প্রাণতো অন্নগত, অন্নবিনা প্রাণ কয়দিন থাকিবে? আর নিজেরা না হয় উপবাসই করিলাম, কিন্তু এ অবস্থায় অভুক্ত অতিথি

আসিলে উপায়? তাঁহাকে তো আর উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া যায় না?

এইবার কৃপাসিন্ধু দাস যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবেন, জীবন থাকিতে তা-ও-কি হয়? তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া পত্নীকে বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, আমার সাঙ্গাতের বাড়ী গিয়া তোমার সইএর নিকট হইতে সের পাঁচেক মাণ্ডুয়ার আটা ধার লইয়া আইস। তাহাতে দশখানি রুটি প্রস্তুত কর; তাহার মধ্যে আমি পাঁচ খানি লইয়া একবার নীলাচলে যাইব, নীলাচলে আমার একজন খাতক আছে, তাহার অবস্থা এখন ভাল, কিছু পাওনাও আছে। তাহাই সাধিয়া লইয়া আসি, অনেক দিন চলিয়া যাইবে এখন। যাইতে-আসিতে আমার পাঁচ দিন বিলম্ব হইবে। এই পাঁচখানি রুটীতেই আমার যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্ট পাঁচখানি তোমার আহারের জন্য রাখিয়া দাও। তারপর শ্রীনারায়ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

শ্রদ্ধাদেবী শ্রীহরি-স্মরণ করিয়া সই এর নিকটে যাইয়া অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়া পাঁচসের আটা ধার লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু আজ তাঁহার কোন কর্ম্মে উৎসাহ নাই,—মনেও একটুকু শান্তি নাই। কেননা, নানা দৈব-নির্য্যাতনের ভিতরেও তাঁহার এক মহাশান্তি ছিল,—প্রত্যক্ষ দেবতা পতির পাদপদ্ম হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। আজ সেই পতি সুদূর বিদেশে যাইতেছেন। এ বিচ্ছেদ—অসহ্য—অসহ্য।

তিনি সেই মাণ্ডুয়ার আটা পতির পদপ্রান্তে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কথা আর কিছুই নয়,—স্বামী বিদেশে গমন করিলে একা এ অবস্থায় থাকিবেন কি প্রকারে? শোকসন্তপ্ত অন্তরকেই বা কি দিয়া শান্ত করিবেন?

কৃপাসিন্ধু দাস তাঁহাকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া শুঝাইয়া বলিলেন,—

"কিপাঁ তু হেউছ্ছু বিকল।
সবুরি প্রভু আদি মূল ॥
সমস্ত জীবর কারেণি।
অশেষ জন চিন্তামণি ॥
সবুরি দুঃখ সুখ যেতে।
সে সিনা বুঝুচ্ছন্তি নিত্যে ?
সকল ঘটে অচ্ছন্তি পূরি।
সবুরি কর্ম্মরজ্জু ধরি ॥
সংসার করে আত-জাত।
সবু এ তাহাঙ্ক আয়ত্ত ॥
সে প্রভু অচ্ছন্তি আন্তর।
তো মনে সংশয় ন কর ॥"

সতি! তুমি অত চিন্তিত হইতেছ কেন? আমাদের সেই প্রভু নারায়ণকে কি তুমি জান না? তিনি সকলেরই আদি মূল—সকল জীবেরই কারণ। চিন্তামণির মত সকলের সকল বাঞ্ছিতই তিনি পূরণ করিয়া থাকেন। সকলের সুখ-দুঃখ সমস্ত তিনিই নিত্য বুঝিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে কর্ম্মরজ্জু ধরিয়া বসিয়া আছেন। এ সংসারের আসা বল আর যাওয়াই বল, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত। আমাদের সেই সর্ব্বসমর্থ প্রভু আছেন, ভাবনা কিসের? যাও—সংশয় ছাড়িয়া সত্বর এই আটাগুলিতে কিঞ্চিত লবণ মিশাইয়া দশখানি রুটী প্রস্তুত কর।

পতিব্রতা পতির সকল কথাই শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার মনকে তিনি এ উপদেশ দিয়া শান্ত করিতে পারিলেন না। অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি পতির আদেশের অনুরূপ দশখানি মোটা মোটা রুটী তৈয়ারী করিলেন। এমন সময় কৃপাসিন্ধু দাস যেন আচম্বিতে কাহার করুণ কণ্ঠস্বর

শুনিতে পাইলেন। মনে হইল,—তাই তো, অতিথি কি? হইতেও পারে? ভাল, একবার দেখিয়াই আসি না কেন? তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখেন, সত্যই ত, অতিথিই ত বটে? ওঃ এযে বেজায় বুড়া! হাড় জির জির কচ্ছে, বুড়ার হাড় এক একখানি গোণা যাচ্ছে, পেটের মাংস পিঠে গিয়ে ঠেকেছে! আহা আহা, ভারি ক্ষুধা পেয়েছে বোধ হয়, মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইতেছে না; দাঁড়াইতেও পা দুইটী থরথর কাঁপিতেছে। কিন্তু তেজ যেন সর্ব্ব শরীর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কি সুন্দর বৈষ্ণব মূর্ত্তি! বোধ হয় কোন মহাপুরুষই হইবেন। "ঠাকুর গো! প্রণাম—অধমের প্রতি কি আদেশ"—বলিয়া কৃপাসিন্ধু দাস অতিথির চরণতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ক্ষীণাতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—বাপু হে, তোমারই নাম কৃপাসিন্ধু দাস? উত্তরে কৃতাঞ্জলিপুটে আনতমস্তকে কৃপাসিন্ধু বলিলেন,—"আজ্ঞে, দাসেরই নাম।" অতিথি বলিলেন,—বেশ বাপু বেশ, তা তোমার যশের মূর্ত্তিই এতদিন দেখিয়া আসিতেছি, একবার এ মূর্ত্তিখানা দেখিবার প্রবল বাসনা ছিল; বিধাতার ইচ্ছায় তাহাও হইয়া গেল। আমি ঘটনাচক্রে এদেশে আসিয়া পড়িয়াছি, তিন দিন জলবিন্দুও উদরস্থ হয় নাই, কিছু খাইতে দিতে পার কি?

কৃপাসিন্ধু দাস বিনীত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—ঠাকুর! আপনাকে আহার দিই এমন ভাগ্য আমার কোথায়? তবে আপনি দয়া করিয়া এইখানে একটু অপেক্ষা করুন শ্রীনারায়ণ যাহা জুটাইয়া দেন তাহাই দিতে পারিব। এই বলিয়া তিনি অতিথির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পত্নীর নিকট আগমন করিলেন এবং অতিথির অবস্থা সমস্তই বিশেষ করিয়া বলিলেন। ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক, উপযুক্ত অতিথির আগমনবার্ত্তায় শ্রদ্ধাদেবীরও আনন্দ হইল। তিনি হর্ষ-গদ-গদ স্বরে স্বামীকে বলিলেন,—তার আর কি, আমার ভাগের ত পাঁচখানি রুটি আছে, তাহা দিয়াই অতিথি-

সৎকার করা হউক। পাঁচটা দিন আমি উপবাস করিয়াই কাটাইয়া দিব। তারপর ত তুমি আসিবে, তজ্জন্য চিন্তা কি?

সহধর্ম্মিণীর বাক্য শুনিয়া কৃপাসিন্ধু দাসের আনন্দ আর ধরে না। তিনি শতমুখে সতীর প্রশংসা করিয়া অতিথির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে আদর করিয়া রন্ধনশালায় লইয়া গেলেন। সামান্য যাহা আসন ছিল তাহাতেই তাঁহাকে বসাইয়া পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন,—সেই জল দুইজনে কিঞ্চিৎ পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। জীর্ণ কলেবর বৃদ্ধ অতিথি কি আর অধিক ভোজন করিতে পারিবেন, ভাবিয়া পতিব্রতা প্রথমে তাঁহাকে দুইখানি রুটী আনিয়া ভোজনের জন্য প্রদান করিলেন। অতিথিও—আহা বেশ নরম হ'য়েছে—নরম হ'য়েছে বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে সে দুইখানি অল্পক্ষণ মধ্যেই ভক্ষণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পতি পত্নী একবার তাঁহার অলক্ষে চক্ষু ঠারাঠারি করিয়া লইলেন। সতী আবার তাঁহাকে দুইখানি রুটী আনিয়া দিলেন। অতিথি ঠাকুর সে দুইখানিও অম্লানবদনে খাইয়া ফেলিলেন। পতি-পত্নী বুঝিলেন, এখনও অতিথির উদরপূর্ণ হয় নাই। কি করেন, সাধ্বী আবার তাঁহাকে দুইখানি রুটী পরিবেশন করিলেন। এইবার কিন্তু তাঁহার মনটা যেন কেমন একটু কেমন কেমন করিয়া উঠিল। কেননা এবার তাঁহার পতির ভাগে হাত পড়িয়াছে।

ছয়খানি রুটী ভোজন করিয়া অতিথি ঠাকুর আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। হাস্যমুখে বলিলেন,—আঃ, বাপু কয়েকদিন উপবাসের পর আহার, সুন্দর রুটী, ভারি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। শরীরটা পথশ্রমে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তা আজিকার 'রাত্রিটা এইখানেই কাটাইয়া দিয়া কল্য প্রাতে চলিয়া যাইব। এ বেলা যেরূপ গুরুতর ভোজন হইল, রাত্রে

আর বেশী কিছু প্রয়োজন হইবে বলিয়া বোধ হয় না, এমনই সামান্য কিছু হইলেই চলিয়া যাইবে।

পতি-পত্নী—আজ্ঞে সে ত আমাদের ভাগ্যের কথা—ভাগ্যের কথা বলিয়া তাঁহাকে একখানি চেটাই বিছাইয়া দিয়া শয়ন করাইলেন এবং পাদসংবাহনাদি দ্বারায় শ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে অতিথি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এইবার পতিপত্নী ধীরে ধীরে দুই চারিটী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। কথা আর কিছুই নয়, কেবল কথা,—হা ভগবান্, মাত্র চারিখানি রুটী অবশিষ্ট, ইহাতে না হয় অতিথির আজিকার রাত্রের আহার হইল, কিন্তু কল্য প্রাতে অভুক্ত অবস্থাতেই অতিথিকে বিদায় দিতে হইবে। অতিথির যেরূপ দুর্ব্বল দেহ, তাহাতে দুই চারি দিন সেবা দ্বারা সুস্থ করিয়া বিদায় দিলেই ভাল হইত। কিন্তু হায়, সে ভাগ্য কোথায়?

ক্রমে রাত্রি আসিল। অতিথি ক্ষুধা জানাইলেন। পতিব্রতা অবশিষ্ট চারিখানি রুটী তাঁহাকে আহার করিতে দিলেন। এ'ত চারিখানি রুটী নয়—তাঁহার পরম দেবতা পতির চারিদিনের আহার। কিন্তু কি করেন, সেই পতিদেবতারই যখন অতিথিদেবতার সেবাই অভিপ্রেত, তখন পতিদেবতার প্রীতির অনুরোধেই অতিথিদেবতাকে রুটী কয়খানি আনন্দবদনে আনিয়া দিতে হইল।

উভয়ের আদরে অতিথির আহার কার্য্য সমাপ্ত হইল। উভয়ের একটা ভয়ও কাটিয়া গেল। আহার করিতে বসিয়া অতিথি যদি আবার রুটী প্রার্থনা করেন তো তাহার পূরণ হইবে কিরূপে, এই আশঙ্কা যে এতক্ষণ উভয়েরই অন্তরে উঁকি ঝুঁকি মারিতে ছিল। দিবাভাগের মত রাত্রেও তাঁহারা অতিথিকে যত্ন সহকারে শয়ন করাইলেন এবং পাখার বাতাস করিয়া, পা টিপিয়া দিয়া ঘুম পাড়াইলেন। অতিথির উচ্চ নাসিকা ধ্বনিই

তাঁহার নিদ্রার কথা প্রচার করিয়া দিল। এইবার পতি-পত্নী উভয়ে একমনে একপ্রাণে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—ঠাকুর, আমরা উপবাসী রহিয়াছি, তাহার জন্য দুঃখ নাই—ক্লেশও নাই। আমাদের আহারের জন্য তোমার নিকট কিছু প্রার্থনাও নাই, কিন্তু দয়াময়, হয় তুমি আজিকার রজনীর অবসান হইতে না হইতে আমাদের জীবনের অবসান করিয়া দাও, নচেৎ এই বৃদ্ধ ও অশক্ত অতিথির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আহারের সংস্থান করিয়া দাও।

এই শ্রেণীর প্রার্থনা করিতে করিতে পতি-পত্নী ঘুমঘোরে অচেতন হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তবুও ঘুম ভাঙ্গে না। পূর্ব্বেকার ভাল সময়ের মত হঠাৎ দাসদাসীর কোলাহল-কলরবে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাহিরে আসিয়া দেখেন,—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এত লোক লস্কর কোথা হইতে আসিল? এত বস্তা বস্তা ধান্য, বস্তা বস্তা চাউল, বস্তা বস্তা ডাইল কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তিতেই বা দগ্ধ গৃহদ্বারগুলি পূর্ব্বের মত হইয়া উঠিল? শুধু তাহাই নয়, এত ধন রত্নে এবং আসবাব উপকরণেই বা সকল গৃহ কে পূর্ণ করিয়া দিল? কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

বিস্ময়ে বিস্ময়েই তাঁহারা অতিথির অনুসন্ধান করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন,—তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। এইবার আর তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না—অতিথিরূপে কে আসিয়াছিলেন? এ অতিথি হারাইয়া ধন-ধান্য এখন তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিল না। উভয়েই গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে অনেক কান্নাকাটী আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেবলই বলেন—হায় ঠাকুর, যদি দয়া করিয়া গৃহে আসিয়া দেখাই দিলে, তবে আবার এ নশ্বর ধন-রত্ন দিয়া ভুলাইবার ব্যবস্থা করিলে কেন? চরণের দাস-দাসী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইলেই তো

চলিত। সর্ব্বসমর্থ তুমি, তোমার অসাধ্য কি আছে নাথ! বিষয়ের আবর্ত্তে পড়িয়া শেষে কি তোমাকেও ভুলিয়া যাইব? করুণাময়! এই কি তোমার করুণার ব্যবস্থা?

এইরূপ কত কি আত্মনিবেদন করিতে করিতে তাঁহারা প্রাণের ভিতর হইতে প্রভুর সাড়া পাইলেন, স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন—কে যেন স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—ভয় নাই কৃপাসিন্ধু, ভয় নাই। ভয় নাই শ্রদ্ধাবতি! ভয় নাই। তোমাদের মন যখন একান্ত ভাবে আমাতে আবিষ্ট হইয়াছে, তখন আর বিষয় তোমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। চিরদিনই আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া রহিবে। তবে নাকি লোকদৃষ্টিতে তোমরা সংশয়ের বিষয় হইয়া আছ। অনেকেই তো মনে করে, এই তো ইহারা দান ধ্যান পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াও হীনের হীন, দীনের দীন হইয়া পড়িল, তবে আর ওসকল কর্ম্ম করিতে যাইব কেন? স্থূলদর্শীর এই সংশয়চ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এবং তোমাদের সাধ মিটাইয়া অতিথি অভ্যাগতের সেবা ও দান পুণ্য করিবার নিমিত্তই এই ধনরত্ন দান করিয়াছি মাত্র। আমারই ইচ্ছা অনুসারে তোমরা কিছুদিন এখানকার আনন্দ উপভোগ কর, তারপর আমারই পদপ্রান্তে তোমরা স্থান প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। জানিও তোমাদের দুই জনেরই আমি বশীভূত। তোমাদের গুণের আকর্ষণেই আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং চিরদিনই তোমাদের হইয়া রহিলাম। সতী শ্রদ্ধাবতি! তুমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া কেবল পতির প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার পাঁচদিনের আহার অনায়াসে অতিথিকে অর্পণ করিয়াছ। সেই গুণেই তুমি আমাকে কিনিয়া ফেলিয়াছ। আর বৎস কৃপাসিন্ধু দাস, তুমিও নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া তোমার অংশের পাঁচখানি রুটীও অভুক্ত অতিথিকে খাইতে দিয়াছ। তুমি শুধু নিজের জীবনকে বিপন্ন কর নাই, ঐ পাঁচখানি রুটী সম্বল করিয়া যে অর্থ সংগ্রহের সঙ্কল্প

করিয়াছিলে, অতিথিসেবার অনুরোধে তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছ। আর্ত্ত-অভুক্ত অতিথি আমারই মূর্ত্তি। তাই আমি ক্ষুধার্ত্ত অতিথিরূপেই দেখা দিয়া তোমাদের দানপুণ্য সদনুষ্ঠান সফল করিয়াছি। এ জগতে তোমাদের দুই জনেরই জীবন ধন্য। আর আজ আমিও তোমাদের পবিত্র দান গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। যাহারা তোমাদের মত আর্ত্ত ও অভুক্ত ব্যক্তিকে অকাতরে অন্নাদি দান করিয়া থাকে, বিপন্নের বিপদ্ মোচন করিয়া থাকে, এইরূপেই আমি তাহাদিগকে দর্শন দিয়া থাকি।

অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামীর অভয়বাণী শুনিয়া তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন বটে; কিন্তু হস্তে চিন্তামণি পাইয়া হারাইয়া ফেলার দুঃখ আর ঘুচিল না। এদিকে পাড়া প্রতিবেশী অপর সাধারণ লোকে তাঁহাদের এই গৃহাদির আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া মহা হৈ হৈ রৈ রৈ রব তুলিয়া দিয়াছে—তাঁহাদেরও উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন ডাক হাঁক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর অধিকক্ষণ তাঁহারা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলেন। বাহিরে আসিয়াও বিপদ, সকলের মুখেই তাঁহাদের ভাগ্যের, তাঁহাদের ভক্তির শতমুখে প্রশংসা। এ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া যেন তাঁহারা মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বিনীত ভাবে সকলকে বিদায় দিয়া স্নানাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীশ্রীনারায়ণের ইচ্ছায় তাঁহারা কিছুদিন সাধ মিটাইয়া দানপুণ্য করিলেন এবং উভয়েই দেহাবসানে শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

বহু গ্রাহক ভক্তিতে পূর্ব্বে প্রকাশিত "খুনিমামলা" প্রবন্ধটী পুনর্ব্বার প্রকাশের জন্য লিখিতেছেন, আমরা কার্ত্তিক মাস হইতে উক্ত প্রবন্ধটী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ আরম্ভ করিব।

(ভঃ সঃ)

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত।)

(১৮)

[জগাই মাধাই উদ্ধার]

"মাধা দেখরে এত শুধু গোর নয়।
উহার গোরা রূপে মাঝে মাঝে
কাল বরণ ঝলক দেয়॥ ধ্রু॥
অরুণ বসন পরা যেন পীত ধড়ার প্রায়।
উহার মাথার চাঁচর কেশ চূড়ার মত দেখা যায়॥
তুলসীর মালা যেন বন মালা শোভা পায়।
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি তায়॥
হরি হরি বলে মুখে রাধা রাধা শুনা যায়।
দীন নন্দরাম কহে ব্রজের রতন নদীয়ায়॥"

অপরাহ্নে ভক্তগণ পুনরায় প্রভুকে ধরিয়া বসিলেন, সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—প্রভু! জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রভুও স্বীকার করিলেন। ভক্তগণকে বলিলেন—

আনহ যেখানে যেই আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন॥ চৈঃ মঃ

প্রভু বলিতেছেন "জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইতে হইবে। সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আনিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া উহাদিগকে হরিনাম দিব।" প্রভুর এই আজ্ঞা পাইয়া ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত

হইয়া নগর কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই তাঁহাদের প্রথম নগর-কীর্ত্তন। প্রভুর কীর্ত্তন বাহিরঙ্গ লোকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। তখন বৈকাল বেলা। ভক্তগণ পায়ে নূপুর পরিয়া, খোল, করতাল, শঙ্খ, ভেরী লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। এই দলে স্বয়ং প্রভু, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীহরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতি ছিলেন। আমরাও শ্রীল শিশির বাবুর ন্যায় চৈতন্য মঙ্গল অনুসরণে এই লীলা বর্ণনা করিব। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল॥
যেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়॥
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই।
নিজ মদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই॥
আনন্দেতে ডগমগ শ্রীশচী নন্দন।
আরম্ভিল মহাপ্রভু মধুর নর্ত্তন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গমন ভঙ্গী ঐ চৈতন্যমঙ্গলেই এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

গৌরাঙ্গ সুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া॥
চরণেতে বাজে নূপুর রুনু ঝুনু বোলে।
মালতীর মালা বিনোদিয়া গলে দোলে॥
হেলিয়া দুলিয়া নাচে কত রঙ্গে ঢঙ্গে।
গলিয়া গলিয়া পড়ে গদাধরের অঙ্গে॥
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়া।
অনিমেষে সঙ্গীগণ দেখে তাকাইয়া॥

প্রেমে পুলকিত তনু মাতি মাতি চলে।
ভাব ভরে গর গর আঁখি নাহি মিলে॥
বাহুর হেলন কিবা ভালি গোরা রায়।
প্রতি অঙ্গের চালনেতে অমিয়া খসায়॥

নিতাই যাইতেছেন সবার আগে। জগাই মাধাইর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার কোমল চিত্ত বড়ই ব্যথিত হইয়াছে। হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

দয়াল ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে।
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে॥

ছোট ভাই গৌরহরিকে লইয়া তিনি জগাই মাধাইর দুর্গতি দূর করিতে যাইতেছেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। তাই নিতাই যাইতেছেন সকলের আগে। নিতাই একেবারে প্রেমে গদ গদ হইয়া চলিয়াছেন।—

একে ত দয়াল নিতাই আনন্দের পারা।
প্রেমে গদ গদ তনু ঢলি পড়ে ধারা॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
ডগমগ লোচন ঘুরায় নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর॥
ক্ষণে "গো" "গো" করে গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেতে সাঁতারে॥
সকরুণ দিঠে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে।
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে॥

জগাই মাধাই, মদ্যপান করিয়া সারা নিশি জাগরণ করিয়াছে। তাই এ অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তাহারা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। এখন

কীর্ত্তনের রোলে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কীর্ত্তনের শব্দে অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যদি উহাদের বাঁচিবার সাধ থাকে তাহা হইলে গণ্ডগোল থামাইয়া অন্য পথ দিয়া যাইতে বল। জগাই মাধাইর দূত যাইয়া এ কথা প্রভুকে জানাইল। কিন্তু তাঁহারা এ কথা কাণেও তুলিলেন না, আরও উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দূত ফিরিয়া গিয়া বলিল, নিমাই পণ্ডিত তাহাদের কথা গ্রাহ্যও করিল না।

জগাই মাধাইর তখন মদের উন্মত্ততা গিয়াছে। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহারা আলুথালু বেশে বাহির হইয়া পড়িল।

"পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন।
টল টল করি ধায় ক্রোধে অচেতন॥
রাঙ্গা দু'নয়ন করি বলে ক্রোধভরে।
নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে॥"*

ইহা বলিয়া দুই ভাই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দিকে আসিতে লাগিল। ভক্তগণ কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে।
বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে॥
দ্বিগুণ করিয়া আরো বাড়ায়ে উল্লাসে।
হরি হরি বোল ধ্বনি গগন পরশে॥"

---

* আমরা উপাদেয় বোধে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পয়ার অংশগুলি "অমিয় নিমাই চরিত" হইতে উদ্ধৃত করিলাম। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সহিত অধিকাংশ স্থলে ইহার মিল নাই।

(লেখক)

কীর্ত্তন শুনিয়া বা ভক্তগণের আনন্দ দেখিয়া জগাই মাধাইর চিত্ত কোমল হইল না, তাহাদের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। নিমাই পণ্ডিত বাড়ী চড়াও করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। জগাই মাধাইর মত লোকের ইহাতে যে কিরূপ রাগ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া দেখুন। আবার তাহার উপর তাহাদের হরিনামের উপর রাগ।

হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধায় তারা ভক্ত মারিবারে॥

নিতাই সকলের আগু আগু আসিতে ছিলেন সুতরাং জগাই মাধাই তাহাকেই প্রথমে দেখিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগাই মাধাইর দুর্দশায় নিতাই চাঁদের আমার, চিত্ত করুণায় গলিয়া গিয়াছে। তাঁহার দুই অরুণ নয়ন দিয়া প্রেমবারি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সুতরাং জগাই মাধাইর রুদ্র মূর্ত্তি তাঁহার চোখেই পড়িল না।

দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রু পূর্ণ লোচনেতে দুহুঁ পানে চায়॥

দুই ভাই তাহাদের সেই পরিচিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চিনিলেন। করুণায় টলমল যে চাঁদমুখ দেখিয়া জগত গলিয়া যায়, দুই ভায়ের পাষান চিত্ত তাহাতে নরম হইল না।

সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল॥

নিতাই প্রেমভরে কাঁদিতেছেন। তিনি জগাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই জগাই! হরি বোল বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।"

(ক্রমশঃ)

দণ্ড-প্রসাদ

(শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী বি, এল, লিখিত।)

আজ শ্রীভগবদ্দত্ত দণ্ডের কথা বলিব। যাহাকে শ্রীভগবান স্বয়ং দণ্ড প্রদান করেন তাহার ভাগ্যের সীমা নাই। দণ্ড অর্থ কি না শাস্তি। শ্রীভগবান স্বয়ং যাহাকে শাস্তি দেন তাহার সৌভাগ্যের সীমা আছে কি? শাস্তি দেন কেন? অপরাধের জন্য। শ্রীভগবান স্রষ্টা, পাতা এবং মঙ্গলদাতা। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই জীবের মঙ্গলের জন্য। জীবের অপরাধ দূর করিয়া তাহাকে নিজমুখী করিয়া, তাঁহাকে আনন্দরস আস্বাদন করাইয়া নিজজন করা ইহা অপেক্ষা আর মঙ্গলপ্রদ কি হইতে পারে? জীবের ইহা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ই বা কি হইতে পারে?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান নিজমুখে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ৮।৪ অঃ

আমাদের পঠদ্দশায় একজন ব্রাহ্ম প্রচারক ঐ শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ভগবান "বিনাশ" করিতে পারেন তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মানি না। বলা বাহুল্য তিনি "বিনাশায়" শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহার যাহা মনে হইয়াছিল তাহাই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ কথা লইয়া একটু আলোচনা করিব। শ্রীস্বামী পাদ বলিতেছেন "ন চৈবং দুষ্ট নিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কণীয়ং যথাহুঃ, লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ দোষয়োরিতি॥"

অর্থ এই হইতেছে, দুস্কৃত ব্যক্তির বিনাশ করায় ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা ও নির্ঘৃণতা দোষ ঘটে না, সন্তানের প্রতি মাতার লালনে ও তাড়নে যেমন নির্দ্দয়তা হয় না ; নিয়ন্তা ঈশ্বরের গুণ দোষ বিষয়ে সেইরূপ নিষ্ঠুরতা বা নির্ঘৃণতা দোষ ঘটে না।

এই বিষয়টি গভীর চিন্তার বিষয়। কেন না শ্রীভগবান অনন্ত করুণার আধার ; অনন্ত প্রেমের খণি। তাঁহারি সৃষ্ট জীবকে তিনি "বিনাশ" রূপ দণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ধ্বংশ করিতে পারেন কি ? মায়ামুগ্ধ জীবই যখন তাহার পুত্রকে ঐরূপ ধ্বংশ করিতে পারে না, তখন অনন্ত দয়ার উৎস শ্রীভগবান নিজের সৃষ্ট জীবকে পারিবেন কিরূপে ?

শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গরূপে উদয় হইয়া ঐ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বগুলি কিরূপভাবে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীগৌর লীলায় শ্রীভগবান যেরূপ অসাধারণ করুণা এবং প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ কোন অবতারে করেন নাই। ভক্তেরা এইরূপ দণ্ডকে "দণ্ডপ্রসাদ" বলিয়াছেন। কেননা এই দণ্ডের মধ্যে তাঁহারা শ্রীভগবৎ "প্রসাদ" অনুভব করিয়াছেন। এই দণ্ডই শ্রীভগবানের প্রসন্নতার নামান্তর মাত্র। অদ্য কয়েকটি দণ্ডের কথা বলিব।

(প্রথম শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দণ্ডের কথা—যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—)

ক্রোধ মুখে বলে প্রভু আরে আরে নাড়া।
বল দেখি জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বাড়া ?
অদ্বৈত বলয়ে সর্ব্বকাল বড় জ্ঞান।
যার জ্ঞান নাহি তার ভক্তিতে কি কাম॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাশরিলা শ্রীশচী নন্দন॥

পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥
অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥
"বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র" রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥
এত বুড়া বামনেরে আর কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥
পতিব্রতা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে কৃষ্ণ স্মরয়ে প্রভু হরিদাসে॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদন্ত বচনে॥
"শুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥
ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন কাজে॥

* * * *

অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন তত্ত্ব করি হুহুঙ্কারে॥
আরে আরে কংশ যে মারিল সেই মুঞি।
আরে নাড়া! সকল জানিস্ দেখ তুঞি॥

অজ ভব শেষ রমা মোর করে সেবা।
মোর চক্রে মারিল শৃগাল বাসুদেবা॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর-বাণে মারিল রাবণ মহাবল॥

*   *   *   *

মুঞি সে ছলিলুঁ বলি করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিনু প্রহ্লাদ॥
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেম-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
যেন অপরাধ কৈনু তেন শাস্তি পাইনু।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইনু॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য যিনি প্রভুকে আনিয়াছেন, যাহার জন্য প্রভুর এই "ঋণ শোধকরা অবতার" তিনি পুনরায় বলিতেছেন :—

কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল এবে তোর সে সব পদ্ধতি॥
দুর্ব্বাসা না হও মুই যারে কদর্থিবা।
যার অবশেষ অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবা॥
ভৃগু মুনি নহ মুই যার পদধুলি।
বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস কুতূহলি॥
মোর নাম "অদ্বৈত" তোমায় শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর আশ॥

•   •   •   •

সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে বিস্তর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায়॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈত গৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়।
অদ্বৈত ভবন হৈল কৃষ্ণ প্রেমময়॥

এই "প্রেম ক্রন্দন" চিরদিন প্রভু নিজজন লইয়া করিতেছেন! জীবের লাগি এই প্রেমাশ্রু প্রভু চিরদিন বিসর্জ্জন করিতেছেন; এই "ধারার পর ধারা যেন নদী বহি যায়" প্রভু চিরদিন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আমরা ত্রিতাপদগ্ধ মায়া মুগ্ধ জীব ঐ ধারার এক কণিকাও কোনদিন পাইয়া জাবন ধন্য করিতে পারিব কি?

এইবার মহাপ্রভুর লীলার আর একটি দণ্ডের কথা বলিব শুনুন। শ্রীভগবান আচার্য্য, পুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে থাকেন। স্বরূপ গোঁসাইয়ের সহিত তাঁহার সখ্যভাব। প্রভুকে তিনি মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভুর জন্য তিনি স্বহস্তে নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। ভাবুন, যাঁহারা শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে ছেন শুধু জানিতেছেন না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন, তাঁহার বাক্য শুনিতেছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন তাঁহাদের ভাগ্য, তাঁহাদের প্রেম, তাঁহাদের ব্যবহার কেহ বর্ণনা করিতে পারেন কি?

প্রভুকে ভুঞ্জাইবার জন্য আচার্য্য, প্রভুর প্রিয় কীর্ত্তনীয়া, ছোট হরিদাসকে এক দিন চাউল আনার জন্য শিখি মাহাতির ভগ্নি মাধবী দাসীর নিকট

প্রেরণ করেন, হরিদাস ঐ চাউল আনিলে আচার্য্য তাহা রন্ধন করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করিতে দিলেন। প্রভু ভোজনে বসিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা চৈঃ চঃ—

উত্তম অন্ন! এ তণ্ডুল কাঁহাসে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা॥
প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥

প্রভু এই যে ছোট হরিদাসের "দ্বারমানা" করিলেন আর তাহাকে দর্শন দেন নাই। ছোট হরিদাস প্রভুকে দর্শন না পাইয়া ত্রিবেণীতে যাইয়া গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিদাসের প্রভুর অদর্শনে বিরহ দুঃখ অনুভব করুন; যে বিরহের নিকটে দেহরক্ষা তৃণ তুল্য। কৃষ্ণ বিরহে কৃষ্ণভক্ত দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। কৃষ্ণ বিরহ কত তীব্র, কত অসহনীয়, কত যন্ত্রণা দায়ক তাহা ছোট হরিদাসের দেহত্যাগে কতকটা বুঝিতে পারা যায়। ছোট হরিদাস দেহত্যাগ করিয়া কি করিলেন তাহা চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় শুনুন—

ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ পাড়িলা।
সেই ক্ষণে প্রভু স্থানে দিব্য দেহে আইলা॥
প্রভু কৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধরশনে রহিলা।

* * *

গন্ধর্ব্ব দেহে গান করেন অন্তর্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায় অন্য নাহি শুনে ॥

ছোট হরিদাস দেহত্যাগ করিয়া গন্ধর্ব্বদেহ অবলম্বন করেন। প্রভুকে তাঁহার অভিলষিত সেবা যে গান তাহা গাইয়া শুনাইলেন। এই যে দণ্ড হরিদাস পাইলেন আপাততঃ দেখিতে ইহা কঠোর শাস্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? শ্রীভগবানের সহিত জীবের চিরমিলনই আনন্দ; যেগুলি তাহার বাধা জন্মায় তাহাই দুঃখ, তাহাই শাস্তি। সে শাস্তি যতদূর হয় তাহাই শ্রীভগবৎ কৃপা। সেইজন্যই শ্রীভগবানের দান যে শাস্তি তাহাকে "প্রসাদ" বলে।

অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর সেবক কমলাকান্ত বিশ্বাস। আচার্য্যপ্রভুর কিছু ঋণ হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট আচার্য্য প্রভুর অজ্ঞাতসারে পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে পড়িয়াছিল তজ্জন্য ঐ বিশ্বাসকে প্রভু দ্বারমানা করেন। ঐ দণ্ড শুনিয়া বিশ্বাস বড় দুঃখিত হইয়া ছিলেন। দণ্ড শুনিয়া অদ্বৈত প্রভু বলিতেছেন।—

দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত।
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমায় করিল দণ্ড প্রভু ভগবান ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান ॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ট ব্যাখান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান মুকুন্দ ॥

যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোকে পাবে কতি॥
এত কহি আচার্য্য তারে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হঞা আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদ পাত্র করিলা কমলা॥
আমারেহ কভু কৈ না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈল অপরাধ॥

শ্রীগৌরলীলায় যে সমস্ত দণ্ডপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে তাহার কয়েকটী সংক্ষেপে উপরে লিখিলাম। এক্ষণে অন্যান্য অবতারে শ্রীভগবান যে সমস্ত দণ্ড প্রসাদ করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি, ভক্ত পাঠকগণ আস্বাদন করুন।

বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক জয় বিজয়, শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদ্‌গত হওয়ায় ব্রহ্মশাপে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং দন্তবক্র শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন জন্মে উদ্ধার লাভ করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল হয়েন। শ্রীভগবান নিজে আসিয়া তাহাদিগকে অসুর দেহ ধ্বংশ করিয়া পুনরায় নিজ লোকে প্রেরণ করেন। এই দণ্ডও শ্রীভগবৎ প্রসাদ ব্যতিত আর কিছু নহে। শ্রীভাগবতে এগুলির বিস্তার রূপে বর্ণন আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পুতনার রাক্ষসী যোনি মোচন করিয়া ছিলেন। মাতৃবেশ মাত্র ধারণ করায় তাহাকে মাতার উপযুক্ত স্থান প্রদান করিলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের অপরিসীম দয়ার এক কণাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

—o—

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবস্থা।

(ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত)

(২)

ক্রমে সেই গ্রহের অধিকার বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা দেখুন। যে ভারতকে সোণার ভারত—ধর্ম্মরাজ্য বলিয়া লোকে বলিত, যাহাকে ভৌমস্বর্গ বলিতে লোকে কুণ্ঠাবোধ করিত না, যাহা ভক্ত ও ভগবানের প্রসর লীলাক্ষেত্র, যাহা জ্ঞানীর জ্ঞানক্ষেত্র কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্র, ভক্তের ভক্তি-রাজ্য, প্রেমিকের প্রেমের হাট, যাহা লক্ষ্মী সরস্বতীর অবাধ নিবাসস্থল, বীরত্বের কেন্দ্রভূমি, নৈতিক উপাদানের আকর, সভ্যতার কোহিনুর সেই সোণার ভারত যে আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, জানি না কতদিনে তাহা ভারত বুঝিবে এবং বুঝিয়া ভবিষ্যতের জন্য ভারতবাসী সাবধান হইবে।

ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসমাজ সঙ্কীর্ণ করিয়া যে বৈষ্ণব-সমাজ নিজ অঙ্গ বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহার পূতপ্রভাব হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া নিজ সুশান্ত কিরণ বিকীরণ করিয়াছিল সেই বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে আবিলতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ধার্ম্মিকতার পতন হইল, এক কথায় ভারতে কু-দিন আসিল।

বলিতে গেলে অনেকের অপ্রিয় হইবে কিন্তু না বলিয়াও আর থাকা যায় না। প্রাণের ভাব—প্রাণের কথা এমন করিয়া আর কতদিন চাপা দিয়া রাখা যায়? অপ্রিয় হইলেও যখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন বলিবই—আশা করি কেহ রাগ করিবেন না, সমাজের অবস্থা চিন্তা করিয়া নিজ নিজ দৌর্ব্বল্য দমনের চেষ্টা করিবেন।

ঠাকুর রাধামোহন, পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ ইঁহারাই বৈষ্ণবসমাজের শেষ পণ্ডিত ও শেষ উপদেষ্টা। এই দুই নক্ষত্রের পতনেই ভারতাকাশ তিমিরাবরণে ডুবিয়া গেল। বৈষ্ণব-সমাজ পণ্ডিত শূন্য, আর পণ্ডিত সমাজ বৈষ্ণবতা শূন্য হইল। বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনা গেল, সাধক সমাজে মুর্খতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

গোস্বামী ও আচার্য্য ঠাকুর সন্তানগণ বিষয়ী হইয়া পড়িলেন, অভ্যাগতগণ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের পরিচালক হইলেন। বিষয়ী সমাজের শীর্ষদেশে বিলাসিতাস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমাজের শীর্ষ গোস্বামীগণ ও আচার্য্যগণই যখন এমন হইলেন,তখন নিম্নসমাজ যে ঘোর অজ্ঞতাময় হইবে তাহাতে আর কথা কি? সব গেল—আলোকময়ী সোণার ভারতভুমি ঘোর অন্ধকার গর্ভে ডুবিয়া দিশাহারা হইয়া গেল, পূর্ণমাত্রায় দুষ্টগ্রহের ভোগ চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দীক্ষা সব উল্টাইয়া গেল। শিক্ষার গতি ফিরিল, নৈতিকগতি ফিরিল, রুচি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। ধর্ম্মের কথা সেকালের কথা হইয়া পড়িল, ভক্তির কথা হাস্যরসে পরিণত হইল, উপাসনার নাম হইল ভণ্ডামি, ভক্তির সাধন মুর্খের অন্ধ বিশ্বাস বা অজ্ঞতার বিকাশ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে লাগিল। প্রাচীন সভ্যতা, সদাচার—কুসংস্কার বলিয়া তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে উপেক্ষিত হইতে লাগিল।

ভাই রাগ করিও না, মাথা ঠিক করিয়া একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি তোমার এখন কেমন লাগে? যথার্থই এখন তুমি সেগুলি ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পার কি? সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, পার না। কেননা শিক্ষার প্রভাবে তোমাকে এমন করিয়াছে যে, এখন কিছুতেই তোমার মাথা এদিকে আসিবে না। প্রাচ্য শিক্ষার অভাবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের নিকট

গৌড়ের গৌরব-নিদান ভগবান গৌরচন্দ্র বাতুল হইলেন, কৃষ্ণচন্দ্র লম্পট হইলেন, ব্রজলীলা কুরুচি হইল, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন অশ্লীলতাময় হইল। কেহ বা ইহার নাম দিল "কবি" কেহ বা আরও কিছু উচ্চে উঠিয়া বলিলেন "কৃষ্ণ-খেউর।" বৈষ্ণব-বেশ এখন অসভ্য বেশ হইল। আর কত বলিব, তখনকার সবই এখন খারাপ বলিয়া বাবুদের কাছে প্রতিপন্ন হইল। অত বড় বৈষ্ণব-ধর্ম্মটা একেবারে এককথায় মূর্খের ধর্ম্ম হইয়া গেল। এরূপ হইবার আরও এক কারণ আছে—পণ্ডিতগণ, আচার্য্যগণ অর্থলোলুপ হইয়া ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসাদারী আরম্ভ করিলেন, তারপর সাধারণে সংস্কৃত জানে না, জানিলেও হস্তলিখিত পুঁথি পড়িতে বা আলোচনা করিতে একান্ত নারাজ, সাধনাঙ্গ-প্রধান গোস্বামি-শাস্ত্র, বৈষ্ণব শাস্ত্র অব্যবহারে ঝুল ও ধুলার আধার ভুত হইয়া কীটকুলের ভক্ষ্যবিশেষ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইল। প্রাচীন মহাত্মাগণ সজলনয়নে গ্রন্থে যে ডোর দিয়া গিয়াছিলেন তাহার সে ডোর আর খসিল না। যাহা দু'চার খানি প্রাচীনগ্রন্থ মুদ্রিত হইল তাহাতেও গ্রন্থকারের মত বুঝিতে না পারিয়া বা নিজস্বার্থ হানিকর প্রমান প্রয়োগ দেখিয়া গ্রন্থ-সম্পাদকগণ নিজ নিজ মত গুপ্তভাবে তাহার সহিত চালাইয়া দিতে লাগিলেন। কাজেই সাধকসমাজে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয়তার অভাব, কেবল পরম্পর শ্রুত বিকৃত বা কপোলকল্পিত উপদেশ মূর্খাদপি মূর্খের মুখে যে যাহা শুনিল তাহাতেই মোটামুটি এমন একটা সিদ্ধান্ত হইয়া গেল যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মটা কেবল কতকগুলা মূর্খের ধর্ম্ম।

বৈষ্ণব-সমাজে সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু তথাপি বাউলের গানের গৌরাঙ্গ, কবি বা কালীয়দমনযাত্রার কৃষ্ণ, খেমটার গানের প্রেমতত্ত্ব, আর, নিম্নশ্রেণীর সংসারাশক্ত বঞ্চক, মূর্খ, নীচ, ধর্ম্মবাদী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যবসার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ কপট বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণবধর্ম্ম জানিবার প্রধান উপাদান হইয়া পড়িল। এ ধারণা না হইয়াও পারে না, কারণ

বৈষ্ণবে বিশ্বাস লোকের এমনই অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, এত কপটতার আবরণ দিয়াও দশজনের নিকট প্রতিষ্ঠা ও পূজা পাইবার ত্রুটী হইল না বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায়ের নিকট হেয় হইলেও অজ্ঞসমাজে, সরল বিশ্বাস হেতু উঁহাদের প্রতিপত্তির কোনই অভাব ছিল না। এই যে অবাধ প্রতিপত্তি ইহাও বৈষ্ণব-সমাজের অধঃপতনের আর একটী হেতু বলিয়া মনে হয়, কেন হয় তাহা ক্রমে বলিব।

বৈষ্ণব-সমাজ অতি বড় উচ্চ সমাজ, বৈষ্ণবধর্ম্ম যথার্থই পণ্ডিতের ধর্ম্ম, প্রকৃত পক্ষেই মূর্খের ইহার নিগূঢ় ভাব গ্রহণের আদৌ অধিকার নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মোপাসনাতত্ত্ব ভূরি শাস্ত্র-জ্ঞান সাপেক্ষ। যাহার গূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন জন্য শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নির্জ্জন ব্রজবনে অন্যাবকাশ ত্যাগ করিয়া সমগ্রজীবন বৈষ্ণবধর্ম্মের গূঢ়াদপি নিগূঢ় তত্ত্বানু-সন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছেন। যাঁহাদের শক্তিতে অপর শ্রীজীবাদি গোস্বামীগণ অনুশক্তিমন্ত হইয়া সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল তত্ত্বানুসন্ধানে ভজনাবকাশ পর্য্যন্ত না রাখিয়া বিজন চিন্তায় জীবন কাটাইয়াছেন সেই গভীরানুসন্ধানের অমৃতময় ফল গোস্বামী শাস্ত্র—যাহার নিকট এক সময় ভারতের সমগ্র পাণ্ডিতমণ্ডলী দার্শনিকতায় মস্তক অবনত করিয়া ছিলেন সেই বিদ্বজ্জননিষেবিত বিদ্বজ্জনানুচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব মূর্খের মুখে শুনিতে কে প্রত্যাশা করেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ সমাজ সম্বন্ধে যিনি কিছু মাত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালীন ভারতের চূড়ামণি পণ্ডিতগণে মহাপ্রভুর পার্ষদ সমাজ পূর্ণ ছিল। সেই সকল পণ্ডিত ও ভজন নিষ্ঠ ভক্ত গোস্বামীগণমধ্যেও কেবলমাত্র শ্রীস্বরূপ ও শ্রীল রায় রামানন্দই দুইজনই মাত্র প্রভুর সহিত ভজনতত্ত্বানুশীলনে অধিকার পাইয়া ছিলেন।

এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন—এতদূর যাহার অতলস্পর্শ গভীরতা তাহাতে শফরিকল্পজন রত্নোদ্ধার করিবে কিরূপে ?

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রে নির্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রাদিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া শাস্ত্রবিচার দ্বারা স্বয়ং উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন এবং অন্যের বোধগম্য করাইতে পারেন তাঁহারা উত্তমাধিকারী। আর যাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন বা গুরু শুশ্রূষারদ্বারা স্বয়ং উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন কিন্তু অন্যের ভ্রম দূরীকরণে অক্ষম তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। আর যাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান বা উপদেশ উপযুক্তরূপ না হইলেও ভক্তিতে অনুরাগ আছে অথচ কোমলশ্রদ্ধ তাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারী। শ্রীমন্মহা-প্রভু এই ত্রিবিধ অধিকারী বিচার করিয়া উত্তমাধিকারীগণকে গুরুত্বে বা উপদেষ্টারূপে ও মধ্যমাধিকারীগণকে সাধকরূপে এবং কনিষ্ঠাধিকারীগণকে প্রবর্ত্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া অধিকারানুরূপ আচার ও সাধনোপদেশ করিয়া ছিলেন।

এক্ষণে সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি এই কনিষ্ঠাধিকারীরও অযোগ্য ব্যক্তি উত্তমাধিকারীর কার্য্য করিতে যায় তাহার ফল কিরূপ হয়। কাল মাহাত্ম্য ভাবিয়া উত্তমাধিকারী আত্মগোপন করিলে কনিষ্ঠ অধিকারীগণ অনধিকার চর্চ্চার বিষাগ্নিতে বৈষ্ণব সমাজ দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল। (ক্রমশঃ)

বটক্ষীর

বাঙ্গলাদেশে জন্মিয়াছে অথচ বটগাছ জানে না, এমন লোক বোধহয় আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে অনেকে যেমন সহরবাসী হইয়া ধান গাছের কড়ি, বরগা, জানালা, কপাট প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া বসিতে

চান সেইমত যদি কেহ থাকেন তাঁহাদের কথা আমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য।

যাহা হউক বটগাছের শাখা বা পাতা ভাঙ্গিলে যে শ্বেতবর্ণ এক প্রকার আঠা বহির্গত হয় তাহাকেই বটক্ষীর বলা হয়। এই বটক্ষীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে দু'এক বার সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় ২।১টী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ১৩১৮ সালে আমি সৌভাগ্যক্রমে একটি প্রাচীন ব্রহ্মচারীর দর্শন পাই, তিনি আমাকে আমাদের বাটীর সংলগ্ন একটী বটগাছ দেখাইয়া উহার শাখা ভাঙ্গিয়া ক্ষীর দেখাইয়া যে সকল কথা বলিয়া ছিলেন আজ ভক্তির সহৃদয় পাঠকগণকে আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব। ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশ মত আমি কয়েক স্থানে ইহার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি, তাই সাধারণের উপকারার্থে আজ ইহা প্রকাশ করিলাম।

বটক্ষীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহা সঙ্কোচক, বলকারক, রক্তজনক, পরিপাকশক্তি বর্দ্ধক, স্নায়বীয়-উত্তেজক ও পরিপোষক এবং দেহের লাবণ্য বৃদ্ধিকারক। নানাবিধ পাকাশয় সংক্রান্ত রোগে এবং অন্ত্রের রোগে যেস্থলে ডাক্তার কবিরাজেরা একেবারে দুগ্ধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন, সেস্থানে বটক্ষীর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। কুড়ি ফোঁটা বটক্ষীর খাঁটী আড়াই পোয়া দুগ্ধের সমান কার্য্য করে, অথচ ইহাতে দুগ্ধের সারক ক্রিয়া বর্ত্তমান নাই। প্রত্যেক বারে আন্দাজ এক ছটাক পরিস্কার জলের সহিত পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা বটক্ষীর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহার সঙ্কোচক গুণ বর্ত্তমান থাকায় ইহা উদরাময় এবং আমাতিসার রোগে আশ্চর্য্য ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে।

রোগ সারিয়া গেলে রোগীর দৌর্ব্বল্যাবস্থায় অল্প মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিলে দুর্ব্বলতা সারিয়া দেহ বেশ সবল ও পুষ্ট হয়। রক্তশূন্যতা বা রক্তের অল্পতা ঘটিলে বিশেষতঃ তাহার সহিত অজীর্ণাদি রোগ বর্ত্তমান

থাকিলে নিয়মিত ভাবে এই বটক্ষীর ব্যবহার করিলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধি করিয়া শরীর লাবণ্যময় করে। অজীর্ণ রোগে যখন কোন দ্রব্যই পাকাশয়ে জীর্ণ হয় না অথবা কিছু খাইলেই বোমী হইয়া উঠিয়া যায়, সেস্থলে এই বটক্ষীর অতীব পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা স্নায়বীয়উত্তেজক ও পরিপোষক। অতএব স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই রোগে কাশীর চিনি জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত বটক্ষীর ব্যবহার করিতে হয়। চিনির জলের সহিত খাইতেও কষ্ট হয় না, আর যদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকে তাহা হইলে তাহারও উপকার হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য বেশী হইলে মধ্যে মধ্যে পাকা বেল বা পাকা পেঁপে এবং কাঁচা পেঁপের তরকারী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বাংলা দেশের এক সর্ব্বনাশা রোগ স্বপ্নবিকার বা স্বপ্নদোষ। এই কুৎসিত রোগে বটক্ষীর অমৃত তুল্য। ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ত্যাগী পাপাসক্ত বঙ্গীয় যুবকগণের ইহা একটী পরম সুহৃদ। আমরা এই রোগগ্রস্থ বহু রোগীকে একমাত্র বটক্ষীর সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছি। তবে এই রোগ-গ্রস্থ ব্যক্তির আহার খুব সাত্ত্বিক ভাবের হওয়া আবশ্যক।

যাহাদের শরীর শীর্ণ এবং দুর্ব্বল, তাহারা ইহা নিয়মিত সেবন করিয়া অনায়াসেই শারিরীক উন্নতিলাভ করিতে পারেন। ইহা সেবনে কোন-রূপ কষ্ট নাই, আস্বাদও খারাপ নয়। এমন কি শিশুকেও অনায়াসে সেবন করান যাইতে পারে। তারপর আর এক কথা, ইহাতে এমন কোন বিষাক্ত গুণ নাই যে, বেশী মাত্রায় খাইলে কোন অনিষ্ট হইতে পারে? পরিমাণ অপেক্ষা কিছু বেশী খাইয়া ফেলিলেও কোনরূপ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। তবে এখন দেশের যেরূপ আবহাওয়া তাহাতে বাবু

ভায়ারা সাগর পারের লেবেল মারা না হইলে ব্যবহার করিবেন কিনা সেইটাই কথা।

স্বরাজ স্বরাজ করিয়া যাঁহারা দেশের মধ্যে হুলুস্থুল বাঁধাইয়া লইয়াছেন, তাঁহারা একবার স্বদেশের গাছ গাছরার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বিলাতি পেটেন্ট ঔষধের পরিবর্ত্তে দেশের জিনিস ব্যবহারে লোককে উদ্বুদ্ধ করিবেন কি? একাজটাও কি স্বরাজের একটা অঙ্গ নহে? উচিৎ কথা বলিলে প্রভুরা রাগ করেন কিন্তু কত পয়সা যে এইভাবে বিদেশে যাইতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই। দেখিতে হইলে সকল দিক্ দিয়াই দেখা দরকার।

আমরা দেশীয় গাছগাছরার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এখন হইতে নিয়মিতভাবে করিবার চেষ্টা করিব। পাঠকগণের মধ্যে যিনি যতটুকু সাহায্য করিতে পারেন করিলে বাধিত হইব।

পাঠকগণের মধ্যে যদি কাহারও লিখিত লক্ষণাক্রান্ত রোগী হাতে পড়ে তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে আমরা যথাসময় পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিব।

নিবেদন

পতিত পাবন শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেব বা ৺পুরীধামের সিদ্ধ বড় বাবাজী মহারাজের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ভক্তগণের নিকট আমাদের করযোড়ে সবিনয় নিবেদন ;—

পরমকরুণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার মহিমা আজ কেবল বঙ্গ ও উড়িষ্যায় আবদ্ধ নহে, ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব পরিব্যাপ্ত

হইতেছে। তাঁহার নামে আজ সহস্র সহস্র নরনারী পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। দিন দিনই আমাদের গোত্র বর্দ্ধিত হইতে দেখিতেছি। বাঙ্গালী, উড়িয়া, আসামী, বিহারী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী, গুজরাটী প্রভৃতি সর্ব্বজাতি বা সর্ব্বপ্রদেশেরই অধিবাসীগণ আজ আমাদের পরাৎপর আত্মীয়রূপে দেখা দিতেছেন। বর্ত্তমানে সংখ্যায় আমরা নিতান্ত ন্যূন নহি—লক্ষাধিকেরও অধিক হইব। ইহা ভিন্ন উক্ত সিদ্ধ মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান নরনারীর সংখ্যা যে কত তাহা গণনা করিয়া স্থিরকরা কষ্টসাধ্য।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের এই পরমাত্মীয়গণের সহিত আমাদের পরস্পরের পরিচয় নাই, কোন প্রকার আদান প্রদানের উপায় নাই, এমন কি, কে যে কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহাও জানিবার উপায় নাই। অথচ ঐ সকল 'শ্রীশ্রীরাধারমণগণ' ভিন্ন আমাদের আর কে অন্তরঙ্গ বন্ধু—আর কে আপনা হইতে আপন জন আছেন? আর কাহার কাছে যাইয়া আমরা প্রাণ জুড়াইতে পারি, বা প্রাণের কথা কহিতে পারি? ইহার প্রতিকার কি?

আরও দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের অমিয় জীবনী যাহা "চরিত সুধা" নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতো অতীব সামান্য, তাঁহার পুন্য জীবন-কাহিনী এখনও বহুল পরিমাণে অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। সে সকল ভক্ত তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সুধা হইতে সুমধুর লীলা-কাহিনীগুলি অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক, কারণ দিন দিনই তাঁহার মর্ম্মী প্রাচীন ভক্তগণ দেহরক্ষা করিতেছেন। এ অমূল্য রত্ন উদ্ধারের চেষ্টা এই বেলা না করিলে পরে ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু কি উপায়ে আমরা উহা সংগ্রহ করিতে পারি তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়!

তৎপরে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কতস্থানে উৎসবাদি হইতেছে, কত মহানন্দজনক ঘটনা ঘটিতেছে, সেগুলির সংবাদ আমরা জানিতেও পারি না, এবং দিতেও পারি না।

বিশেষতঃ আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুভ্রাতা শ্রীল রামদাস বাবাজী দাদা মহাশয় শ্রীগুরু-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া এই যে কাঙাল বেশে নীরবে সারা ভারতময় শ্রীগৌর-প্রেমার্ণবে আপামরকে ভাসাইতেছেন,—দিন দিন সর্ব্ব সাধারণের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিতেছেন,—তাঁহার এই প্রচার কাহিনী মাত্র কয়েকজন ভক্ত ব্যতিত আর তো সকলেরই নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মথুরা নগরে তাঁহার দ্বারা শ্রীগুরুদেব যাহা করাইয়াছেন তাহা ভাবিলে আনন্দে আপ্লুত হইতে হয়।

এই সব সংবাদ প্রচারে বৈষ্ণব জগতের বিশেষ উপকার আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপরে শ্রীল রামদাদার দর্শনার্থী, কৃপাপ্রার্থী কত ভক্ত যে নিত্যই তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্ত ব্যাকুল হন, কখন তিনি কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন জানিবার জন্ত অনুসন্ধান করেন। সাধারণে কোথায় কবে তাঁহার শ্রীকীর্ত্তন হইবে শ্রবণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব থাকেন—কিন্তু এই সকল সংবাদ প্রচারের কোনই উপায় নাই। এই সকল বহুকারণে ব্যথিত হইয়া গিরিডি প্রবাসী শ্রীমান্ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক শ্রীল রামদাদার অনুগত শিষ্য ঐ সকল অভাব দূরিকরনার্থে আমাদের নিজস্ব একখানি বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার মানস করেন। এবং শ্রীল রামদাদার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি বলেন—**ভক্তি পত্রিকাইতো আমাদের রহিয়াছে, যাহা করিতে হয় উহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই করনা কেন? আবার**

স্বতন্ত্র ভাবে নূতন পত্রিকা প্রকাশের বাসনা কেন ?

তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণে—"ভক্তি পত্রিকা" খানিকে আমাদের 'শ্রীশ্রীরাধারমণগণের' নিজস্ব পত্রিকা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। অধিকন্তু আজ ২৭ বৎসর ধরিয়া এই শ্রীপত্রিকাখানি নির্ব্বিবাদে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে রত থাকিয়া ভক্তগণের মনপ্রাণ আকৃষ্ট করিয়াছেন। কোন দিনই ইহাতে পরনিন্দা, পরকুৎসা বা কৈতব জনিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় নাই। তাই ভারতের যেথানেই বাঙালী ভক্ত সেইখানেই ভক্তির গতি বিধি। অধিকন্তু ভক্তি পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বা প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধাম গত পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় এবং বর্ত্তমান সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন দাদা মহাশয়ও আমাদের পরাৎপর পরমাত্মীয়। বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীরাধারমণগণের সেবার্থে তাঁহার শ্রীপত্রিকা খানিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করিতে সানন্দে প্রস্তুত হইয়াছেন।

নব বর্ষ হইতে "ভক্তিতে" শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের পুণ্যকাহিনী, তাঁহার উপদেশামৃত, তাঁহার রচিত গীতাবলি, তাঁহার ভক্তগণের জীবনী, প্রভৃতি এবং শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক গীত সেই সুমধুর শ্রীকীর্ত্তন, তাঁহার নাম প্রেম প্রচার কাহিনী, তাঁহার ভ্রমণ তালিকা (কোথায় কোন দিন তাঁহার শ্রীকীর্ত্তন হইবে) লুপ্ত বৈষ্ণব তীর্থের বিবরণ প্রভৃতি এবং আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল নবদ্বীপ দাদার জীবনী (৩য় ভাগ) নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এতৎভিন্ন আমাদের মধ্যে কোন উৎসব সংবাদাদি, কি কোন ভক্তের তিরোধান সংবাদ প্রভৃতিও

মুদ্রিত হইবে। কাহারও কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহাও পত্রস্থ করা হইবে। এই সকল বিষয় লইয়া ভক্তিদেবীকে সারা ভারতময় আমাদিগের পরমাত্মীয়গণের গৃহে গৃহে বিরাজ করাইবার জন্য বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় উদ্যোগ করিতেছেন।

পরিশেষে আমাদের পরমাত্মীয়গণের প্রতি প্রার্থনা, আপনারা প্রত্যেকেই এই শ্রীপত্রিকা খানিকে নিজস্ব জ্ঞানে এক এক খানি গ্রহণ করুন। এবং এই শুভ সংবাদ আপনার পরিচিত শ্রীগুরু ভ্রাতাগণের মধ্যে প্রচারকরতঃ তাঁহাদের প্রত্যেককেই গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করুন। পত্রিকার মূল্যও যৎসামান্য, বার্ষিক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা কাহিনী অবগত আছেন, অত্র পত্রিকাতে প্রকাশ জন্য সত্বর প্রেরণ করুন। উৎসব সংবাদাদিও প্রেরণ করুন এবং আপনাদের পরিচিত যে যে স্থানে আমাদের শ্রীগুরু ভ্রাতাগণ বাস করিতেছেন তাহাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, ডাকঘর ও জেলা লিখিয়া অবিলম্বে **শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন, মাসিলা "ভক্তিনিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী (হাওড়া)** এই ঠিকানায় ভক্তি কার্য্যালয়ে প্রেরণ করুন।

এই ঠিকানা সংগ্রহের জন্য শ্রীশ্রীরাম দাদা এ অধমের প্রতি কৃপা আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুভ্রাতাগণ সকলে আমাদের কার্য্যের সহায় হউন ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

ভক্ত-পদরজপ্রার্থী
শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীশ্রীনীলাচল ধামে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবারই পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলে গমন করিয়া থাকেন। এবারেও বহু ভক্ত সঙ্গে বিগত ১লা আষাঢ় রওনা হইয়া যথাপূর্ব্ব গুণ্ডিচামার্জ্জনাদি সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। সৌভাগ্য ক্রমে এবার বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। কীর্ত্তনানন্দ উপভোগতো হইয়াছেই তন্মধ্যে অন্যান্য বার অপেক্ষা এবারে বিশেষ আনন্দ হইয়াছে বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দাস দাদার সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া। দাদা আমার শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া ভজন করিয়া এত কাল ধরিয়া যে অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন আজ তাহা অবিচারে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন।

দাদার আমার যেমন প্রশান্ত মূর্ত্তি তেমনই দৈন্যে ভরা প্রাণ। প্রত্যেক বাক্যটীই যেন কোন্ গভীরতম সিদ্ধান্ত সমুদ্রোত্থিত। যে ভক্ত যে ভাবে বুঝিতে পারিবেন দাদা সেইভাবেই তাহাকে লীলাতত্ত্ব, ভজনতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি উপদেশ করিতেছেন। শুনিলাম দাদা বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থান করিবেন। যাঁহারা দাদার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন না।

বিগত ছয় বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। ৩ বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, সাধনা নামক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। পূর্ব্বে উভয়ে একত্রে

শ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা চালাইতেন। উভয় পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক ছিলেন পরম পণ্ডিত ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণ গোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন। কি কারণে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় রাধাগোবিন্দ বাবু সোণার গৌরাঙ্গের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া সাধনা প্রকাশ করিলেন। আমরা দুইজন উপযুক্ত লোকের হাতে দুই খানি বৈষ্ণব পত্রিকা পরিচালনের ভার দেখিয়া অনেক বিষয় আশা করিয়া ছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ভিতরে ভিতরে উহাঁদের যতই মনোমালিন্য থাকুক পত্রিকার মধ্যে সেভাব প্রকাশ না পাইয়া যাহাতে পত্রিকা দুইখানি আদর্শ বৈষ্ণব পত্রিকা হয় তাহারই চেষ্টা উভয়ে করিবেন। কিন্তু পত্রিকার প্রকাশ ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের সে আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। কেন জানিনা উভয়েই উভয়ের দোষ দেখাইয়া পত্রিকায় বাদানুবাদ চালাইয়াছেন। পূর্ব্বেও আমরা এবিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি এবারেও উভয় পত্রিকার সম্পাদক দ্বয়কেই আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের এই বাদপ্রতিবাদের ভঙ্গিটী ত্যাগ করিয়া প্রভুর মঙ্গলময়ী লীলা কথাদির আলোচনা করিয়া সম্প্রদায়ের মঙ্গল করুন। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের উপদেশ দিবার কোন সামর্থ নাই, সে স্পর্দ্ধাও রাখি না, তবে তাঁহারাও যেমন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন আমরাও আজ ২৭ বৎসর যাবৎ ক্ষুদ্র হইলেও একখানি ধর্ম্ম পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি। যে ভাবে উহারা কার্য্য করিতেছেন আমাদের মতে পত্রিকার প্রচার বহুল হইলেও সম্প্রদায়ের মঙ্গল উহাতে যে বেশী হইবে তাহা মনে হয় না বরং বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। শ্রীগৌরসুন্দর পত্রিকায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল করুন ইহাও যেমন প্রার্থনা, সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিরোধ মিটাইয়া দিন ইহাও প্রার্থনা।

কলিকাতা "শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দির" হইতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছিল, কয়েক মাস যাবৎ আমরা আর পত্রিকা পাইতেছি না, সম্মিলনীর সভাপতি হইতে কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষিত এবং এক এক জন দিক্‌পাল্ সদৃশ। বিশেষতঃ সর্ব্বোপরি আছেন দাতাকর্ণ সদৃশ আমাদের মাননীয় মহারাজ কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়। এমতাবস্থায় পত্রিকা খানি যে বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। আশা করি সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে অমনোযোগী হইবেন না।

সুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক প্রেমকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় রথযাত্রা উপলক্ষে যে নীলাচলে গিয়াছিলেন বিগত শ্রাবণের শেষে কলিকাতা আসিয়াছেন এখনও আমরা তাঁহার কীর্ত্তণের তালিকা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে তিনি সদলে হাওড়া কৌঁড়ার বাগানে স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের কৃতিপুত্র শ্রীমান্ অনাথ বন্ধু ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে উৎসবে যোগদান করিবেন ইহা জানিতে পারিয়াছি। তাহার পরে কোথায় কি হইবে আগামী বারে তাহার তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যিক সুলেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত বর্ত্তমান সংখ্যায় "নিবেদন" নামক প্রবন্ধটীর উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভক্তি পত্রিকার পাঠকগণের সুপরিচিত বহু বৈষ্ণব পত্রিকার সুলেখক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহোদয় বহুদিন যাবৎ ভক্তি-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি দিয়া আসিতে

ছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি বৈষ্ণব জগতের এক মহান কার্য্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকায় ভক্তির পাঠকগণকে নিয়মিত ভাবে কিছু দিতে পারেন নাই। তারপর আজ যে মর্ম্মান্তিক সংবাদ তিনি পাঠাইয়াছেন তাহাতে শুধু আমরা নয় যিনি তাঁহার সহিত একবারও পরিচিত হইবার সুবিধা পাইয়াছেন তিনিই তাহাতে ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তিনি জানাইয়াছেন যে, বিগত ১৮ই শ্রাবণ শুক্রবার তাঁহার একমাত্র পুত্র ইহধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছে। ভট্ট মহাশয়কে প্রবোধ দিবার ভাষা আমরা খুজিয়া পাই না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি যেভাবে সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে বৈষ্ণব-জগতের কল্যাণ কামনায় জীবনপাত করিতেছেন, তাহাতে সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের শুভাশীষপূর্ণ প্রীতিই তাঁহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি প্রদান করিবে। আর আমরাও ভক্তির পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষ হইতে পরমানন্দময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই তিনি ভট্টমহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।

অমূল্য বাবুর এই দুঃসংবাদ শ্রবণে অনেকেই সহানুভূতি সূচক পত্রাদি পাঠাইতেছেন, সকলকে পৃথক ভাবে উত্তর দেওয়া এক্ষণে তাঁহার পক্ষে কষ্টকর সেই জন্য তিনি এই ভক্তি পত্রিকা দ্বারে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন সময়মত পত্রের উত্তর না পাইয়া যেন কেহ ক্ষুন্ন না হন এইটীই তাঁহার প্রার্থনা।

আমরাও শেষ বলিয়া রাখি, দাদা! সংসারের এ রীতি আপনার অজ্ঞাত নয়, তবে কেন আপনি বিচলিত হইতেছেন? জয় গৌর বলিয়া সব ভুলিয়া আপনার আরব্ধ কর্ম্মে লাগিয়া যাউন, শান্তিময় আপনার প্রাণে অবশ্যই শান্তি বিধান করিবেন।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা

(১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ৪৪৩-৪৪৪ চৈতন্যাব্দ)

বৈশাখ

একাদশী	৩রা সোমবার	ইং ১৬।৪।২৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা, অক্ষয় তৃতীয়া	৯ই রবিবার	ইং ২২।৪।২৮
জহ্নু সপ্তমী	১৩ই বৃহস্পতিবার	ইং ২৬।৪।২৮
একাদশী	১৭ই সোমবার	ইং ৩০।৪।২৮
শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী	২০এ বৃহস্পতিবার	ইং ৩।৫।২৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল যাত্রা	২১এ শুক্রবার	ইং ৪।৫।২৮

জ্যৈষ্ঠ

একাদশী	২রা বুধবার	ইং ১৬।৫।২৮
একাদশী	১৬ই বুধবার	ইং ৩০।৫।২৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা	২০এ রবিবার	ইং ৩।৬।২৮
একাদশী	৩১এ বৃহস্পতিবার	ইং ১৪।৬।২৮

আষাঢ়

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	৫ই মঙ্গলবার	ইং ১৯।৬।২৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা	১৩ই বুধবার	ইং ২৭।৬।২৮
একাদশী	১৪ই বৃহস্পতিবার	ইং ২৮।৬।২৮
রাত্রির প্রথম পাদে শ্রীশ্রীহরির শয়ন ও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ	১৫ই শুক্রবার	ইং ২৯।৬।২৮
একাদশী	২৯এ শুক্রবার	ইং ২৩।৭।২৮

শ্রাবণ

একাদশী	১২ই শনিবার	ইং ২৮।৭।২৮
একাদশী	২৭এ রবিবার	ইং ১২।৮।২৮

(শ্রীধাম বৃন্দাবনে দশমী বিদ্ধা না হওয়ায় পূর্ব্ব দিনই একাদশী)

ভাদ্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ	১০ই রবিবার	ইং ২৬।৮।২৮
একাদশী	১১ই সোমবার	ইং ২৭।৮।২৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ দিবা ৮।৩১ মিনিট মধ্যে	১২ই মঙ্গলবার	ইং ২৮।৮।২৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা সমাপন	১৪ই বৃহস্পতিবার	ইং ৩০।৮।২৮

(শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরদিন ১৫ই ঝুলন যাত্রা সমাপন হইবে)

শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা, রক্ষা বন্ধন	১৫ই শুক্রবার	ইং ৩১।৮।২৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত	২২এ শুক্রবার	ইং ৭।৯।২৮
একাদশী	২৫এ সোমবার	ইং ১০।৯।২৮

আশ্বিন

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত	৬ই শনিবার	ইং ২২।৯।২৮
একাদশী ও একাদশী অন্তে শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন	৯ই মঙ্গলবার	ইং ২৫।৯।২৮
মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামন দেবের অর্চ্চনান্তে পারণ	১০ই বুধবার	ইং ২৬।৯।২৮
একাদশী	২৩এ মঙ্গলবার	ইং ৯।১০।২৮

কার্ত্তিক

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	৭ই বুধবার	ইং ২৪।১০।২৮
একাদশী	৮ই বৃহস্পতিবার	ইং ২৫।১০।২৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা	১১ই রবিবার	ইং ২৮।১০।২৮
একাদশী	২২এ বৃহস্পতিবার	ইং ৮।১১।২৮
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা, অন্নকুট	২৭এ মঙ্গলবার	ইং ১৩।১১।২৮

(শ্রীধাম বৃন্দাবনে দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদয় সম্ভাবনায় পূর্ব্বদিন সোমবার হইবে।

অগ্রহায়ণ

গোপাষ্টমী	৪ঠা মঙ্গলবার	ইং ২০।১১।২৮
একাদশী	৭ই শুক্রবার	ইং ২৩।১১।২৮
মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীহরির উত্থান ও চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন	৮ই শনিবার	ইং ২৪।১১।২৮
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	১০ই সোমবার	ইং ২৬।১১।২৮
একাদশী	২১এ শুক্রবার	ইং ৭।১২।২৮

পৌষ

একাদশী	৮ই রবিবার	ইং ২৩।১২।২৮
একাদশী	২২এ রবিবার	ইং ৬।১।২৯

মাঘ

একাদশী	৮ই সোমবার	ইং ২১।১।২৯
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা	১২ই শুক্রবার	ইং ২৫।১।২৯
একাদশী	২৩এ মঙ্গলবার	ইং ৫।২।২৯

ফাল্গুন

বসন্ত পঞ্চমী শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	২রা বৃহস্পতিবার	ইং ১৪।২।২৯
মকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব উৎসব	৪ঠা শনিবার	ইং ১৬।২।২৯
একাদশী	৮ই বুধবার	ইং ২০।২।২৯

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব	৯ই বৃহস্পতিবার	ইং ২১।২।২৯
একাদশী	২৩এ বৃহস্পতিবার	ইং ৭।৩।২৯
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত	২৬এ রবিবার	ইং ১০।৩।২৯

চৈত্র

একাদশী	৭ই বৃহস্পতিবার	ইং ২১।৩।২৯
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবউৎসব ৪৪৪ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ	১১ই সোমবার	ইং ২৫।৩।২৯
একাদশী	২২এ শুক্রবার	ইং ৫।৪।২৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা সতীধর্ম্ম পরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ১৬১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়কে পত্র লিখিতে হইবে।

—০—

গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কথা

ছুরির ফলার উপর কিম্বা কাঁচি বা খুরের উপর অনেক সময় দাগ ধরিতে দেখা যায়, একটী কাঁচা আলু তাহার উপর কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করিলে দাগ উঠিয়া যায়।

—০—

টেবিলের উপর সাদা চাদর বিছাইয়া অনেক বাবুরা চা খাইয়া থাকেন কাজেই অনেক সময় ঐ চাদরে চায়ের দাগ ধরে। সদ্য সদ্য ঐ দাগের উপর খানিকটা লবণ চাপাদিয়া রাখিয়া কিছু সময় পরে গরম জলে ধুইয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়।

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

আশ্বিন
১৩৩৮

কোথা যাব ?

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

অকূল অগাধ এই ভবের সাগরে,—
ভাসা'য়ে জীবন-ভেলা ভাসিয়াছি স্রোতে ;
যেতে হবে কোথা, তাহা না ভাবি অন্তরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি ডুবি নানা মতে।
যতদূর আসিয়াছি অগ্রসর হ'য়ে,
পশ্চাতে এসেছি ফেলে শুধু বিফলতা ;
কতই বেদনা ফুটে উঠেছে হৃদয়ে,
আছে মোর প্রাণভরা দুখের বারতা।

আবার এখন হায় সে সব ভুলিয়া,
মাতিয়া উঠেছি আমি নবোৎসাহে যেন !
ল'য়েছি কর্ত্তব্য ভার মস্তকে তুলিয়া,
কোন্ আশে কোথা যেতে ভাসিয়াছি হেন ?
কুটীল আবর্ত্ত মাঝে পড়ে' প্রাণ যায়,
সংসার সমুদ্র পারে যেতে চায় প্রাণ ;
সে বাসনা পূর্ণ মোর হবে না কি হায়,—
যেথা যেতে চাই সে যে বড় রম্যস্থান !
স্বার্থ-বিষে কলুষিত এ ভব-সাগর,
তাহে উঠে বিসংবাদ-ঝটিকা তুমুল ;
বিদ্বেষ-বাড়বানল জ্বলে নিরন্তর,
মোহের কুয়াসা এসে করে পথ ভুল !
এ হেন সংসার-স্রোতে ভাসিয়াছি হায় !
কেমনে বাসনা মোর হবে বা পূরণ ?
তুমি না করিলে কৃপা, নাহি ত উপায় ;
দয়া কর দীনহীনে হে দীনশরণ !

* * * * *

হে প্রভো ! তোমারে চাহি;—তোমারে কি পাব ?
ভেসেছি সংসার-স্রোতে;—বল কোথা যাব ?

জ্ঞানাভিমান শূন্যতা *

(শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায় বি এ লিখিত)

মানুষ নানাপ্রকার জ্ঞান লাভ করিতে চায়, কিন্তু যদি ভগবানে শ্রদ্ধা না থাকে, তবে বহুবিষয় জানিয়া শুনিয়া ফল কি ?

যদি কোন মূর্খ কৃষকও ভগবানে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন হয়, তবে সে ভগবৎ ভক্তি-বর্জ্জিত, গর্ব্বিত দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষা নিশ্চই শ্রেষ্ঠ।

যে নিজের ভিতরে কত গলদ আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, সে আপনাকে দীন হীন না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, এবং অন্যে তাহাকে যতই প্রশংসা করুক না কেন, তাহাতে তাহার গর্ব্ব আসে না।

যদি আমি জগতের সমস্ত বিষয় জানিয়াও দয়া-ধর্ম্মপরায়ণ না হই, তবে তাহাতে ভগবানের কি ? কারণ তিনি আমার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিবেন না, কিন্তু আমি কাজে কি করিয়াছি তাহাই তিনি দেখিবেন।

নানারূপ জ্ঞান লাভের প্রবল তৃষ্ণাকে শান্ত কর, কারণ উহাতে মনের বিষম চাঞ্চল্য ও বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রায়ই তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, এবং লোকে যাহাতে তাঁহাদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে তজ্জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন।

জগতে এমন বিষয় অনেক আছে যাহা জানিলে কিছুমাত্র আত্মোন্নতি

---

* "Imitation of Christ" এর ২য় অধ্যায় হইতে এইটী অনূদিত হইল, তবে ইহা অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নহে। (লেখক)

হয় না ; যাহারা ঐ সব বিষয় লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে, তাহারা নিশ্চয়ই পণ্ডশ্রম করে সন্দেহ নাই।

তুমি যতই নানা বিষয় দেখিবে শুনিবে ততই তোমার বিচারশক্তি নানা মত 'ভারাক্রান্ত ও দোদুল্যমান হইবে। তবে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লাভ করিতে পার তাহা হইলে তোমার জীবন পবিত্র ও বুদ্ধি স্থির হইবে।

অতএব পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারায় জগতের প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছ তাহাতেই যেন অহঙ্কৃত না হও এজন্য সর্ব্বদা সাবধানে থাকিও।

যদি তুমি বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মনে কর যে, তুমি অনেক রকম বিষয় জান বা বুঝ, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও যে, তুমি যতগুলি বিষয় জান জগতে তাহা অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক এমন অনেক বিষয় আছে যাহার সন্ধান পর্য্যন্ত তুমি কিছুই জান না। অতএব বিদ্যার অভিমান করিও না বরং তোমার অজ্ঞানতা যে কত তাহাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। জগতে কত শত বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন তাহা জানা সত্ত্বেও তুমি তোমার বিদ্যা জাহির করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছ কেন ?

যদি তুমি কোন বিষয় জানিয়া বা বুঝিয়া থাক তবে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া বরং নীরবে থাকিতে চেষ্টা করিও। (তবে মহদাদেশে লোকহিতার্থে তাহা প্রকাশ করিতে পার।) নিজেকে দীন হীন বলিয়া জানা এবং অপরের দোষ দর্শন না করিয়া গুণ দর্শন করাই জ্ঞানের লক্ষণ।

যদি তুমি অন্যকে পাপাচরণ করিতে প্রত্যক্ষ দেখ, তথাপি আপনাকে তদপেক্ষা উচ্চ বলিয়া মনে করিও না। কারণ, আমাদের সকলেরই যে-কোন সময়ে অধঃপতন হইতে পারে, আর তুমি নিজের সম্বন্ধে এইরূপ

ভাবিও যে, "আমি সকলের অপেক্ষা দুর্ব্বল, আর কাহারও পতন হউক আর না হউক আমার পতন যেকোন মুহূর্ত্তেই হইতে পারে। অতএব হে করুণাময়। পরমেশ্বর! আমাকে রক্ষা করিও।" এইরূপ ভাবিলে পাপীর প্রতি ঘৃণা আসে না এবং আত্মাভিমান অন্তরে দাঁড়াইতে পারে না।

ধর্ম্ম-পত্রিকার উদ্দেশ্য

(শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্রদেব লিখিত)

সমাজে ধর্ম্ম, নীতি, সত্য এবং ভগবদ্ভক্তি প্রচার করাই ধর্ম্ম-পত্রিকার কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা সত্য। সত্যই ধর্ম্ম, নীতি এবং ভক্তির মূল। যেখানে সত্য নাই, সেখানে কখনই ধর্ম্ম, নীতি এবং ভক্তি থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক জীবের আচরিত কর্ম্মই জগতের বুকে একটা দাগ রাখিয়া যায়। আমাদের বাক্যগুলি বাতাসে মিলাইয়া যায় না, বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া উহা ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল বিধান করে। সত্যের গুণ চিরকাল আছে। মিথ্যার অপকারিতাও যাইবার নহে।

ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয়তা আজও সকলের প্রাণে আনন্দ বিধান করে। শকুনির মিথ্যা কথা, ছল চাতুরী এবং কপটতা এখনও লোকের প্রাণে ঘৃণা উৎপাদন করিয়া থাকে। দুষ্ট ব্যক্তির বার্ত্তা মনে জাগিলেও প্রাণ কলুষিত হয়। কুলোকের দর্শনে প্রাণে মন্দ ভাব আসেই আসে। সৎলোকের চরিত্র প্রাণে জাগিলে প্রাণ

পুলকিত না হইয়া পারে না। তাঁহার দর্শনে চির কলুষিত হৃদয়ও মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব-পত্রিকার মধ্যে আমরা যদি ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি এবং ভক্তি প্রভৃতির কথা পাঠ করি, তবেই হৃদয় পবিত্র হয়, প্রাণ আমোদিত হইয়া থাকে। আর যদি ইহার বিপরীত কথা পাঠ করা যায়, তবে হৃদয় মলিন না হইয়া পারে না। আমার এক বিশেষ বন্ধু ভাগবতোত্তম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কিশোর কর, উকীল মহাশয় এক পত্রে লিখিয়াছেন—"তোমরা দুগ্ধের কলসে মদ্য বিক্রয় করিতে বসিয়াছ।" বাস্তবিকই কথাটী সত্য। হৃদয়ে হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতারণা রাখিয়া আমরা যদি লেখনী ধারণ করি, তাহাতে সমাজের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইবে। যদি পরের মিথ্যা কুৎসা কীর্ত্তন ধর্ম্ম-পত্রিকার জীবনের ব্রত হয়, তবে তদপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? "থাকিলে পরের দোষ যতনে ঢাকিবে" শাস্ত্রে এই উক্তি থাকিলেও আমরা এই কথার বিপরীত আচরণই করিতেছি। ভক্তি-শাস্ত্র বলেন,—

"বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥"

আমরা বৈষ্ণবচরণের গুণ বর্ণনা ভুলিয়া গিয়া ব্যক্তিগত ভাবে বৈষ্ণবের দোষ কীর্ত্তন করি। ইহাতে আমরা যেমন নিজের নরকের পথ প্রশস্থ করিয়া থাকি, অন্যেরও তেমনই সর্ব্বনাশ হয়।

অসংকোচে মিথ্যা কথা বলিয়া আমরা সমাজের নিকট যেমন হেয় ও ঘৃণিত হই, সমাজকেও তেমনি এই সমস্ত ঘৃণিত পথে আকর্ষণ করিয়া থাকি।

অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা ধরা পড়িলেও আমরা লজ্জিত হই না।

আমাদিগের চরিত্র যে কত অবনত হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় হইতেই তাহা বুঝা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ কথা, আমরা একে অন্যের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করি। ইহা বড়ই ঘৃণার কথা।

বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করুন, এই সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা যেন বৈষ্ণব-পত্রিকা পরিচালনা করিতে পারি। স্বভাব দোষে কত বৈষ্ণবের প্রাণে যে আঘাত দিয়াছি, সীমা নাই। পরম কৃপালু পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ নিজগুণে এই অজ্ঞকে ক্ষমা করিবেন, প্রার্থনা। *

হিমালয় গমন বা কেদার বদরী ভ্রমণ কাহিনী

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত)

উদ্যোগ-পর্ব্ব

দেব, ঋষি, মুনিগণের তপঃক্ষেত্র, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির আবাসভূমি, ভগবান নর-নারায়ণ ও দেবাদিদেব শঙ্করের পার্ব্বতী-সহ বিহার-স্থান, সুর-নর-পূজ্য চিরতুষারময় এই হিমালয় প্রদেশ উত্তরাখণ্ড নামে বহুকাল হইতে

* গত ভাদ্রমাসের ভক্তি পত্রিকায় শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ ও সাধনা পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের মনোমালিন্য পত্রিকাদ্বারে জনসমাজে প্রচার হইতেছে দেখিয়া আমরা খুব দুঃখিত হইয়া বাধ্য হইয়াই দুই একটী কথা লিখিয়াছিলাম, সোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বেই এই লেখাটী আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। লেখার ভঙ্গীতে সম্পাদক মহাশয়ও যে, বাদ প্রতিবাদাদিতে দুঃখিত তাহা বেশ বুঝা গেল। আশাকরি আমরা অতঃপর ইহাঁদের পত্রিকায় আর ঐ সকল দেখিতে পাইব না। (ভঃ সঃ)

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। ভারতের যাহা কিছু জ্ঞান-গরিমা তাহা এই উত্তরাখণ্ড হইতেই একদিন প্রচারিত হইয়াছিল; এ স্থানের প্রতি পর্ব্বত, নদ, নদী, বন, উপবন আজিও সেই প্রাচীনতম ঋষিগণের নামের সহিত স্মৃতি-বিজড়িত হইয়া অতীতের গৌরব কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। এ অঞ্চলে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন ঋষির আশ্রম ছিল না। এই জন্যই ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট এই উত্তরাখণ্ড পরমতীর্থরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে বদরিকাশ্রম নর-নারায়ণরূপী ভগবানের তপঃক্ষেত্র। এজন্য হিন্দুর চারি ধামের মধ্যে এটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধামরূপে গণ্য হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন "কলিকালে ভারতের সমুদায় তীর্থ ও দেবদেবী এই উত্তরাখণ্ডেই অবস্থান করিবে।" হিন্দিতে চলিত কথায় আছে হিমালয়ের "যেৎনে কঙ্কর,—তেৎনে শঙ্কর।" ইহাই স্বর্গের দ্বার। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব এইপথেই স্বর্গে বা মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন। আমাদের প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি অনেকেরই যে এইস্থানে আগমন হইয়াছিল—বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। অধিকন্তু ধামসত্রে দেখা যায়, বদরিকাশ্রম মাধ্ব সম্প্রদায়েরই শ্রীধাম। *

উত্তরাখণ্ড কেবল তীর্থ হিসাবে নয়—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। হিন্দু ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশেরও কত পর্য্যটক প্রতি বৎসর এই সব স্থানের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইতে আগমন করেন।

এই ভূ-স্বর্গ দর্শন জন্য বাল্যকাল হইতে প্রাণে বাসনা হইয়াছিল। হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় যত বই, যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল,

* এই প্রবন্ধটীর কিয়দংশ শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে মুদ্রিত হইয়াছিল, পাঠকগণের পাঠের সুবিধার জন্য আমরা সে অংশও পুনরায় মুদ্রিত করিলাম। প্রবন্ধটী খুব দীর্ঘ প্রতিমাসেই কিছু কিছু প্রকাশ হইবে।
(ভঃ সঃ)

মনে হয়, তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি। তিনবার যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া শেষবারে মহাপ্রভুর কৃপায় এ অধমের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়।

পূর্ব্বে বদরী-নারায়ণ গমন করা বড়ই কঠিন ছিল। হরিদ্বারের কিছু দূরেই "লছমন-ঝোলা" পার হইতেই যাত্রীদের প্রাণ হারাইতে হইত। তখন সারা পথে বিপদসঙ্কুল দড়ির ঝোলা এবং পথ ঘাট অতীব ভয়াবহ ছিল। কাজেই যাত্রিগণকে উইল করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইত। সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন গৃহ-যাত্রী পূর্ব্বে খুবই কম হইত। এখন কিন্তু সেরূপ আর নাই। এখন ২৫।৩০টী পুলের সবগুলিই লৌহ বা কাঠের হইয়াছে, পথঘাট স্থানে স্থানে ভয়াবহ থাকিলেও মোটের উপর মন্দ নয়। অধিকন্তু যাত্রিগণের সুবিধা অসুবিধার জন্য গবর্ণমেন্টেরও বিশেষ লক্ষ্য আছে। এই সব কারণে বর্ত্তমানে গৃহি-যাত্রীর সংখ্যা প্রতি বৎসরই বর্দ্ধিত হইতেছে। আনন্দের বিষয় বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যাও প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে।

১৩২৯ সালে আমরা যাত্রার জন্য সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া মোট্ ঘাট্ বাঁধ্‌চি এমন সময়ে জনৈক বন্ধু একখানি "দৈনিক বসুমতী" আনিয়া হাতে দিতে, তাহা পড়িয়া দেখি—

"লক্ষ্ণৌর ২৫ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেসব হিন্দু তীর্থযাত্রী বদরীনাথ যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, গত মার্চ্চ মাসে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ গাড়োয়াল রাজ্যে আহার্য্যের অনটন অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সুতরাং তীর্থকামিগণ যেন এ বৎসর সেখানে না গিয়া অপর কোন সুবিধাজনক বৎসরে যাইবার ইচ্ছা করেন। যাঁহারা এই সতর্কতা অগ্রাহ্য করিবেন তাঁহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইবে। এমন কি লছমন ঝোলায় যাত্রিগণের পথ রুদ্ধ করাও প্রয়োজন হইতে পারে।"

পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া বাধ্য হইয়াই যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে

হইল। আবার যদি এক বৎসর বাঁচি ও যাত্রার সুবিধা থাকে, তবে যাইতে পারিব ; কিন্তু সে অনেক দূরের কথা—এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া মোট্ ঘাট্ খুলিয়া রাখিলাম। পরে শুনিয়াছি, অনেক যাত্রী, যাঁহারা ঐ সংবাদ না জানিয়া, বদরী যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন—তাঁহাদের লছমন-ঝোলা হইতে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন—আর যাঁহারা কল-কৌশল করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কষ্টের অবধি ছিল না। প্রচুর পয়সা দিয়াও খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে একবৎসর কাটিয়া গিয়া—আবার বৈশাখ মাস আসিলে আমাদেরও যাত্রা করিবার জন্য প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এবার গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ নিষেধ আজ্ঞা আছে কি না, জানিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া একখানি পত্র "কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে" লিখিয়া পাঠাইলাম। কয়েক দিন পরে সেবাশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারীর উত্তরে জানিতে পারিলাম—"এবারে যাত্রীদের যাইবার কোন বাধা নাই।" কিন্তু বদরী নারায়ণজীর মন্দিরের দরজা কবে যে খোলা হইবে, তাহার সংবাদ ঠিক দিতে পারিলেন না।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে ৺কালীপূজার পরে বদরীনাথের মন্দিরের দরজা বন্ধ হয় এবং ৬ মাস পরে বৈশাখ মাসে চন্দন যাত্রার বা ফুল-দোলের দিনই মন্দিরের দরজা খুলিবার প্রথা ; কিন্তু যে বৎসর বরফ খুব বেশী পড়ে, সে বৎসরে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রথম যে দিন দরজা খোলা হইবে, সেই দিনে ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য বহু যাত্রী জমায়েৎ হয়। সকলেই ঐ বৈশাখী পূর্ণিমাকে লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু যেবারে বরফ গলিয়া পথ ঘাট পরিষ্কার হয় না—দরজা খুলিতে দেরী পড়ে, সেবারে যাত্রিগণের কষ্টের অবধি থাকে না। তবে ঐরূপ পুণ্যকামিগণের মধ্যে পাঞ্জাব বা অন্যান্য দেশীয়

বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু যাত্রীই বেশী থাকেন, বাঙ্গালী বড় একটা বেশী থাকে না।

কেদারনাথে বদরী অপেক্ষা খুব বেশী বরফ, এজন্য ওখানে শ্রীমন্দির খোলার ব্যতিক্রম প্রায়ই হইয়া থাকে। এবারে কেদারনাথের মন্দির খুলিবার বিলম্ব হইয়াছিল, আমাদের গ্রামের পার্শ্বে সুখচর গ্রাম হইতে অনেক যাত্রী, যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ মন্দির খোলা না হওয়ার জন্য পথিমধ্যে পড়িয়াছিলেন ও তাঁহাদের অনেক অর্থ ব্যয় এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক—আমাদের যাবার সব ঠিক হইয়া গেল,—আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম,—দুইখানি বদরী যাত্রীর পুস্তক এবং একখানি মানচিত্র সঙ্গে নিলাম। *

আমাদের গ্রামে এ পর্য্যন্ত কোন লোক বদরিকাশ্রমে গমন করে নাই, বলিতে গেলে আমরাই বর্ত্তমানে বদরী নারায়ণের প্রথম যাত্রী। পানিহাটীর এক ক্রোশ উত্তরে প্রসিদ্ধ শ্রীপাট খড়দহ গ্রাম হইতে ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বন্ধু বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা ও উপদেশ নিবার জন্য খড়দহে গিয়া সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া আসিলাম।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আমরা পরিব্রাজকের মত গমন করিব, তাহাতে আমাদের পাণ্ডা ধরিবার আবশ্যক কি? পাণ্ডা মহারাজদের ফাঁদে

---

* বদরীনাথ যাত্রীদের কি কি দ্রব্য সঙ্গে রাখিতে হইবে এবং বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিতে ফিরিতে আপদ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় সম্বন্ধে, আমরা ভ্রমণ করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সে সব কথা শেষে বিস্তারিত ভাবে লিখিব। তাহার দ্বারা হয়তো অনেক যাত্রীর উপকার হইতে পারিবে। (লেখক)

পড়িলেই খরচান্ত হইতে হইবে। কিন্তু খড়দহের বন্ধুটী বুঝাইয়া দিলেন যে, গৃহীর পক্ষে ওসব তীর্থে পাণ্ডার আশ্রয় লওয়া বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ পদে পদে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। পাণ্ডা এবং কাণ্ডি বা মুটে করিতেই হইবে।

যাহা হউক, পাণ্ডা কোথায় পাব, কে হইবে ইত্যাদি ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি হঠাৎ একদিন এক পাণ্ডা ঠাকুর স্ব-শরীরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া হাজির! কি করিয়া যে আমাদের বদরী-গমন সংবাদ ইনি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর আসিয়াই কেদারনাথের প্রসাদ এবং বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজিতে ছাপান কাগজ আমার হাতে দিলেন।

ঠাকুরটীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া যাত্রাপথের সুখ দুঃখ, আপদ বিপদ প্রভৃতির কথাবার্ত্তা হইল; দেখিলাম বেশ লোক, তবে এ মূর্ত্তি—এ ভাব ওঁর স্বস্থানে দেখিতে পাইব কিনা তাহারও সন্দেহ হইয়াছিল। ইনি কেদারনাথের পাণ্ডা; নাম দাতারাম মদনমোহন শর্ম্মা, স্বর্গীয় পণ্ডিত কেশোরাম শুকুলের পুত্র। ঠিকানা ফাউলী গ্রাম, ডাকঘর গুপ্তকাশী জেলা গাড়োয়াল। কলিকাতায় ৬০নং অপারচিৎপুর রোডে বাসা।

বদরীনাথের পাণ্ডারও ইনি এজেণ্ট স্বরূপ। সেখানকারও ছাপান কাগজ ইনি দিলেন তাহাতে আমাদের ভাবী পাণ্ডা ঠাকুরের নাম দেখিলাম —উমাশঙ্কর চন্দ্রাপ্রসাদ "চুণারীর ধ্বজাধারী"। মোকাম ও ডাকঘর দেবপ্রয়াগ, জেলা গাড়োয়াল। ইনি ক্রোড়পতি লোক। এঁর সব-এজেণ্ট আসিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে।

পাণ্ডাদের কর্ম্মচারীরা হরিদ্বারে থাকে। তাঁহারা এক এক দলের সঙ্গে দুই জন করিয়া (কেদারনাথের একজন ও বদরীনাথের একজন) লোক দিয়া থাকেন। (এঁরা এদের 'গোমস্তা' ব'লে থাকেন) গোমস্তারা যাত্রীদের

বরাবর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, যেখানে যাহা দার্শনীয় আছে তাহা দেখাইবে, বাজার হাট করিবে, এবং জল তুলিয়া দিবে। এইগুলি গোমস্তার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এর জন্য যাত্রীদের গোমস্তাকে কিছু দেবার নিয়ম নাই, পাণ্ডা ঠাকুর গোমস্তাকে তার প্রাপ্য দিবেন। তবে পাণ্ডা মহারাজ যে নিজের বাক্স হইতে গোমস্তাকে বিদায় করিবেন না, সে কথাটা আর কাহাকেও বোধহয় বুঝাইতে হইবে না। আমাদেরই মাথা হইতে টেক্স তুলিয়া নিবেন। কিন্তু এই গোমস্তারা বড়ই বিশ্বাসী ও অনুগত। সারা পথ ভৃত্যের মত আজ্ঞাবহ হইয়া যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। যাত্রিগণের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য সর্ব্বদাই উদগ্রীব হইয়া থাকে। এই সব কারণে যাত্রীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোমস্তাদের বেশ ভাল করিয়াই বিদায় দান করে।

যাহা হউক্ কেদারনাথের পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া তাঁহাকেই আমাদের পাণ্ডা ঠিক করা হইল। কিন্তু এই পাণ্ডাঠাকুরের যাত্রার বিলম্ব আছে; কারণ, তাঁহার আর আর যাত্রীরা বিলম্বে বাহির হইবেন। আমরা কিন্তু দেরী করিতে পারিব না, ১১ই আষাঢ় (মঙ্গলবার) পানিহাটীর দণ্ড মহোৎসবের পূর্ব্বে আমাদের ফিরিয়া আসিতেই হইবে। এ জন্য পাণ্ডাঠাকুর ভেবে চিন্তে তাঁর হরিদ্বারের ঠিকানা দিলেন, সেইখানে গেলেই তাঁর লোক আমাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। আর পাছে আমরা বে-হাত হইয়া পড়ি বা অপর পাণ্ডা আমাদের অধিকার করে, এজন্য তিনি একখানি ছাপান কাগজে আমার নাম স্বাক্ষর করিয়া নিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "আপনার এই স্বাক্ষরযুক্ত কাগজ যিনি আপনাকে হরিদ্বারে দেখাইবেন, তাহাকেই আমার লোক বলিয়া বুঝিবেন।"

আমরা হরিদ্বারে প্রথমে যে পাণ্ডার বাড়ীতে উঠিব তাহারও ঠিকানা দিলেন। নাম পান্নালাল কুম্ভকর্ণ, "এক কথাওয়ালা" ব্রহ্মকুণ্ড, হরিদ্বার।

পাণ্ডাঠাকুর খুসী হইয়া গেলেন। আমরাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে

লাগিলাম। আগে কথা হইয়াছিল আমরা ৩।৪ জন বন্ধু মিলিয়া যাত্রা করিব; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের গমন সংবাদ প্রচার হওয়ায় শেষে সর্ব্বসমেত আমরা ২৬ জন যাত্রী হইলাম। এই ২৬জনের মধ্যে স্ত্রীলোক ছিলেন ১৫ জন। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" এই নীতি পালন জন্য আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও মাতৃস্থানীয়া ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের উপরোধ অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলাম না। তিন স্থানের যাত্রী লইয়া আমাদের দল গঠিত হইল। প্রথম পানিহাটী ও নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক, এদের দলপতি হইলেন আমার এক বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ দাস। দ্বিতীয় মেদিনীপুর জেলার শ্যামচক নামক স্থানের জমিদার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ রায় মহাশয়, ইঁহার সঙ্গে ইঁহার গুরুদেব, মাতা, স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধব সহযাত্রী হইলেন। তৃতীয়—লালগড়ের রাজা বাহাদুরের মাতৃদেবী। তিনি, এক রাজকুমার এবং ম্যানেজার ও ভৃত্য সহিত সাথী হইলেন। রাজমাতাঠাকুরাণী নিজের পরিচয় অতি গোপন রাখিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাহার কারণ, পাণ্ডা মহাশয়েরা তাঁহার পরিচয় পাইলে গুড়ের গাছ পাইয়া বসিবেন। কিন্তু রাজমাতাঠাকুরাণী গোপনভাবে আমাদের সহিত গমন করিলেও প্রত্যেক তীর্থে, তিনি যেরূপ ব্যয়-ভূষণ বা দানধ্যান করিয়াছিলেন তাহা রাজবংশেরই উপযুক্ত। অতিরিক্ত খরচের জন্য রাজা বাহাদুরকে টেলিগ্রাম করিয়া পুনরায় তাঁহাকে অর্থ আনাইতে হইয়াছিল।

কালীচরণ দাস আমার একটী বন্ধু। আমার এই দুর্গম পথে যাবার কথা শুনিয়া অবধি তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, তাহার ধারণা দাদাকে হয়তো আর ফিরিয়া পাইব না। তাই একদিন ফটোগ্রাফার ডাকিয়া আমার ফটো তুলিয়া লইয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে আমাদের যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

বৈরাগ্যের প্রবোধ

(গত আষাঢ় মাসের প্রকাশিত অংশের অবশিষ্টাংশ)

হারাধন ও তাহার পত্নী সব শুনিল। ঠাকুর বলিলেন, সমস্তই গোবিন্দের ইচ্ছা। তিনি ক্রীড়াময়, তিনি কৌতুকময়। এ সবই লীলা-ময়ের লীলা। তিনি আপন মায়ায় আপনি জীবদেহ নির্ম্মাণ করেন। জীব-দেহে আত্মারূপে আপনি প্রবেশ করেন;—আপনি মারেন,—আপনি মরেন। তিনি আপনি কান্দেন,—আপনি হাসেন। এই সংসার তাঁহার রঙ্গমঞ্চ। ইহাতে তিনি নিত্যরঙ্গ করেন। তিনি রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। যিনি তাঁহার এই বিপুল অভিনয়ের মাধুর্য্য অনুভবে সমর্থ, তিনিই সেই লীলাময়ের লীলারস আস্বাদন করেন। তিনি আনন্দময়। অহঙ্কারদ্বারা যে বিমূঢ়, সে-ই মনে করে আমি কর্ত্তা, বস্তুতঃ কাহারও কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আমরা নিজের ইচ্ছায় সংসারে আসি নাই—নিজের ইচ্ছায় মরিতেও পারিব না। আজ যা মনে করি—কাল তাহার বিপরীত হয়। তাই বলি, যিনি পুত্র দিয়াছিলেন, তিনিই নিয়াছেন। আমরা তাঁহার সামগ্রী পাইয়া হাসিয়া ছিলাম। এখন তাহার সামগ্রী তাঁহাকে লইতে দেখিয়া কান্দিতে বসিলাম। এ কান্নায় সেই রসিকেন্দ্র চূড়ামণি হাসিতেছেন। ইহাও একটু বুঝা উচিত।

হারাধন অমনি বলিল, হা প্রভো, তা সত্য! তার ধন তিনি নিলেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কি আছে! চন্দ্রবাবু বলিলেন—এ লোকটী কে? ইনি ত বেশ তত্ত্বজ্ঞানী।

ঠাকুর—ইনি বাস্তবিকই জ্ঞানী। ইহারও একটি কর্ম্মক্ষম যুবক পুত্র

অকালে মারা গিয়াছে। তার জন্য ইঁহার কোন কষ্ট নাই। হারাধনকে জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করায়, হারাধন একটু মনে মনে ফুলিয়া উঠিল। একটু জ্ঞানীর মত বলিতে লাগিল,"হা বাবু, ওবিষয়ে একরূপ ঠিক হ'য়েছি! যা যাওয়ার তা গেছে,—কাঁদলে ত আর সে ফিরে আস্‌বে না! সংসারের এই জন্ম মৃত্যু হরদম্ চল্‌ছে। এটা জন্মে, ওটা মরে, এটা হাসে, ওটা কান্দে। সবই গোবিন্দের ইচ্ছা, এ তাঁর খেলাই বটে!

বৈকালে ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত খুলিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ শুনাইলেন। প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপু অত্যাচার করিতেছে, আর প্রহ্লাদ হরিনামে তন্ময় হইয়া আছেন। নামে কি.দৃঢ়তা—হরিপাদপদ্মে কি নির্ভর—এবং শ্রীভগবানে কি বিশ্বাস।

হারাধন পত্নীর সহিত তাহা শুনিল। রাত্রে স্ত্রী পুরুষে একত্রে বলাবলি করিতে লাগিল, "ঠাকুর যা বলেন তা সত্যই বটে। জীবনের অর্দ্ধেক যায় ঘুমে আর অর্দ্ধেকের বার আনা যায় খেলায় ধূলায় এবং বার্দ্ধক্য ও জরায়। যে কটা দিন থাকে তাও কেবল ধন পরিজনের মিথ্যে ভাবনায়ই যায়। সুতরাং শ্রীভগবানের নামে প্রেমে যে একটা সুখশান্তি তা আর বোঝার সময় কৈ? এবার জীবনটা মিথ্যাই গেল! সব প্রভুর ইচ্ছা।"

প্রত্যহ ঠাকুর হয় ভাগবত না হয় গীতা পাঠ করেন। প্রায় পথে পথে পণের দিন গত হইল। হারাধনের মন ফিরিয়া গেল। সে তখন একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাবার জন্য ব্যাকুল হইল। ঠাকুর বলিলেন—তাই ভাল। তবে গতিখালি যাইয়া টাকাগুলো নিয়া এলে খুব কাজ হবে। তীর্থে ত টাকারও দরকার।" ঠাকুরের কথায়, হারাধন গতিখালি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইল। দু'দিন পরে ঠাকুর হালিসহর আসিলেন। হালিসহরে মধু ঠাকুর খুব টাকাওয়ালা লোক ছিল। ঠাকুর পঞ্চানন মুখুর্য্যের বাড়ী উঠিয়া তাহার খবর জিজ্ঞাসা করিলেন।

পঞ্চানন কহিল—মধুর খবর এখনও আপনি পান নাই? আহা তার কথা আর কি বলিব! ভগবান গোবিন্দের খেলা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝার সাধ্য নাই। যে মধু অতি দরিদ্র ছিল, সে কত কষ্টে প্রথম প্রথম নারিকেল, আম জাম, ঝাঁকা ভরিয়া বিক্রী করিয়া যৎসামান্য লাভ পাইত; তদ্বারা কিছু টাকা করিয়া তাই শেষে লগ্নী করিয়া ক্রমে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত করিল। কোন সন্তানাদি নাই, সকলেই তাকে কাশী যাওয়ার পরামর্শ দিত, সে কিছুতেই যাইত না। এদিকে চোর ও গুণ্ডার দল তার টাকা চুরি করিতে নানারূপ কল কৌশল পাকাইতে লাগিল। শেষে একদল লোক মিলের বাবু সাজিয়া তার বাড়ী আসিল। তারা বলিল, আপনি পণের হাজার টাকা গৌরীপুর মিলে ধার দিলে একমাস পরে বিশ হাজার টাকা পাইবেন। যদি দিতে পারেন তবে সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করিতে চলুন।

মধু বিশ্বাস করিয়া মিলে গেল। সেখানেও একজন বড় বাবু হইয়া বসিয়াছিল। সে মধুকে চেয়ার পাড়িয়া বসাইল এবং নিজে সাহেবের কামরায় গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব বলিলেন, "আমার সঙ্গে আর দেখা করার প্রয়োজন নাই। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা আনিয়া দিলেই হইবে। পর মাসের পণের তারিখে মায় সুদ বিশ হাজার টাকা পাইবে।"

মধু তাই বিশ্বাস করিয়া বাড়ী আসিল। পরদিন কলিকাতা যাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে পণের হাজার টাকা তুলিয়া আনিল। রাত্রিকালে স্বামী স্ত্রী শয়ন করিয়া আছে এমন সময় গুণ্ডারা সিঁদ কাটিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের হাত মুখ বান্ধিয়া ফেলিল, এবং মাথায় বাটালির আঘাত মারিয়া দুইজনকেই খুন করিয়া গৃহের সমস্ত জিনিষ লইয়া গেল। পরদিন কেহ কোন খোঁজ করে নাই। তার পরদিন লোকের

নজরে পড়িল। পুলিশ আসিয়া লাস চালান দিল। খুব তীব্রভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোন কিছুই আস্কারা হয় নাই।

তারপরে তার যে পণের হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত আছে তার জন্য তার দুই ভগ্নীর দুই ছেলে মোকদ্দমা আরম্ভ করে। এক জন এক উইল হাজির করে। সে উইল মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং সে ভাগিনেয় জালিয়াতির অপরাধে জেলে যায়। তার পুত্র গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়া অন্য ভাগিনেয়কে সেদিন খুন করিয়াছে। এখন তাহারই তদন্ত হইতেছে। কেবল টাকার জন্য এত অনর্থ। প্রভো, ইহা যে কি কাণ্ড হইতেছে তাহা আর কি বলিব। হায়রে লোভ, আর হায়রে টাকা! প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ জীবনে আর টাকার মানুষ না হই।"

হারাধন শুনিয়া হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে বলিল, "ঠাকুর চলুন, আর এ সব গ্রামে গ্রামে না ঘুরিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাই। আর কিছু ভাল লাগে না। যেখানে যাই, সেখানেই হয় অকাল মৃত্যু, না হয় খুন, না হয় মোকদ্দমার কথা। এ সকল আর ভাল লাগে না। যত অন্যায় অত্যাচারের কথা আর সহ্য হয় না।

ঠাকুর বলিলেন—গতিখালি যাইয়া টাকগুলি লইবার ইচ্ছা করি।

হারাধন—আর টাকা! এই ত টাকার দশা। আর টাকার দরকার নাই। যা লাগে আমি দিব।

হারাধনের স্ত্রী—তাই ত! সে দিন ধনাই সেখ ও ভজা ডোম পাওনা টাকা চাওয়ায় আমাদিগকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া গিয়াছে। আর প্রভু, সে দেশে যাইয়া কাজ নাই। চলুন শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাই। প্রভুর ধামে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ। যে দিন

কিছু না জুটিবে সেদিন হা গোবিন্দ, হা রাধারাণী বলিয়া শ্রীযমুনার জল পান করিব। চলুন শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করি।

দুর্গেশ ঠাকুরের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। হা গোবিন্দ! বলিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তার পরদিনই শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

লোকের অবস্থা দর্শন করিয়া, লোকের ধনজনের পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া, এবং সজ্জন সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া শোক সন্তপ্ত চিত্তে যেমন বৈরাগ্যের উদয় হয়,—যেমন সান্তনা পাওয়া যায় তেমনটী বোধহয় আর কিছুতেই হয় না।

শ্রীভুলুয়া বাবা।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত)

(১৯)

পাষানও বুঝি গলিল। এমন অপূর্ব্ব ব্যাপার জগাই কখনও দেখে নাই। সে স্তব্ধ হইয়া নিতাইর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জগায়ের মন অমনি দরবিয়া গেল।
স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল॥

মাধাই কিন্তু ইহাতে একটুও নরম হইল না। তাহার চিত্ত জাগাই অপেক্ষা শত গুণে কঠিন। তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। নিকটে

একখণ্ড কলসীর কানা পড়িয়াছিল. তাহাই তুলিয়া লইয়া অতি জোড়ে সে নিতাইর মস্তকে ছুড়িয়া মারিল। নিত্যানন্দের মস্তক হইতে তাহাতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, অপূর্ব্ব ব্যাপার! নিতাইর কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই।

ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
"গৌর" বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥

নিতাই আনন্দে গৌর গৌর বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন এবার ইহারা উদ্ধার পাইবে। মাধাইর কিন্তু তখনও ক্রোধ যায় নাই, সে আবার একখণ্ড কলসী ভাঙ্গা লইয়া মারিতে উঠিল। অমনি জগাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল, কর কি? বিদেশী অবধূতকে মারিয়া আমাদের কি পৌরুষ হইবে?"

নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে দুই ভাইকে বলিতেছেন—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

এস্থলে একটী প্রাচীন পদ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছিনা। যথা—

"সংকীর্ত্তন ছলে গৌর নিতাই নগরে বাহির হৈল।
জগাই মাধাই যথা বসিয়াছে তথা উপনীত হৈল॥
খোল করতাল, বিষম জঞ্জাল, ভাবিল সে দোন ভাই।
মারিবার তরে সুরাভাণ্ড করে, চলিল পশ্চাতে ধাই॥
প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস আর, দাঁড়াইল হস্ত মেলি।
সুরাভাণ্ড কান্ধা হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি॥

নিতাই ললাটে সে কান্ধা লাগিল, ছুটিল শোণিত নদী।
তবু অবধূত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভবে যদি ॥
আয় দেই কোল, বল হরি বোল, আয়রে মাধাই ভাই ॥
শ্যামদাস কহে, এমন দয়াল কোন কালে দেখি নাই ॥"

পদকর্ত্তা হরিদাস বলেন—

"মূঢ় পাষণ্ডীছিল, জগাই মাধাই দুহু,
কাঁধা ফেলি মারিল কপালে।
রুধিরে বহিল নদী, দুবাহু পসারি তবু,
পঁহু দোহে করলহি কোলে ॥"

প্রভু পশ্চাতে থাকিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। অগ্রে এত যে কাণ্ড হইল তাহা তিনি কিছুই জানেন না। বোধকরি তিনি নিত্যানন্দ মহিমা জগৎকে দেখাইতেছেন। জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা নিতাইর দ্বারাই হউক। প্রভু নৃত্য করিতেছেন এমন সময় একজন ভক্ত দৌড়াইয়া আসিয়া সম্মুখের ঘটনা বলিলেন। প্রভু শুনিয়া সত্বর নিতাইর নিকট চলিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখেন—

নিতায়ের অঙ্গে সব রক্তপড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ নেহারে ॥
প্রেমভরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে ?

বলিতে বলিতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন "হারে পাপাত্মাগণ ! চির জীবন ঘোর পাপ করিয়াও কি তোদের ক্লান্তি আসিল না। আজ শ্রীনিত্যানন্দকে আহত করিয়া কি তাই তোরা তোদের পাপের জন্য

পূর্ণ করিলি? নিত্যানন্দ তোদের কোন দোষ করেন নাই। তাহাতে আবার তিনি বিদেশী সন্ন্যাসী। তিনি ক্রোধহীন, ভুবনের বন্ধু, আনন্দময় অভিমান শূন্য—তাঁহাকে আহত করিয়া তোদের পাপব্রত পূর্ণ হইয়াছে। হ্যারে তোদের এতই যদি ক্রোধ হইয়াছিল তবে আমাকে মারিস নাই কেন? এখন পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে, তোরা দণ্ড গ্রহণ কর।"

তখন সেই মহা তেজস্বী দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির নরঘাতকদ্বয় তাহাদের নিজ বাড়ীতে আপনাদের সৈন্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়াও প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিল। যেমন ঘোরতর অপরাধী বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দণ্ড গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিতে থাকে, জগাই মাধাইও প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া সেইরূপ কাঁপিতে লাগিল। তাহাদের নিমাই পণ্ডিত আজ কালান্তক যমের মতই তাহাদের চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে। আরও তাহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা অপরাধী এবং প্রভু তাহাদিগের বিচার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। জগাই মাধাই প্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাবে অভিভূত হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল, এমন সময়ে প্রভু "চক্র" "চক্র" বলিয়া চক্রকে আহ্বান করিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ "চক্র" "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন তখন ভক্তগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন। মুরারির দেহে শ্রীহনুমানের আবেশ হইত। হনুমান-ভাবে মুরারি গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, প্রভু! সুদর্শন চক্রকে আবাহন করিবার ত আবশ্যক নাই, আমাকে অনুমতি করুন, আমিই এই দুই পাপীকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিতেছি।

নিমাই "চক্র চক্র" বলিয়া ডাকিতে নিতাই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এখন আবার মুরারি গুপ্ত দুই ভাইকে বধ করিবার জন্য প্রভুর নিকট অনুমতি চাওয়াতে নিতাই আপনার মাথার বেদনা ভুলিয়া গিয়া মুরারির

হাত দু'টী ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, ক্ষমা দাও" ইহা বলিয়া নিতাই পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন সুদর্শনচক্র অগ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া জগাই মাধাইর দিকে আসিতেছে! তখন নিতাই ব্যস্ত হইয়া সুদর্শন চক্রকে করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "সুদর্শন! ক্ষমা দাও। তুমি এই দুই ভাইকে বধ করিও না। আমি প্রভুর পায়ে ধরিয়া ইহাদের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লইতেছি।" ইহা বলিয়া নিতাই ব্যস্ত হইয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতেছেন" প্রভু তুমি আপন প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলে, তুমি না বলিয়াছিলে এই অবতারে চক্র ধরিবে না? ভক্তি ও কারুণ্য রসে ডুবাইয়া কলির পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে? আর আজ যদি ইহাদিগকে বধ কর তবে আর কাহাকে উদ্ধার করিবে? তোমার পতিত পাবন নামের সাক্ষী কেহ থাকিবে না।

এই যে ঘটনা হইতেছে, নিতাই প্রভুকে যাহা বলিলেন, ভক্তগণ এবং নগরের শত শত লোক যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছিল সকলে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

নিতাই কাতর হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু এই দুইটি জীবকে আমাকে ভিক্ষা দিয়া তোমার পতিতপাবন নামের গৌরব রক্ষা কর।" প্রভু কিন্তু কিছুতেই কোমল হইতেছেন না, ইহা দেখিয়া নিতাই আবার বলিলেন "প্রভু! তুমি মায়া ত্যাগ কর, তুমি এ সমস্ত যাহা করিতেছ তাহা গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য। আমার কপালে যাহা লাগিয়াছে তাহা সামান্য, জগাই মাধাই আমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই কলসীর কানা ছুড়িয়াছিল, দৈবাৎ উহা আমাকে লাগিয়া গিয়াছে। প্রভু আমার মান সম্ভ্রম ছারেখারে যাক্। তোমার অভয় পদে এ দু'টী পতিত জীবকে স্থান দিয়া উদ্ধার কর।"

এখন চৈতন্য মঙ্গল গীত হইতে শ্রবণ করুন,—

"সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বারে বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাই এ দুই পাঠাই যমঘর॥
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত।
হেন কালে সুদর্শন আইল সাক্ষাৎ॥
সুদর্শন চক্র-অগ্নি প্রলব হইয়া।
জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া॥
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনকে কহয়॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে।
এ দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে॥
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার।
সশরীরে এ দুইয়ের করহ নিস্তার॥
কর জোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।
না হইল নিস্তার কলি অধম দুরন্ত॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবেরে উদ্ধার॥"

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আর্ত্তি, বিনয়, কাকুতি, মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপন সঙ্কল্প, তাঁহার একবার উর্দ্ধপানে চাহিয়া সুদর্শনের প্রতি মিনতি, একবার দুটি হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি ও একবার প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া তিন জন

ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। সে তিন জন,—প্রভু স্বয়ং আর জগাই ও মাধাই। নিতাই আমাদের জীবন ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন তাহা তাহারা কণেও শুনিবার অবকাশ পাইতেছে না। তাহাদের নয়ন স্থির ভাবে প্রভুর মুখপানে রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবতার। মুখে তাহার করুণার চিহ্নমাত্রও নাই। ইহা দেখিয়া তাহারা ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভু কোমল হইতেছেন না, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আর এক কথা বলি, তুমি এ দুটীকেই দণ্ড করিতে পার না, যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"

অমনি প্রভুর মুখের কঠিন ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিতেছেন জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, সে কি? নিতাই বলিলেন, "মাধাই যখন দ্বিতীয়বার কলসী খণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করে, তখনই জগাই তাহার হাতে ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করে, তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে, সে অতি নির্দ্দয়, কারণ সে বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়াছে, তাহাতেই মাধাই আর আমাকে মারিতে পারে নাই।"

প্রভু বলিতেছেন, "তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত ধরিয়া তোমাকে বাঁচাইয়াছে? হ্যারে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস? তবে ত আমি তোরই হইলাম। আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিমাই, সর্ব্ব সমক্ষে সেই অস্পৃশ্য পামর, সেই শত শত নরনারী হত্যাকারী জীবাধমকে হৃদয়ে গাঢ়রূপে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

"জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা ফুটিল না; অমনি ছিন্ন মূল দ্রুমের ন্যায় দীর্ঘল হইয়া মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

মাধাই সমুদয় দেখিতেছে। প্রভুর রুদ্র মূর্ত্তিও দেখিল, আবার জগাইকে করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল তাহার সেই সমুদয় পাপ-কর্ম্মের অর্দ্ধভাগী ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পদখানি হৃদয়ে করিয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছে আর অশ্রু জলে উহা ধৌত করিতেছে। তখন মাধাইয়ের চৈতন্য হইল, আর "আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া সে তখনি শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে পড়িল।

প্রভু অমনি দুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। বলিতেছেন, ওরে অধম, তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অত্যাচার করিয়াছিস, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া আজ কেন ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছিস? নদীয়ার রাজা হইয়া এখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছিস ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? মাধাই! আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না। (শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত)

নদীয়ার রাজা হও তোমরা দু'জন।
রাজা হ'য়ে কি কারণে কান্দহ এখন?

তখন মাধাই কাতর হইয়া বলিল, প্রভু! তুমি জগতের পিতা, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে আমি কাহার নিকট যাইব। আমরা দুই ভাই একত্রে পাপ করিয়াছি আমাকে ত্যাগ করিয়া জগাইকে উদ্ধার করা তোমার কখনই উচিত হয় না।

নিমাই বলিলেন,—জগাই আমার নিকট অপরাধ করিয়াছে, সুতরাং আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু তুমি শ্রীনিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। যাহারা আমার ভক্তের নিকট অপরাধী তাহাদিগকে ক্ষমা করা আমার সাধ্যাতীত। ভক্তদ্রোহীদিগকে আমি ত উৎসাহ দিতে পারি না; ভক্তদ্রোহীকে দণ্ড দেওয়াই আমার কার্য্য।

ক্রমশঃ—

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

আগামী ২৫এ কার্ত্তিক রবিবার (১১ই নভেম্বর) শ্রীপাট পানিহাটিতে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষে স্মরণ মহোৎসব এবং তৎসঙ্গে বিপুল উদ্যমে একটী বৈষ্ণব প্রদর্শনী হইবে। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে যথাসময় উৎসবে যোগদান করেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন মানসে ৺পুরীধাম হইতে বিজয়া দশমীর দিন বহির্গত হইয়া তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে পানিহাটী রাঘব ভবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

প্রভুর আগমনে কিরূপ জনতা—কিরূপ প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, রাঘব পণ্ডিত প্রাণ গৌরাঙ্গকে নিজ ভবনে পাইয়া কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহা অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। আজ পর্য্যন্তও সেই প্রেমোদ্দীপক স্মৃতিচিহ্ন—প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ পূত জীর্ণ প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট, প্রচ্ছায় শীতল সেই প্রাচীন ৫০০ শত বৎসরের বট বৃক্ষরাজ, প্রভুর বিশ্রাম স্থান সেই পিণ্ডা বা বেদী, সেই রাঘব ভবন, সেই ভুবনমোহন শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই উজ্জ্বল ভাবে বিরাজমান। সকল ভক্তবৃন্দই উক্ত পুণ্য দিবসে স্বদলবলে শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়া গৌরগুণ কীর্ত্তনে আনন্দোৎসবের সমধিক ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করুন। এখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই, অভাব অভিযোগ নাই এখানকার শ্রীবটবৃক্ষতলই পবিত্র আসন এবং শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ তুলসী এবং পূত জাহ্নবী বারিই ভক্তগণের মহামূল্য উপহার।

বৈষ্ণব প্রদর্শনীতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে কোন দ্রব্য প্রেরিত হইবে তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যে সকল দ্রব্য ফেরৎ লইবার ইচ্ছা করিবেন তাহাও যথাকালে ফেরৎ দেওয়া হইবে। উৎসব উপলক্ষে সকলের প্রীতিদান বাঞ্ছনীয়।

পত্রাদি প্রেরণের ঠিকানা—সেবক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পানিহাটী পোঃ, জেলা—২৪ পরগণা।

শ্রীভাগবতাশ্রমে ঝুলন যাত্রা।—বিগত ১০ই ভাদ্র রবিবার হইতে ১৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত হাওড়া কোঁড়ার বাগানে শ্রীভাগবতাশ্রমে শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় সম্প্রদায় সহ রবিবার হইতে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। অষ্টপ্রহর শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীরূপ গোস্বামী চরণের সূচক কীর্ত্তন উক্ত বাবাজী মহাশয়ই করিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীগৌরাঙ্গদাস দাদা কয়েকদিনই আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর হাওড়া শাখার অধিবেশনের দিন অমিয়মাখা উপদেশ দানে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া ছিলেন। শ্রীমান্ অনাথ বন্ধুর আন্তরিক যত্নে উৎসবানন্দ বেশ সুশৃঙ্খলতার সহিতই সম্পন্ন হইয়াছে।

পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের তালিকা এবারও দিতে পারিলাম না কারণ তাঁহার সম্প্রদায়ের অনেকেই অসুস্থ, তাই কবে কোথায় কি ভাবে কীর্ত্তনের সুবিধা হইবে না হইবে তিনি বলিতে পারিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে নিরাময় করিয়া দিন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। শ্রীজন্মাষ্টমীর সময় বাবাজী মহাশয় হেতমপুর গিয়াছিলেন।

সেখান হইতে ২৪ প্রহর সমাধা করিয়া কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া ১২ই আশ্বিন শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবে যোগদান জন্য শ্রীধাম নীলাচলে ১০ই তারিখ রওনা হইবেন।

এবার কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই ৺দুর্গাপূজা, তাই কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা আমরা আশ্বিনের শেষ ভাগেই গ্রাহকগণকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব। কারণ ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনেকেই বিদেশে যান, পূজার অব্যবহিত পরেই সকলে পূর্ব্ব ঠিকানায় ফিরিতে পারেন না। যদি পূজার পূর্ব্বে আমাদিগের কোন গ্রাহক স্থানান্তরে গমন করেন তবে দয়া করিয়া নূতন ঠিকানা আমাদিগকে জানাইবেন।

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতনে" আজ ১২ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন নিয়মিত ভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসরই ভৈমী একাদশীতে বার্ষিক অধিবেশন হয়। গত বৎসর হইতে ভক্তবৃন্দের আগ্রহে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর অপার করুণায় এবারও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহোদয় কৃপা করিয়া জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব দিন হইতে উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনানন্দে ও সরস মধুর রসালাপে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন বিশেষতঃ তাঁহার নন্দোৎসবের কীর্ত্তন নগরবাসীর প্রাণে এক বিমল আনন্দ দান করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কথক চূড়ামণি জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে ও নন্দোৎসবের দিন সন্ধ্যার সময় শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম বিষয়ে কথকতা করিয়া দীর্ঘ সময় ভক্তগণকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন। আমরা উৎসবের উদ্যোগকারী সকল ভক্তবৃন্দেরই সর্ব্ব বিধ মঙ্গল কামনা করি।

সঙ্কলন

(মেদিনীপুর হিতৈষী হইতে)

জার্ম্মানীতে ডাকবাক্‌স্ প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। এই বাক্‌সে কেহ পয়সা সহ পত্র ফেলিয়া দিয়া একটা হাতল ধরিয়া টানিলেই মূল্যজ্ঞাপক ষ্ট্যাম্প সেই পত্রের উপর মুদ্রিত হইবে।

আকন্দগাছের ডাল বা পাতা ভাঙ্গিলে যে দুধের মত সাদা আঁটা বাহির হয় তাহা সর্পদষ্টস্থানে লাগাইলে ও দষ্টব্যক্তিকে খাওয়াইলে সাপের বিষ নষ্ট হয়। অনেকে এই চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়াছে।

(বঙ্গবাসী হইতে)

মানুষের গায়ে কলম করা।—পাঠক, গাছের কলম করা জানেন, করিয়াও থাকেন। মানুষের গায়ে কলম করার কথা শুনিয়াছেন কি? ক্ষয় রোগের চিকিৎসায় এই আজগুবি কাণ্ড ঘটিতেছে। শির দাঁড়ার পাশে হাড় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ক্ষয়ের বৃদ্ধি হ্রাস পায়; এমন কি, একেবারে থামিয়াও যায়। যে রোগীর ঐ রোগ, এতকাল তাহারই গা হইতে হাড় লইয়া কলম করা হইত। এখন আবার তাহা না করিয়া, ষাঁড়ের গা হইতে হাড় কাটিয়া লইয়া, ঐ অদ্ভুত অস্ত্রোপচার কার্য্যটী সম্পাদন করা হইতেছে। ইহা বার্মিংহামের ব্যাপার। কল কারখানার যায়গা, ভগবানের তৈয়ার করা কল-কব্জার উপরে কারিকরি করিতেছে। খোদার উপর খোদ্‌কারী, ধোপে টিকিবে কি?

দুর্গাজির ঘণ্টা।—সাহেব সপরিবারে মির্জ্জাপুর হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছেন। নৌকাখানি কিছু দূরে গেলেই ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমেই

তাহার বুদ্ধি। নৌকা ডুবু ডুবু। সাহেব মেম তাঁহাদের উপাস্য দেবতার নাম করিতে লাগিলেন। ছেলে মেয়েরা ঘোর আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। কিন্তু ঝড় থামে না। বাঁচিবার সম্ভাবনাও হয় না। এমন সময় হিন্দু মাঝি বলিল—সাহেব, যদি বাঁচতে চাও, দুর্গাজির নামে ঘণ্টা মানসিক কর। সাহেব, বিশেষতঃ মেম সাহেব, তখন প্রাণ খুলিয়া চীৎকার করিয়া—"দুর্গাজি বাঁচাও, তোমাকে ঘণ্টা দিব" বলিয়া উঠিলেন। অমনি ঝড় থামিল। নৌকা রক্ষা পাইল। সকলের প্রাণও বাঁচিল। কাশীর কালেক্টার মেটা সাহেব বেনারস দুর্গা বাড়ীর মন্দিরের প্রকাণ্ড এক ঘণ্টার উপরে পারসিতে লেখা কয় পংক্তি হইতে তখনকার কালেক্টার মিঃ গ্রাণ্টের নাম বাহির করিয়াছেন। ১২১৫ সালের আষাঢ় মাসে ঘণ্টাটি উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। এ ব্যাপার সম্পর্কীয় কাহিনীও মিঃ মেটাই উদ্ধার করিয়াছেন। মঘা নক্ষত্রের গল্প, বারবেলার গল্প সাহেবদিগের সম্বন্ধে আরও কত গল্পই শুনা যায়। এ আবার এক নূতন গল্প। অবিশ্বাসীরা কি ভাবে অবিশ্বাস করিয়া জিনিষটা উড়াইয়া দিবেন, একবার ভাবুন। নিজের জীবনে অমন ঘটনা, অমন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইলে, সন্ধিপূজার পাঁটার মত কাঁপার সময় আসিলে, কেহ অমন উপদেশ দিলে, তাহা শুনিবেন কি উড়াইয়া দিবেন এখনই ভাবিয়া রাখুন। কখন কি হয় বলা যায় কি ?

শোক সংবাদ

১।—বিগত ২১এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংসাবতংস প্রভুপাদ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, ইহধাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার সাধনোচিত

ধামে গমন করিয়াছেন। বৎসরাধিক কাল প্রভুপাদ গলক্ষতঃ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহার আশ্রিত বহু উচ্চ শিক্ষিত ভক্ত নানাপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াও দারুণ রোগের কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভুপাদের সহধর্ম্মিণী স্বধামে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী প্রভুপাদের শোকে জীবন্মৃতা। নিতাই চাঁদের কি ইচ্ছা জানিনা, ছোট ছোট দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভুপাদের জীবনী বিশেষ আলোচনার বিষয়, এমন কঠিন রোগের যন্ত্রণায়ও একদিনের জন্য কেহ প্রভুপাদের মুখ মলিন বা কোন রূপ যন্ত্রণা কাতর দেখে নাই। আমরা বারান্তরে তাঁহার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। মঙ্গলময় শ্রীভগবান প্রভু-পাদের শোকে কাতর সকলের প্রাণে শান্তি দিন ইহাই প্রার্থনা।

২।—বিগত ৭ই শ্রাবণ রাত্র ২॥০ ঘটিকার সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল শ্রীল ভূষণচন্দ্র দাস এম, এ মহাশয় বিসুচিকা রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্য হইতে যেদিন অবসর লইয়াছিলেন তাহার পরদিবসই এই দুর্ঘটনা ঘটে। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি বৈষ্ণব জগতের হিতসাধনে শ্রীল হরিদাস গোস্বামী প্রভুর সহিত কার্য্য করিবেন এইরূপ বন্দোবস্তই নাকি হইয়া ছিল, কিন্তু প্রভু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না।

ভূষণ বাবুর বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে বেশ ভাল অধিকার ছিল কিছুদিন পূর্ব্বে মাধুকরিতে "ভক্তি সন্দর্ভের" ব্যাখ্যা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। ভুষণবাবু মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধা'দও লিখিতেন। বৈষ্ণব জগতের নানা বিভিষিকা উপস্থিত এ সময় প্রকৃত সদাচারী, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কাহারও বিয়োগ বার্ত্তা শুনিলে যথার্থ ই প্রাণে বড় আঘাত লাগে। সবই লীলাময়ের লীলা। শ্রীভগবান ভূষণ বাবুর পরিজন, বর্গের প্রাণে শান্তি দান করুন ইহাই কামনা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

কার্ত্তিক ১৩৩৫

অভীষ্ট

(শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক লিখিত)

শ্যামল সুন্দরে পিরিতি যে করে হইব তাহার দাসী।
জনমে জনমে জিয়নে মরণে তাঁরে যেন ভালবাসী ॥
শ্যামের পিরিতি যেই জানে রীতি সে জানে শ্যামের সুখ।
সে জানে শ্যামের মরম-ধরম বিলাসের সুখ দুখ ॥
তাঁহার হিয়ার হাঁসন কাঁদন বুক পেতে নিব আমি।
সেই তো আমার জীবন মরণ সেই মোর অন্তর্য্যামী ॥
তাঁহার মনের ইঙ্গিত জানিয়া সতত করিব সেবা।
সেই তো আমার সরবস ধন সেই মোর দেবী দেবা ॥
তাঁর সুখলেশ দেখিলে আমার আনন্দ ভরিবে বুকে।
তাঁহার বদন হেরিলে মলিন মরিয়া যাইব দুঃখে ॥
তাঁরে ভালবেসে মনের পিয়াসে তাঁর মুখ চেয়ে রব।
"গোপী" অনুগত হ'য়ে তাঁর মত সেবন যাচিয়া লব ॥

ভক্তি-সাধনে আনন্দ

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

মানুষ চায় কি? আনন্দ। শুদ্ধ আনন্দলাভই তাহার কামনা। মানুষের যত কিছু চিন্তা-চেষ্টা-কার্য্য সকলেরই মূলে আছে কেবল মাত্র এক আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ আপনার জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই আনন্দলাভের আশাতেই যুগ যুগ ধরিয়া মানব জন্ম বহিয়া চলিয়াছে। একমাত্র আনন্দলাভই যে, মানব জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা,—বহু জন্মের তপস্যার বলে যিনি তাহা বুঝিয়াছেন, তিনিও যেমন, যিনি সম্পূর্ণরূপে সেটা বুঝিতে পারেন নাই, তিনিও তেমনি;—সকলেই একভাবে না একভাবে সেই নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ বস্তুকে আপন জীবনে পাইবার জন্য চেষ্টিত রহিয়াছেন।

জাগতিক ব্যাপারে আমরা এ দৃষ্টান্ত ত নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সন্তানকে বুকে করিবার জন্য মাতাপিতার এত আগ্রহ কেন? একটা আনন্দলাভের আশাতেই কি নয়? আবার শিশু যে, ছুটিয়া আসিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরে, মাতার ক্রোড়ে থাকিতে চায়;—তাহাই বা কেন? শিশু যে "কেন"র উত্তর জানে না, এ প্রশ্নও কখনও তাহার মনে উদয় হয় না, তথাপি ইহা সত্য যে, শিশু তাহার মাতাপিতার প্রতি এইরূপ ব্যবহারে একটা আনন্দ পায় এবং তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই আনন্দলাভের আশাতেই সে এরূপ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, কেহ জানিয়া এবং কেহ বা না জানিয়াও একমাত্র সেই আনন্দ বস্তুটীর উদ্দেশ্যেই চলিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই অনেক দৃষ্ট হয়।

উপরে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম, তাহা মানবের চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই নিত্যানন্দ অবশ্যই নহে। উহাতে আনন্দের পূর্ণতাও নাই। তবে ঐ সকল জাগতিক আনন্দ সমূহ যে. সেই পরিপূর্ণ নিত্যানন্দের এক একটা অংশমাত্র তাহা স্বীকার করি এবং এইরূপ অংশ বহুল জাগতিক আনন্দের নানা স্তর অতিক্রম করিয়া মানব যে, একদিন সেই পরিপূর্ণ নিত্যানন্দের অনুভূতিলাভ করিবে তাহাও সত্য। মানবের মানবত্বও সেইদিন সার্থক হইবে।

মানব জীবনের এই পরম সার্থকতা তখনই হয়, যখন মানবাত্মা ভগবৎ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে; মানব সেই নিত্যানন্দের অনুভূতি তখনই পাইয়া থাকে যখন ভগবৎ মহিমার সন্নিকটে আপন দীনতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া সেই মহামহিমময়ের চরণতলে আপনার কাতর প্রাণের সমস্ত বেদনা জানাইতে পায়! কিন্তু এই জানাইতে পাওয়া যে বড় সৌভাগ্যের বিষয়! একমাত্র ভক্তির সাধনাতেই যে সে সৌভাগ্য অর্জ্জিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন অবিশ্রান্ত কর্ম্মের প্রবল প্রবাহে হাবুডুবু খাইয়া মানবাত্মা একেবারে হাঁপাইয়া উঠে অথবা নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক জ্ঞানের পেষণে তিক্ত হইয়া উঠে, কোনদিকেই আর কোনও উপায় থাকে না,—তখন এই একান্ত মমতাময়ী ভক্তিদেবীই মাতার ন্যায় মঙ্গল-করুণ করস্পর্শে সান্ত্বনা দিয়া তৃষিত-ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তিলাভের শুভপথ দেখাইয়া দেন। সেই পথের অনুসরণেই তখন যথার্থ শান্তিলাভ ঘটিয়া থাকে।

জ্ঞান-কর্ম্ম, ধ্যান ধারণা মানবাত্মার শান্তিদানে সমস্তই যখন পরাভূত, একমাত্র ভক্তিই তখন মানবের শান্তি ও সান্ত্বনার উপায় বিধানে অগ্রসর। সুতরাং আর ভয় কেন? সংসারদগ্ধ ভয়ার্ত্ত মানবের সমস্ত ভয় দূর করিতে, সকল জ্বালা নিবারণ করিতে করুণারূপিণী ভক্তিদেবী যে রহিয়া-

ছেন ! ভয় কি মানব ! ভক্তির আরাধনা কর। আর কিছুই আবশ্যক হইবে না। তুমি জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার নাই বলিয়া সংসার সমুদ্রে প্রমাদ গণিতেছ ? ভয় কি ? ভক্তির সাধনা কর। ভক্তিদেবী করুণাময়ী, তুমি কর্ম্মপথে সাফল্যলাভ করিতে পার নাই বলিয়া কাতর হইতেছ ? তাই বা কাতরতা কেন ? ভক্তির উপাসনা কর। শুষ্ক জ্ঞানের কাছ হইতে নৈরাশ্যভরে ফিরিয়া আসিয়াছ ? কঠোর কর্ম্মের নিকট বঞ্চিত হইয়াছ ? আচ্ছা, স্নেহমমতাময়ী ভক্তির উপাসনা একবার করিয়া দেখ। ভক্ত হও। তোমার ভবজ্বালা নিবারণ করিতে—সেই চির আকাঙ্ক্ষিত নিত্যানন্দ প্রদান করিতে, যদি ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়া থাক যে, একমাত্র ভগবানই পারেন, তবে এটা কি এখনও বোঝ নাই যে,—"ভক্তের ভগবান !"

ভক্তের ভগবান বলিয়াই ত সেই গোলকের ধন ভূলোকে আসিয়া অবতাররূপে আবির্ভূত হন। শুদ্ধ ভক্তেরই মনস্তুষ্টির জন্য তিনি চণ্ডালকে "মিতা" বলিয়া আলিঙ্গন দেন, রাখাল বালকের উচ্ছিষ্ট তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করেন, গোপরমণীর উদূখলে বাঁধা পড়েন। জাননা কি,—ভক্তের ভগবান। তবে আর ভয় কেন ? ভক্ত হও। আর কিছুই চাই না। আর কিছুরই আবশ্যক হইবে না। শুদ্ধ "ভক্তি" থাকিলেই হইবে।

তাই ভক্তির অবতার পতিত পাবন প্রেমের গোরা একমাত্র ভক্তির সাধনা দ্বারাই সেই মধুর লীলা বিস্তার করিয়া এই ধ্যান জ্ঞান ধারণাহীন কর্ম্ম বিমুখ কলির দুর্গত ও দুর্ভাগ্য জীবের সম্মুখে শান্তি ও আনন্দলাভের এমন সরল শুভপথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যথার্থ এই পথের অনুসরণ করিতে পারিলে মঙ্গল হয়। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে,—যথার্থ "ভক্তি" চাই—প্রকৃত "ভক্ত" হইতে হইবে। তবেই মানবের চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই নিত্যানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য

(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবা লিখিত)

এই অনন্ত প্রকারের জীবসঙ্ঘে পরিপূর্ণ অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড, সেই একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থের অধ্যাস হইলেও ইহার মধ্যে বহু প্রকারের বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বান্তরে সেই একই পরমাশক্তি বিরাজিত থাকিলেও শক্তির তারতম্যানুসারে প্রত্যেক ভূতের অন্তর্গত শক্তির পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্বরূপের আধার সেই পরমপুরুষের রূপের বিন্দু লইয়া চরাচর জগতের রূপ সম্পাদিত হইলেও প্রত্যেক রূপে পার্থক্য আছে—একমাত্র চৈতন্য দেব প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে জীবনালোক প্রজ্জ্বলিত করিলেও চিচ্ছক্তির বিকাশের পরিমানানুসারে সর্ব্বত্রই পৃথকত্বের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পৃথকত্বের সমুদ্রে যদি নামকরণের অভাব থাকে তাহা হইলে কেহ কাহাকেও সম্বোধন করিতে পারে না, সম্বোধনের অভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, সম্বন্ধ না থাকিলে শান্তির সহায় সমাজ গঠিত হইতে পারে না, সমাজ গঠিত না হইলে অনন্ত জীবসঙ্ঘ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির মত নিঃসম্পর্ক, নিষ্কর্ম্মা ও নিশ্চল থাকিতে বাধ্য হয়। অভিনয় হয় না। যখন বিজ্ঞান বা রসায়ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপবেশন করি, তখন বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক যদি সমস্ত পদার্থকে একই নামে অভিহিত করিতে থাকেন, তাহা হইলে কেবল যে তাঁহার পরিশ্রম নিস্ফল হয় তাহা নহে, যাহারা অধ্যয়ন করিতে গমন করে, তাহারাও অসংস্কৃত অনলঙ্কৃত অন্তরে বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়।

সমস্তই ব্রহ্ম পদার্থ, অথবা সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ শক্তিই সেই আদ্যাশক্তি, এ কথা স্বীকার করিলেও প্রত্যেক পদার্থের পৃথক নাম না থাকিলে বিজ্ঞান রসায়ণের অবস্থিতি বা উন্নতি অসম্ভব হয়, দর্শনের আলোচনা বন্ধ রাখিতে হয়, ইতিহাসের সহিত বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ও স্থাপন করা যায় না, সংখ্যানির্দ্দেশক নাম পরিপূর্ণ গণিত শাস্ত্রকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং সাহিত্য ব্যাকরণ হইতে ধাতু, শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তি, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, উপসর্গ, প্রভৃতির সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়।

নাম আছে, তাই গণিত, বিজ্ঞান, রসায়ণ আছে। নাম আছে, তাই সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস আছে। নাম আছে তাই তুমি আমি আছি, তাই সম্বন্ধ আছে, তাই সমাজ আছে। নাম আছে তাই কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, উপাসক আছে, উপাস্য আছে, এবং উপাসনা আছে। নাম আছে তাই স্নেহ মমতা, বন্ধুত্ব আছে, প্রেম আছে, ভক্তি আছে। নাম আছে তাই ভক্ত আছেন, ভগবান আছেন এবং সাধন আছে, ভজন আছে। নাম আছে, তাই সম্পদ, বিপদ, সুখ, দুঃখ আছে, শত্রু মিত্র আছে, মানাপমান আছে, অথবা এই সংসারের অভিনয় আছে।

নামের শক্তির অন্ত নাই, নামের মহিমার অন্ত নাই, নামের বিভূতির অন্ত নাই। যদি নাম না থাকিত, তোমাকে আমি চিনিতে পারিতাম না, তোমার পরিচয় জানিতে পারিতাম না, তুমি যে আমার আপন, তুমি যে আমার বিপদের বন্ধু, আমার অভাবের সুহৃদ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না। আমার সঙ্কটকালে তোমাকে আহ্বান করিয়া, আশ্বাসবাণী লাভ করিতে পারিতাম না। যদি নাম না থাকিত, দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইলে 'হা বিপত্তারণ মধুসূদন' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া

ডাকিতে পারিতাম না, এবং সেই পরমকরুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া অন্তরের ব্যথা নিবেদন করিয়া শোক-ভার লঘু করিতে পারিতাম না।

যদি নামের অভাবে এত অনর্থের উৎপত্তি হয়, যদি নামের অভাবে বস্তুর বস্তুত্ব অনুভবে অসমর্থ হইতে হয়, তাহা হইলে বস্তু অপেক্ষা নামের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিতে হইবে। নামের অভাবে বস্তুর প্রভাব উপলব্ধি করা অসম্ভব। যেখানে নাম নাই, সেখানে বস্তু থাকিয়াও নাই। যেখানে নাম নাই, সেখানে রাজা নাই, রাজার রাজত্ব নাই, প্রজার অস্তিত্ব নাই। এইরূপে যেখানে নাম নাই, সেখানে ভক্ত নাই, ভগবান নাই। নাম নামী এক—নামী হইতে নাম শ্রেষ্ঠ—তাই কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের নাম শ্রেষ্ঠ—সত্যভামা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। একপার্শ্বে কৃষ্ণকে বসাইয়া অন্য পার্শ্বে তুলসী পত্রে কৃষ্ণের নাম লিখিয়া, ওজন করিয়া, নামের গুরুত্ব দর্শন করিয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য লীলায় লিখিত আছে—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাই ভেদ
জীবের ধর্ম্ম নাম নামী স্বরূপ বিভেদ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে লিখিত আছে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥

নাম চিন্তামণিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, রসবিগ্রহ, পূর্ণ পবিত্র, নিত্য, নাম ও নামধারী এই উভয় অভিন্ন।

তাই শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর নামাশ্রয় করিয়া, সাধনায় আসীন

হইয়া ছিলেন, এবং নাম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, নামের অত্যদ্ভুত প্রভাব জগৎ সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া, নামের বিজয় বৈজয়ন্তী উন্নত আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া, চরাচরকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। নামাশ্রয় করিলে নরক-জনক কামের দর্প কিরূপে চূর্ণ করিতে পারা যায় তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেনাপোলের জঙ্গলে তিনি স্থাপন করিয়া, সাধক-মণ্ডলীকে নাম-সাধনায় আহ্বান করিয়া ছিলেন। নামের সাধক, যোগীশ্বর গণের মত, কেমন ভাবে ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, মৃত্যু-যন্ত্রনার হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর তাহা আপন জীবনাবসান সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষী করিয়া চরাচরকে দেখাইয়া গিয়াছেন। নামের সাধনাই সর্ব্বফলপ্রদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা—নামের সাধকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। এই নামের প্রভাব, নামের মহিমা বর্ণন করিবার ভাষা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষহীরা বারবিলাসিনী, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিনী, ইতর স্বভাবা কামিনী ছিল। সে পরকালের শঙ্কাবিহীন তুচ্ছ সম্পদে অত্যন্ত অহঙ্কারী, মহা মোহান্ধ, স্বেচ্ছাচারী রাজা রামচন্দ্র খাঁনের বিলাসের পুতুল ছিল। পাপের খেলা নরকের উৎসব, লক্ষহীরার যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ছিল। সুকঠিন প্রস্তর খণ্ডে কোমলত্ব সম্ভব হইতে পারে, বিশ্ব ভস্মকারী হুতাশনে শীতলত্ব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু নরকের কুহকী, ইন্দ্রিয়ভোগোন্মত্তা, লক্ষহীরার অন্তরে হরিভক্তির উদয় হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আবার পরমকরুণাময় পতিত পাবন শ্রীশ্রীহরি নামের এমনি মহিমা, আর এতই প্রভাব যে, শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে মাত্র দুই রাত্রি সেই লক্ষহীরা হরিনাম শ্রবণ করিয়া পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছিল এবং ইহকালে পরকালে পরম মঙ্গল প্রদায়িনী হরিভক্তি দ্বারা অন্বিতা হইয়াছিল।

মানুষের অন্তঃকরণ, ভগবান গোবিন্দের শ্রীচরণ কমলের মধু পানের জন্য উন্মত্ত হইয়া, যখন মত্ত মধুকরের মত প্রধাবিত হয়, তখন তুচ্ছ ভোগৈশ্বর্য্যের প্রলোভন তাহার সম্মুখে অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। মাত্র দুই রাত্রি হরিনাম শ্রবণ করিয়া, লক্ষহীরার মনপ্রাণ হরিপাদপদ্মে তন্ময় হইয়াছিল। সে রাজা রামচন্দ্র খাঁনের সহিত পাপের সম্বন্ধ চিরদিনের মত ঘৃণার খড়্গে ছেদন করিয়া ছিল। তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য বিষ্ঠাযুক্ত তৃণের মত পরিত্যাগ করিয়া, নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান জনের মত কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, হরিপাদপদ্ম লাভের বাসনায়, সাধনাসনে উপবেশন করিয়াছিল। তাহার মরুভূমির সমান অন্তরে সুনির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া শান্তির শীতলতা আনয়ন করিয়াছিল। পাষাণ বিগলিত হইয়াছিল, অঙ্গারের মলিনত্ব বিদূরিত হইয়াছিল এবং উষরে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

যদি আমরা হীরার এই অসম্ভব পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধানে বহির্গত হই, তাহা হইলে দেখিতে পাই, একমাত্র পরম মঙ্গলকর শ্রীহরিনাম এবং হরিনামের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সাধক সেই ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরই এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। হরিনাম শ্রবণ করিলে ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনার ক্ষয় হয়, বিষয়াশক্তির অন্তর্ধান ঘটে, সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি সাধিত হয়, পরকালের পথে দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, এবং অশান্তিময় সংসারকে শান্তি নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিপত্তি ভঞ্জন হরিনাম আশ্রয় করিলে বিঘ্ন বিপদের অবসান হয়। হরিনামকে যিনি রসনাগ্রে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, এই ধরণীতলে তিনি ভাগ্যবান, তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু এবং তাঁহার সঙ্গ সর্ব্বলোক বাঞ্ছনীয়। যাঁহার জিহ্বাগ্রে পতিতপাবন হরিনাম অনুক্ষণ উচ্চারিত হয়, তিনি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গৌরবের

সামগ্রী। এক হরি নাম আশ্রয় করিলে, সর্ব্বতীর্থে স্নান করার ফল লাভ করিতে পারা যায়; সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সর্ব্বপ্রকার যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়, এবং চতুর্ব্বেদ অষ্টাদশ পুরাণ অধ্যয়ন জনিত জ্ঞানলাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবের প্রতি দেবহূতী বলিতেছেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতোগরীয়ান যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্য ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

যিনি যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হউন না কেন, নাম আশ্রয় ভিন্ন কাহারও অন্যপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শাক্তগণ কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, শৈবগণ শিব, শঙ্কর, বিশ্বেশ্বরাদি নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সৌরগণ সূর্য্য, ভাস্কর, ত্রিগৎসবিতা প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং গাণপত্যগণ গণপতি, গণেশ, সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। আর্য্য জগতের পঞ্চবিধ উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যান্য অগণ্য সম্প্রদায় শাখাপ্রশাখারূপে বহির্গত হইলেও প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অভীষ্ট দেবের নাম লইয়াই শ্রবণ কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "কর্ত্তাভজা," "গুরুসত্য," "হাসিকান্না," প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও নামের আসন সর্ব্বোচ্চস্থানে স্থাপিত হইয়া থাকে।

আর্য্য জগতের সংবাদ পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা পাশ্চাত মুসলমান বা খৃষ্টান সমাজের তত্ত্ব অনুসন্ধান আরম্ভ করি, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও আল্লা, খোদা, মহম্মদ, এবং গড, অলমাইটী, প্রভু যীশু-খৃষ্ট, প্রভৃতি নাম সাধন মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে উচ্চ তোরণে উজ্জ্বল লোহিতাক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাই। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব্বে

হইতে যে অভিনব নিরাকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের সাধন মন্দিরে প্রবেশ করিলেও পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ ধর্ম্মরাজ, প্রভৃতি নামের সম্বোধন, মুহুর্মুহু শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, সর্ব্বত্রই নামের সাধনা। সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজে, সর্ব্বদেশে সাধকগণ নামাশ্রয় করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধন পথে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষুদ্রশক্তি, ক্ষুদ্রমতি, ক্ষণস্থায়ী মানবের পক্ষে সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের নাম সাধনা ভিন্ন অন্য কোন্ বিষয়ে অধিকার আছে? যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কলি পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাই ক্ষুদ্রায়ু, ক্ষুদ্রমতি, সুচঞ্চল কলিজীবের জন্য সহজসাধ্য নাম-সাধনাই প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেবহূতীকে উপদেশচ্ছলে ভগবান কপিলদেব যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য সাধন-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই, "নাম হইতে সর্ব্বসিদ্ধি সাধিত হয়। হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলে রসনার আড়ষ্টভাব বিদূরিত হয়, হরির প্রতি আসক্তি জন্মিতে থাকে, হরির ভুবনভরা রূপরাশি অন্তরে জাগ্রত হইতে থাকে, হরি বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান হইতে যে প্রেমভক্তি দ্বারা ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটে, সেই প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারা যায়।"

ভাগবতবৈষ্ণবগণের একমাত্র বাঞ্ছনীয় কৃষ্ণভক্তি যে, কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিলে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের অমৃতময় বাক্যেও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। চাঁদপুরে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় তিনি অনুসন্ধিৎসু সভাসদ্‌গণকে বুঝাইয়া ছিলেন—

"কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়,
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।

হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে

নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়ে ॥" (চৈঃ চঃ)

এই কথা বলিতে বলিতে ভাগবতের এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন। রাজর্ষি জনকের প্রতি যথা—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

উচ্চৈঃস্বরে গুণসিন্ধু ভগবান গোবিন্দের নাম যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনি অতিশীঘ্র কৃষ্ণানুরাগ দ্বারা—কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা—অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন। যখন তাহার হৃদয় ক্ষেত্র ভগবান অচ্যুতের প্রেমে পরিপূর্ণ হয় তখন কখনও তিনি উচ্চ হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও অব্যক্ত শব্দ করেন, এবং কখনও উন্মাদবৎ নৃত্য করেন।

"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।

তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।" (চৈঃ চঃ)

প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ঠাকুর হরিদাস আবার পদ্যাবলী হইতে আর এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।

তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥

জগন্মঙ্গলকর ভগবান হরিনাম জয়যুক্ত হউন। জগৎপ্রকাশক প্রভাকর সমুদিত হইলে যেমন জগতের অন্ধকার রাশি বিদূরিত হয়, দুর্জ্জন নিশাচরগণের হস্ত হইতে গৃহস্থগণ নির্ভয় হইয়া থাকে, সেইপ্রকার নামরূপ সূর্য্য অন্তরে উদিত হইলে কামাদি রিপু সমূহের সন্তাড়ণ হইতে মানুষ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। জগন্মঙ্গলকর হরিনাম অজ্ঞানান্ধকার সমুদ্রের উত্তারণ তরণি সদৃশ।

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়,
উদয় না হৈতে আরম্ভ হয় তমক্ষয়।
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাষ হৈতে
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ বাক্য—

"সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

জগৎ প্রকাশক দিবাকর যেমন আপনা আপনি উদিত হইয়া জগৎকে অন্ধকাররূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, এই নামরূপ সূর্য্যও তেমনই জীবগণকে পাপরূপ অন্ধকার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের মধ্যেও প্রাপ্ত হই, যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়। তাঁহারা জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ ও কর্ম্মমার্গের কর্ম্মাদি না করিয়া একমাত্র ভক্তিমার্গের আদেশ উপদেশাদিই শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিবেন। ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায় না।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেম ধন॥

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥" (চৈঃ চঃ)

এই মহাবাক্যে নাম সাধনার এক নূতন সঙ্কেত প্রাপ্ত হইলাম। নাম সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা; কিন্তু সে নাম নিরপরাধ হইয়া লইতে হইবে। দুগ্ধে মাখন আছে সত্য; কিন্তু তাহা উত্তোলন করিতে মন্থন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। খেজুর গাছে গুড় আছে, কিন্তু তাহা প্রণালী পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইতে হইবে। নামাশ্রয় করিলে কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু নামাপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। একথা শ্রী শ্রীপদ্ম পুরাণেও পাওয়া গিয়াছে—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়।
হরেরপ্য পরাধান য কুর্য্যাদ্বিপদ পাংশলঃ॥
নামাশ্রয় কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব সনামত।
নাম্নোহি সর্ব্ব সুহৃদঃ হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

সংসার পথে চলিতে ফিরিতে মানব যত অপরাধ করে, সমস্ত অপরাধের হস্তে সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, যদি সে নামাশ্রয় করে। আবার ভগবান হরির নিকটেও ৩২টী সেবা অপরাধ আছে। যদি মানুষ নামাশ্রয় করে তাহা হইলে সেই সকল সেবাপরাধের হস্তেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু নাম যদিও সর্ব্বোত্তম সুহৃদ, নামের নিকটে অপরাধ করিলে আর তাহার মুক্তি নাই। সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবে।

আমরা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করি—অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, সহস্র প্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন করি। কিন্তু আমরা পাপ-জনিত দুঃখে মুক্ত হই না কেন? হই না—কারণ নামাপরাধ ত্যাগ করি না। তুচ্ছ সুখ-বাসনার মাথায়

পদাঘাত করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া "হা গোবিন্দ" বলিয়া যদি উপবেশন করিতে পারিতাম,—যদি সেই নিত্য সুখময় শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মন-প্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহারই নামে প্রেমে তন্ময় হইতে পারিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারিতাম,—নামের মাহাত্ম্য জগতকে দেখাইতে পারিতাম।

বলিদান

(শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

সংসাররূপ মহাশ্মশান আলোকিত করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। বিকট অট্টহাস্য-মুখরিত গাঢ় তমিস্রা দূরিভূত হইল। তৎপরে দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া প্রবলভাবে ধ্বংশের করাল বাদ্য অপ্রতিহত ভাবে বাজিয়া উঠিল। সহসা প্রশ্ন উঠিল "এ বাদ্যের অর্থ কি ?" অসীম তেজঃপুঞ্জ যোগ-প্রতিভা-প্রদীপ্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের সঙ্ঘ হইতে উত্তর আসিল "এ বলিদানের মঙ্গলবাদ্য।" মহাপুরুষকণ্ঠ-নিঃসৃত এই ধ্বনি রণিয়া রণিয়া প্রতিধ্বনিত হইল "এ বলিদানের মঙ্গল বাদ্য"। তৎপরে চতুর্দ্দিকে মহাপুরুষগণ স্বীয় কার্য্য সাধন মানসে ধাবিত হইল। পথে যাহাকে পাইল কৃপা পূর্ব্বক বলিল "ওগো তোমার মধ্যে যে ছয়টী পশু আছে, তাহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত, তাহাদের বলিদান কর।"

সকলে বলিল "কেমন করিয়া এই অসাধ্য সাধন করিব ? আমরা যে সেই পশু দ্বারাই পরিচালিত হইয়া পাশবিক ব্যাভিচার-স্রোতে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত।" মহাপুরুষগণ প্রত্যুত্তর করিল "উপায় হইয়া যাইবে। আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া মহার্ণবে ঝম্প প্রদান কর—উপায় অবশ্যই হইয়া যাইবে।"

জগৎবাসী এই আশ্বাস বাণী লাভ করিয়া ধন্য হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা বৈরাগ্য যুক্ত ভাগ্যবান, তাহারা মানসনেত্রে দর্শন করিল এক অত্যাশ্চর্য্য ভক্ত প্রদেশের বিপুল উন্মাদকারী ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য। নয়নে দেখিল মূল্যবান নানাবর্ণযুক্ত প্রতিভা বিশিষ্ট হিরক খচিত নীল চন্দ্রাতপতলে অনন্ত পুরুষের অনন্ত আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গগন মণ্ডল হইতে স্নিগ্ধ আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার করিতেছে। এক অজানিত স্থান হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারে সঙ্গীতসুধা নিঃসৃত হইতেছে। কদম্ব বৃক্ষ তলে শিখীগুলি নৃত্য করিতেছে—অসীম ভাবে নন্দন কানন হইতে কুসুমবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই আনন্দিত—উৎফুল্ল, কারণ তাহারা এই মহাসভায় শ্রীঅনন্তদেবের চিরবাঞ্ছিত চরণ কমল দর্শন করিবে।

ভক্তমণ্ডলী শ্রাবণের ধারার মত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব স্থানে আসন গ্রহণ করিল। তারপর সেই শুভ মুহূর্ত্তে "শ্যাম-নবঘন ভক্ত-হৃদয়ধন" ভুবনমোহন শ্রীগোবিন্দ প্রকাশিত হইলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা মঙ্গল বাদ্য বাজিতে লাগিল, শিখীগুলি উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিল। কদম্ব বৃক্ষ হইতে কদম্বরেণু স্খলিত হইতে লাগিল। ভক্তজন-সঙ্ঘের হৃদয় হইতে ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইয়া শ্রীশ্রীজীবন দেবতার চরণ কমল সিক্ত করিল। উন্মত্তবৎ তাহাদের ব্যাকুল ক্রন্দনধ্বনী আকাশ ভুবন প্রকম্পিত করিয়া উঠিল।

তদ্দর্শনে ভুবন স্বামী স্মিতমুখে ছল ছল নেত্রে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "তোমাদের দুর্দ্দান্ত পশু নিচয়ের বলিদান ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে—তাই এত অশ্রু। কলুষ রক্ত প্রবাহ অশ্রুদ্বারা বিধৌত হউক। আজ তোমরা মুক্ত—আজ তোমরা ধন্য—কৃতার্থ হইলে।"

এইবার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর অসীম আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিল কি?

কিছুই হইল না—সকলেই মূর্চ্ছিত হইল। বাদ্য ক্ষান্ত হইল। শিখীগণের নৃত্য অদৃশ্য হইল। মহাপুরুষগণ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দেখিল তাহাদের নয়নাভিরাম শ্রীশ্যাম সুন্দর অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিল যে, তাঁহাদের আত্ম-সিংহাসনে তিনি মদনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন। পশু-চালিত আচারের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্যামসুন্দর তাঁহাদের রথের সারথী হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিলেন, দুর্দ্দান্ত পশুগুলির বলিদান হইয়াছে।

এস মা

(শ্রীযুক্ত সোমনাথ সেন লিখিত)

এস মা, আনন্দময়ী তুমি দশ হস্তে দশ দিকে তোমার স্নেহাঞ্চল বিস্তার করিয়া এস, বদ্ধজীব আমরা—সারাবৎসর কত তাপ, কত যাতনা সহ্য করিয়াছি, তোমার আগমনে সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আবার নবজীবন লাভ করি। ওই দেখ মা, তোমার আগমন উদ্দেশে পুত্র-শোকার্ত্ত পিতা-মাতার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, জীর্ণ, রোগ-ক্লিষ্ট ব্যক্তি উল্লসিত হৃদয়ে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর হৃদয়ে অবিরাম আনন্দ স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

এস মা, তোমার শ্রীচরণ স্পর্শে ধরণীর বক্ষ পবিত্র হউক। তোমার আবির্ভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হউক, জীবগণ পুণ্য-প্লাবনে ভাসমান হউক, ভারত ভক্তিস্ফুরণে উদ্ভাসিত হউক।

এস মা, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রকে যে মূর্ত্তিতে অভয় দিয়াছিলে—যে মূর্ত্তিতে তাঁহার মনোভিষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলে, সেই মূর্ত্তিতে এস মা।

সিংহবাহিনী দশভুজারূপে, রিপু-ত্রাসভরা ভক্ত-মনোহরা রূপে এস। জ্ঞানবিদ্যা-বিধাত্রী সরস্বতীকে লইয়া, ধন-ধান্যদায়িনী লক্ষ্মীকে লইয়া, সর্ব্বসিদ্ধি-বিধাতা গণপতিকে লইয়া ও সর্ব্বশক্তিমান কার্ত্তিকেয় সমভিব্যাহারে অসুরদলনীরূপে এস মা। তোমার সন্তানেরা ভক্তিভরা চিতে তোমার চরণে প্রণত হউক।

জানি মা, তুমি সাধকের অন্তরে, ভক্তের হৃদয় কন্দরে, সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ। জানি মা, সেখানে তোমার প্রতিমা নাই, লৌকিক বাদ্যভাণ্ড নাই– ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা আরতি নাই—ব্যক্তি বিশেষের আদর অভ্যর্থনা নাই। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা লৌকিকতায় মুগ্ধ হইয়া আছি—তাই আজ লৌকিক উপচারে তোমার পূজা করিব। জানি মা, দেহ সাধকের পবিত্র মন্দির, হৃদয় তাঁহাদের পুণ্য আসন, আত্মা তাঁহাদের মাঙ্গলিক ঘট, মন তাঁহাদের কর্ত্তা—প্রাণ তাঁহাদের পূজক, ভক্তি তাঁহাদের পুষ্প—প্রেম তাঁহাদের চন্দন, অশ্রু তাঁহাদের পূত জাহ্নবী বারি—ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বলিদান দ্রব্য, সাধনা তাঁহাদের হোমাগ্নি, রিপু তাঁহাদের আহুতি, স্ফুরণ তাহাদের আরতি—শ্বাস প্রশ্বাস তাঁহাদের ধূপ ধূণা, গুরুদত্ত বীজ তাঁহাদের বাদ্য এবং প্রণবধ্বনি তাঁহাদের ঘণ্টারব। পরমাশক্তি তুমি, পূর্ণানন্দে তখন যতিকে অমৃত মদিরায় নিমজ্জিত করিয়া রাখ। যতি তখন সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশিত হন ও তোমার শক্তিতে তিনি তখন নিখিল বিশ্বকে প্রেম আলিঙ্গন করেন।

সাংসারিক জীব আমরা, আমাদের সে সাধ্য নাই। তাই তোমার প্রতিমা গঠন, তাই তোমার পূজানুষ্ঠান। দেখ মা, তোমার আগমন উদ্দেশে জীবগণ আর জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিবার প্রত্যাশী নহে। অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলেই তোমাকে আবাহন করিবার জন্য নব নব বস্ত্র পরিধান করিতেছে। সকলেই নব নব দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের তত্ত্ব লইতেছে। সকলেই নবভাবে উদ্দীপ্ত।

এস মা দুর্গে, সন্তানদের দুর্গতি হরণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণে অচলাভক্তি দাও—হৃদয়ে শান্তি দাও—যেন তোমার স্নেহ সুধায় তাহারা বঞ্চিত না হয়। মাতৃরূপসাগরে যেন তাহারা চিরদিন ডুবিয়া থাকে।

কূটস্থ কৈলাস

(শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায় বি-এ লিখিত)

কূটস্থ কৈলাসে হের চৈতন্য গিরিজাপতি ।
সঙ্গে হের শোভাময়ী নিবৃত্তি পার্ব্বতী সতী ॥
ত্রিশূল ডম্বরু করে,
শাসন অভয় ধরে,
অকলঙ্ক চিদানন্দ তাই দেহে শুভ্র জ্যোতি ।
মত্ত চিত্ত হত্যাকারী,
তাই ব্যাঘ্র চর্ম্মধারী,
ললাটেতে জ্ঞানবহ্নি বিনাশিতে কাম রতি ॥
প্রেমচন্দ্র তদুপরি,
কিবা শোভা মরি মরি,
তদূর্দ্ধে শিরসে বহে নিত্য শান্তি ভাগীরথী ।
পঞ্চভূত জটাজালে,
অবিদ্যা ভুজঙ্গ খেলে,
সাধ্য নাই বিষ ঢালে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বপতি ॥
বিবেক সমর প্রিয়,
কার্ত্তিক নামেতে জ্ঞেয়,
মহাযোদ্ধা শিব পুত্র শত্রুনাশে দক্ষ অতি ।
বৈরাগ্য গম্ভীর চিত্ত,
শাস্ত্র সহ যুক্ত নিত্য,
এ বুঝি দ্বিতীয় পুত্র নাম যাঁর গণপতি ॥

পবিত্র সৌন্দর্য্য আর,
পরাবিদ্যা চমৎকার,
উভয়ে সেজেছে হের লক্ষ্মী আর সরস্বতী।
মরি কি অদ্ভুত শোভা,
যোগী ঋষি মনোলোভা,
হে আদর্শ! হৃদে রহ সন্তানের এ মিনতি॥

আত্মনিবেদন

(শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার পাল লিখিত)

(গান)

আমি খুঁজেছি শুধুই আঁধারে।
তাইতো প্রাণের দেবতা আমার দাও নাই দেখা আমারে॥
এবার, একে-একে সব পাগলামী নেশা ছেড়েছি,
আজি, আপনায় আমি তোমার পায় সঁপিয়া প্রভু দিয়েছি,
আর, নাই তো আমাতে আমি গো প্রভু—
তোমারে দিয়েছি আমারে।
এইবার তবে ধুলা কাদা মুছে তব কোলে স্থান দাও,
চিরকাল তরে যাওয়া-আসা ভবে ঘুচিয়ে এবার দাও,
আমি যে, বহু ঘুরে-ফিরে বহু শ্রম ক'রে
পাইয়াছি এই পথটীরে।

হিমালয় গমন বা কেদার বদরী ভ্রমণ কাহিনী

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত)

(২)

যাত্রাপর্ব্ব।

[ইং ১৯২৩ বাংলা ১৩৩০ সাল; ১৬ই বৈশাখ, রবিবার, পূর্ণিমা, ফুলদোল।]

রবিবার প্রাতে ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রা নাই, সেইজন্য শনিবার রাত্র ৩৷৷০টার সময় উঠিয়া আমরা সকলকে ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি করিতে লাগিলাম। নৌকা যোগে—ই,আই, আর, শ্রীরামপুর ষ্টেসনে যাইয়া রেলে চাপিব বলিয়া নৌকা ঠিক করিয়া মোট ঘাট সব পাঠাইতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে যাত্রি-দল পানিহাটী দণ্ড মহোৎসব ক্ষেত্রের দক্ষিণে, রাজা রামচাঁদের ঘাটে আসিয়া হাজির হইল। সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি একবার বাড়ীতে গিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই আমার কন্যা-মাতারা শ্রীমন্দিরে পূর্ণঘট, দীপ, প্রভুর শ্রীচরণ তুলসী প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি আমার জন্য সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আমি দণ্ডবৎ করিয়া শ্রীচরণ তুলসী নিয়া বাহিরে আসিতেছি, এমন সময়ে কন্যাদ্বয় —"বাবা আমাদের কার কাছে ফেলে রেখে চলে যাচ্চো," এই বলিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

সংসার বলিতে আমার এই দুটি মাতৃহারা কন্যা। একটী বিবাহিতা, অন্যটী বিবাহের উপযুক্তা হইলেও বিবাহ দিতে পারিনি। এ ভিন্ন পিতা,

মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি, অর্থাৎ আত্মীয় বলিতে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই স্বধাম গমন করিয়াছেন। বড়ই কঠিন এবং কর্কশ প্রাণ, তাই এদের এইরূপ সহায়-সম্পত্তিহীন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বসুখের জন্য যাইতেছি। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি ; কিন্তু সে প্রবোধ, সে কর্কশতা আর রহিল না, কন্যাদ্বয়ের আকুল ক্রন্দনে বালির বাঁধের মত তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, দুর্গম পথ, পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে, কত আপদ, কত বিপদ্ সম্মুখে আসিবে, ভাগ্যে কি আছে তাহা কে জানে ? হয়তো এই শেষ দেখা, হয়তো আর ফিরিয়া আসা হইবেই না। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমার আসিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া সঙ্গীরা বাড়ীতে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, কাজেই যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইবার ভয়ে, আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। করজোড়ে মহাপ্রভুর চরণে নয়নরঞ্জন স্নেহের পুতলী দুইটীকে ফেলিয়া দিয়া "জয় জয় মহাপ্রভু" বলিয়া বাহির হইলাম। গঙ্গাতীরে যাইয়া শ্রীবটবৃক্ষরাজকে ও শ্রীগৌরাঙ্গ ধামের শ্রীশ্রীগৌর নিতাইকে দণ্ডবৎ করিয়া নৌকাতে উঠিয়া বসিলাম।

অন্যান্য যাত্রিগণের আত্মীয় স্বজন সকলেই ঘাটে আসিয়া হাজির। সকলেরই চক্ষে জল ; সকলেই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :— "দেখোবাবা ! তোমার ভরসাতেই আমরা এঁদের ছেড়ে দিচ্চি, আপদে বিপদে তুমি এঁদের দেখো।" আমার কন্যা দুটীও ঘাটে হাজির ছিল, তাদের মুখে কথা নাই, কেবল চোখে জলধারা। যাবার সময় এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ চঞ্চল হইতে চঞ্চলতর হইয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল গিয়া কাজ নাই, ফিরিয়া যাই। যাহা হউক, উষার অস্পষ্ট আলোকে আর একবার জননী জন্মভূমি ও বৃক্ষরাজকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া নিলাম। যাত্রিগণের মধ্যে "হরি হরি" "দুর্গা দুর্গা" উচ্চধ্বনি উঠিল। সর্ব্বশেষে সকে

মিলিয়া "জয় বদরীনারায়ণকি জয়" বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলায় মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ ধরিয়া কন্যা-মাতারা আমায় প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, আমিও আকুলপ্রাণে তাহাদের দেখিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে নৌকা অন্তরাল হইতে হইতে শ্রীপাট খড়দহের শ্যামসুন্দরের ঘাটের কাছে আসিয়া হাজির হইল।

তখন প্রভাত হইয়াছে। বৈশাখের মধুর প্রভাত মধুর হাওয়া, গঙ্গার উভয় তীরের মধুর দৃশ্য, চারিদিক মধুময় হইলেও আমার প্রাণে শান্তি আসিতেছে না। কন্যা দুইটীর জন্য প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

আজ শ্যামসুন্দরের ফুলদোল। বেল, মল্লিকা, জুঁই, চামেলী প্রভৃতি নববসন্তের নব নব ফুল দিয়া আজ শ্যামসুন্দরকে সজ্জিত করা হইবে। শ্যাম আজ কুসুমরাশির সিংহাসনে বসিয়া দোল খাইবেন, শ্যামচাঁদের ভুবনমোহন দৃশ্যে ও ফুলগন্ধে যাত্রীরা আজ মাতোয়ারা হইবে। ভক্তগণের সুমধুর কীর্ত্তন গীতে খড়দহ ধাম আজ মুখরিত হইয়া উঠিবে। খড়দহে আজ আনন্দের স্রোত বহিবে।

নৌকা হইতে দেখিতে পাইলাম যাত্রীর সমাগম হইতেছে। সারি সারি দোকান বসিয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর আমরা প্রভুর এই লীলা উৎসব দেখিতে আসি। এবারেও মনে হইল তীরে উঠিয়া একবার দর্শন করি, কিন্তু সকলের মত না হওয়াতে যাওয়া আর হইল না, নৌকা হইতেই শ্রীমন্দির দর্শন ও উদ্দেশে শ্রীরাধাশ্যামকে প্রণাম করিলাম।

ক্রমে যথাসময়ে নৌকা শ্রীরামপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল। আমরা বল্লভপুরের হরিসভাতে আশ্রয় নিলাম। গোপালদাস বৈরাগী নামক একটী বন্ধু আমাদের পরম যত্নে থকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কিন্তু এ দিনে আমাদের রেলে ওঠা হইল না, কারণ শ্যামচকের জমিদার ও রাজমাতার গাড়ী রিজার্ভের বিলম্ব হইল। তাঁহারা সব কলিকাতাতেই বাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গাড়ী রিজার্ভ না হওয়ার জন্য তিন দিন বাধ্য হইয়া আমাদের বল্লভপুরের হরিসভাতেই থাকিতে হইল। তিন দিন পরে গাড়ী রিজার্ভের সংবাদ পাইলাম।

১৯শে বৈশাখ বুধবার—অদ্য আমরা বেনারস পেসেঞ্জার গাড়িতে শ্রীরামপুর হইতে উঠিব। (হাবড়া হইতে দিবা ৯।৫৫ মিনিটে ছাড়ে) ঐ গাড়িতেই পরেশবাবু প্রভৃতি আসিতেছেন। তাই, তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে সকলে হাজির হইলাম। গাড়ীর ঘণ্টা হইল, কিন্তু টিকিটবাবুর আর দেখা নাই। আমাদের নিকট বেগ দিয়া তাঁর যে কিছু আদায় করিবার মতলব ছিল তাহা আগে জানিতাম না। দূর দেশের যাত্রীদের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের দল দেখিলে এঁরা এইরূপই করিয়া থাকেন। আমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিয়া একটী বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া একেবারে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়া হাজির হইয়া অভিযোগ করাতে তখন টিকিটবাবু যৎকিঞ্চিৎ পূজা নিয়া কৃপা করিয়া আমাদের হরিদ্বারের টিকিট দিলেন। গাড়ি প্লাটফরমে হাজির দেখিয়া ছুটাছুটি করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। পরেশবাবু প্রভৃতি তাঁহাদের রিজার্ভ গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়াছিলেন। আমাদের সকলকে উঠিতে দেখিয়া তাঁহারাও আশ্বস্থ হইলেন।

রেলে

পরেশবাবু আমার স্থান রিজার্ভ গাড়ির মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। আমি সঙ্গিগণকে গাড়ীতে বসাইয়া পরের ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অতিরিক্ত ভীরে পাছে স্ত্রীলোক-

গণকে গাড়ীতে উঠাইতে না পারি, এরজন্য মনে বড়ই ভয় ছিল, এক্ষণে সকলকে গাড়ীতে বসাইতে পারিয়া মনে বেশ আনন্দ হইতে লাগিল।

পরেশবাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৈশাখের অসহ্য গরমের মধ্য দিয়া আগুনের মত হল্‌কা বাতাসে অস্থির হইয়া ক্রমে সন্ধ্যা হইল রাত্রে একটু ভাল ছিলাম।

২০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার—দিবা ২টার সময় মোগলসরাই জংসন ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। এই স্থান হইতে আমরা ও, আর, আর, গাড়িতে চাপিয়া হরিদ্বার যাইব।

শ্রীরামপুর হইতে মোগলসরাই আসিতে, রেলে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। মাঝে একটা ষ্টেশনে, গার্ড সাহেব মহোদয় আমাদের রিজার্ভ গাড়ী হইলেও, তাহাতে একপাল হিন্দুস্থানীদের জোর করিয়া তুলিয়া দিলেন। আমাদের প্রতিবাদ তিনি শুনিলেন না। ষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ড সাহেবের মাসতুতো ভাই। তাহাকে বলিয়া কিছু ফল হইল না। দেশে ফিরিয়া খবরের কাগজে লম্বা চওড়া এক অত্যাচার-কাহিনী লেখা ভিন্ন, আর আমাদের প্রতিকার কি আছে ভাবিয়া কোন্ কাগজে কিরূপ লিখিব, মনে মনে তাহারই একটা মহড়া দিতে লাগিলাম। পরেশবাবু কিন্তু সেরূপ ধরনের লোক নন, তাঁর জমিদারী বুদ্ধি, কোন্ স্থানে কি করিতে হয়, বা কি করিয়া মান বাঁচাইতে হয়, তাহা তিনি বেশ বোঝেন, তাই পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই ফস্ করিয়া তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে গার্ডের ঘরে গিয়া কি বলাবলি করিলেন, তার পরেই দেখি লাল নিশান হাতে সাহেব পুঙ্গব ছুটিয়া আসিয়া আমাদের গাড়ীর সেই হিন্দুস্থানীদের—"এই শালালোক্ উতার যাও, রিজার্ভ গাড়ী জানতা নেই" এই বলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে তাহাদের নামাইয়া দিল।

আর একটা ঘটনা, দেশী অত্যাচার। আমাদের স্ত্রীলোকদের জেনানা গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছি। সেইস্থানে কতকগুলি হিন্দুস্থানীর মেয়ে ছেলে ছিল। তারা এক একজনে মোট ঘাটে এক একখানা বেঞ্চি অধিকার করিয়া শুইয়া যাইতেছিল, কিন্তু অন্য লোকেদের বসিতে দেওয়া দূরে থাক, গাড়ীতে ঢুকিতে বা দাঁড়াইতে পর্য্যন্ত জায়গা দেবে না। ঐ সকল নীচমনা স্ত্রীলোকেরা আমাদের নিরীহ ব্রাহ্মণ রমণীগণকে গালাগালি দিয়া এমন ধাক্কা মারিতে লাগিল যে, আমাদের ২।১ জনের বেশ গুরুতররূপে আঘাত লাগিল ও রক্ত পড়িল। কিন্তু ভদ্র স্ত্রীলোকগণ কি আর করিবেন, নীরবেই সব সহ্য করিতেছিলেন। ঐ সকল রমণীও বদরীনারায়ণের যাত্রী। পরে সেখানে পথে যাইতে আমাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। একদিন দেখি তাহাদের মধ্যে একজন, যে আমাদের স্ত্রীলোকগণকে প্রহারের কর্ত্রী ঠাকুরাণী ছিলেন, পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে আর তার শরীর দিয়া খুব রক্ত পড়িতেছে। ঘটনাটী এই—হঠাৎ পাহাড় হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর তার গায়ে পড়িয়া ঐরূপ ক্ষত-বিক্ষত ও চলচ্ছক্তি হীন করিয়া দিয়াছে। আমাদের মেয়েদের দেখিতে পাইয়াই হাতজোড় করিয়া তার সেই পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে লাগিল। আমাদের ব্রাহ্মণ রমণীরা তার এই কষ্ট দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

গাড়ীর মধ্যে দেশী অত্যাচার যে কি রকম হয়, তাহা যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে বেশী দূর গমন করেন তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে বুঝেন, আমারও যে কতবার এইরূপ ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছি তাহা বলিবার নয়। এর একমাত্র প্রতিকার হইতেছে "তুম্‌বি মিলিটারী হাম্‌বি মিলিটারী" এ ছাড়া পথের মধ্যে আর কিছু প্রতিকার নাই। গার্ডকে কি ষ্টেসনমাষ্টারকে দুঃখের কথা বলিতে গেলে "কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া" বা "What's the

matter" এই করিতে করিতেই ঘণ্টা পড়িয়া যায়। তখন "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা" ভাবিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া অধিকতর নির্য্যাতিতই হইতে হয়।

যাহা হউক বেলা ২টা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের ঝাঁজে সব যেন পুড়িয়া যাইতেছে। হরিদ্বারের গাড়ীরও বহু বিলম্ব। সন্ধ্যা ৬।৫০ মিনিটে ছাড়িবে। ইতিমধ্যে স্নান আহার সারিয়া নিতে হইবে। ষ্টেসন হইতে বাজার সামান্য দূর। কিন্তু বাজারের সামান্য দূরে একটী ভাল ধর্ম্মশালা আছে, মুটেদের মুখে সংবাদ পাইয়া, আমরা সেইখানেই গমন করিলাম। কিন্তু রাস্তা এমন গরম হইয়াছে যে, এই সামান্য পথ চলিতেই স্ত্রীলোক-গণের পায়েতে ফোস্কা পড়িয়া গেল।

ধর্ম্মশালাতে স্থান অধিকার করিয়া তারপর লোক প্রতি এক পয়সা হিসাবে ফুরণ করিয়া দিয়া ধর্ম্মশালার একটা চাকর দ্বারা ইঁদারার বরফের মত জল তুলিয়া স্নান করিতে, আমাদের যে কি আরাম বোধ হইল তাহা আর বলিবার নয়।

ধর্ম্মশালার এক মিশিরজী, আমাদের লোক প্রতি ।৵৹ আনা হিসাবে লইয়া ভাত, ডাল ও তরকারী দিতে পারেন এই সুসংবাদ প্রদান করাতে আমরা আর কাল বিলম্ব করিলাম না। ব্রাহ্মণ রমণীগণ ফলমূল খাইয়াই সে দিন কাটিয়ে দিলেন।

আমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি। এমন সময়ে অযোধ্যার একটী আড়কাটী বা পাণ্ডার লোক দেখাদিলেন। সে এতক্ষণ ধরিয়া আমাদের শিকার করিবার জন্য ওত পাতিয়া বসিয়াছিল, তার বহুদর্শিতা খুবই আছে, তাই আমরা রৌদ্রে তেতেপুড়ে আসিলে সে সময় আমাদের সঙ্গে কোন কথা বলে নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া আমাদের চেহারা, গাঁটরীর পরিমাণ, লোক সংখ্যা এই সব লক্ষ্য করিয়া তার গ্রাসের পরিমাণটা কি রকম হইবে

তাহাই কল্পনা করিতেছিল। যেই আমরা একটু সুস্থ হইয়া বসিয়াছি, অমনি সে আমাদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ধর্ম্মপুত্র বা তার চেয়ে বেশি রকম আত্মীয়তা পাতিয়ে নিল। আর অযোধ্যা তীর্থের ফল, বিশেষতঃ তার সঙ্গে গেলে কোন প্রকার কষ্ট হইবে না, টাকাও বেশী লাগিবে না, দয়া করিয়া যে যাহা দিবে তাহাতেই তার তীর্থের সফল করিয়ে দেবে ইত্যাদি বাঁধা বুলি বলিয়া স্ত্রীলোকগণকে মোহিত করিয়া দিল। ,সেতো' মহাশয়ের নামটী আমার ডাইরীর খাতাতে এখনও স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে—'ভোলানাথ'।

আমি এর পূর্ব্বে শ্রীধাম অযোধ্যা নগরী একবার দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমিই সব স্থান সকলকে দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু অতিরিক্ত পুণ্যকামী আমাদের যাত্রিদল, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা বল্লেন বাবা! তীর্থস্থানে পাণ্ডা না করিলে ফলোদয় হয় না।" তাই মাতৃস্থানীয়াদের কথায় আর প্রতিবাদ না করিয়া সেতো ভোলানাথের (জাতিতে নরসুন্দর ছিল) সঙ্গে আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মোগলসরাই হইতে ও, আর, আর, রেলে উঠিলাম। রাত্র প্রায় ২টার সময় আমাদের অযোধ্যা ঘাট ষ্টেশনে নামিয়ে দিল। পরে ভোলানাথ ষ্টেশনের পাশেই একটী আড্ডাতে বা পাণ্ডার খর্পরে আমাদের প্রবেশ করাল। আড্ডা বাড়ীর প্রবেশ পথেই দেখিলাম খাটিয়ার উপরে একটী গুণ্ডা চেহারা পাণ্ডাজী বসিয়া বসিয়া ২॥ হাত লম্বা হুকার নলচের উপরে, ধুনচীর মত কলকে চাপিয়ে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন, আর তার প্রেরিত চরেরা অন্ধকার রাত্রের ট্রেণে যূপকাষ্ঠের উপযুক্ত কি সব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাই বসিয়া ভাবছিলেন, হঠাৎ ভোলানাথের সঙ্গে আমাদের দলবল দেখিয়া তার তো হাসি আর ধরে না। ভোলানাথ পাণ্ডাজীকে এক লম্বা প্রণাম করিয়া চুপি চুপি কি সব বলিল। তার পরে আমরা সে রাত্রে থাকিবার মত সেই খর্পর মধ্যেই আশ্রয় লাভ করিলাম।

পথের কথা সাত কাহণ কহিয়া আসল কথা হইতে আমরা এখনও অনেক দূরে আছি। পাঠকবৃন্দ হয়তো বিরক্ত হইতেছেন, এজন্য ওসব বিষয়ে বেশী কিছু আর বলিব না। মোট কথা এই, পাণ্ডাপুঙ্গব শেষেতে আমাদের সুফল করাবার জন্য বেশ ভাল রকম করিয়াই বেগ দিয়াছিলেন। আমি একটু মাথা চাড়া দিতে ২।৪টী গালাগালিও খাইয়া ছিলাম। ঐ দিনেতে অন্য স্থানের একটী ষ্টেশন মাষ্টার সস্ত্রীক অযোধ্যা দর্শনে আসিয়া এর খর্পরে পড়েন, তিনিও নির্য্যাতিত হইয়া ছিলেন এবং সংবাদ পত্রে এই পাণ্ডা ঠাকুরের বিবরণ লিখিয়া সাধারণকে সতর্ক করিয়া দিবেন বলিয়া ছিলেন।

যাহা হউক দেখিতে দেখিতে রাত্র শেষ হইয়া গেল। "রাম রাঘব, রাম রাঘব" বলিয়া যাত্রিগণ শয্যা ত্যাগ করিলেন। সামান্য দূরে একজন হিন্দুস্থানী, খুব ভোর হইতে শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান করিতেছিল, আমরা শুইয়া শুইয়া তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলাম।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবধর্ম্মের অবস্থা

(ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত)

(৩)

ঐ সকল মূর্খ ভজন-দাম্ভিক কুসাধকগণ সমাজের মধ্যে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ভাষাগ্রন্থের অর্থবোধ বা মর্ম্মবোধ না করিতে পারিয়া কতকগুলি পয়ার মুখস্থ করিয়া নিজ নিজ মনগড়া অর্থ করিয়া সমাজে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল। প্রাচীন ভক্তগণের দৈন্য-বোধক পয়ার বা মুলশ্লোকের প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণের মধ্যে এমন একটা কুসংস্কার জন্মাইয়া দিল যে, "বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজনে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই।" আমরা এখনও প্রায়ই শুনিতে পাই "বিদ্যার গরব নাই গোরাচাঁদের হাটে" তখনও এই পয়ারটা খুবগর্ব্বের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিজ প্রাধান্যাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায় বলিত।

কিন্তু বলিতে কি দুঃখের বিষয় যে, তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, যে গোরাচাঁদের দোহাই তারা দেয় সেই গোরাচাঁদ কি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তারপর তাঁহার ভক্তগণের কথা ত আছেই। এইরূপ কুশিক্ষা এখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অবাধে অনেক স্থলে প্রভুত্ব করিতেছে।

হায়! হায়! যে বৈষ্ণবতার উচ্চাধিকার কখনও শাস্ত্র বা শাস্ত্রজ্ঞের আশ্রয় ব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারে নাই, যাহার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে বড় বড় পণ্ডিতেরও মস্তক ঘূর্ণিত হয়, যাহা একমাত্র শ্রীগুরু পদাশ্রয় করিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিলে তবে জানা যায় তাহার উপদেশ মূর্খে কি দিবে? বৈষ্ণব শাস্ত্রের তাহারা জানে কি? দেখিয়াছে কি? শুনিয়াছে কি? আর বুঝিয়াছেই বা কি? নিজে না বুঝিয়া, নিজে না জানিয়া অপরকে বুঝাইতে গেলে অন্য সম্প্রদায়ের লোক ভ্রান্তমত শুনিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক মনে করিয়া একটী ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে, ফলে অনেক স্থলে লোককে নিন্দুক, পাষণ্ডী কুতার্কিক প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের সুবিধা দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিদ্বেষী করিয়া তোলে। যাহাদের নিজের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ নাই, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহাদের নিজের মর্ম্মেই প্রবেশ করে নাই, যাহাদের বাহ্যিক আচার পর্য্যন্তও দম্ভময়, তাহাদের দেখিয়া যে অন্য শিক্ষিত সমাজ তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাতে সাধারণ সমাজের দোষ দেওয়া যায় না, দোষ প্রাচীন শাস্ত্র-অনধিত কুসংস্কারশীল কপট ভণ্ড দলের।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই সকল কারণে এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির উপযুক্ত প্রচারাভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম সভ্য সমাজ পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিম্ন সমাজ আশ্রয় করিয়া বিকৃত ভাবে দাঁড়াইল। কতকগুলি মহামূর্খ কপট দম্ভী ও দুষ্ট কুক্রিয়াসক্ত লোক সমাজের নেতা হইয়া বিবিধ কুমত উদ্ভাবন করিতে লাগিল। সেই সকল নেতাদ্বারাই ক্রমে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সাঁই, বীরকত, সহজীয়া, দরবেশ প্রভৃতি অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব উপধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া তাহাদের মত শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া সাধারণে প্রচার হইতে লাগিল। নবধা ভক্তির আচরণ লোপ পাইয়া বাহ্য ভাগ মাত্র অবশেষ রহিল। কলিযুগোচিত পবিত্রাদপি

পবিত্র মহামন্ত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মধ্বজী ভিক্ষুকের জীবিকা ও উদ্ধতের আমোদের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এইভাবে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের সুবিমল প্রেম-সরোবর শৈবাল সমাচ্ছন্ন, কমঠ কুম্ভীরপূর্ণ হইয়া পরিত্যক্ত হইল।

আমার বক্তব্য বিষয়টী বড়ই গুরুতর, আমি নিজে যে অযোগ্য তাহা জানি, ভাল করিয়া সাজাইয়া হয় ত—হয় ত কেন, নিশ্চয়ই পাঠকগণের নিকট দিতে পারিব না। আশা করি পাঠকগণ আমার সাজাইবার দোষ না দেখিয়া বিষয় গুরুত্বে নিজ নিজ মহত্বগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, উপরে যে সকল কথা বলিলাম তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর তাঁহার যে কয়জন উত্তমাধিকারী ভক্তছিলেন তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজ যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অপ্রকটের পর ক্রমেই এই অবস্থা হইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিয়া পরে আমি বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা মত কিছু বলিব। আশাকরি পাঠকগণ আমার কর্কশ লেখনি-প্রসূত বক্তব্যে কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। যথার্থই এমন নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে তাই প্রাণের আবেগে দু' চার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কাহাকেও নিন্দা করা বা ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মূল সম্প্রদায় হইতে যে সকল শাখা সৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মের নামে, সাধনের নামে কলঙ্ক করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আশা করি এ বিষয় সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীই আমার সহায় হইবেন।

বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, শুধু বৈষ্ণব-সমাজ বলিয়া নয় সমগ্র হিন্দুরই, কি ধর্ম্মসমাজ, কি লৌকিক সমাজ সমস্তই কাল-মাহাত্ম্যে অথবা নৈতিক অনবধানতা ও স্বার্থপরতা দোষে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচনা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজ লইয়া সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন হইলেও অন্য সামাজিক আলোচনার অবসর নাই।

সকল ধর্ম্ম-সমাজেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বৈষ্ণবের ভজন ব্যাপারে প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ সকল অবস্থাতেই গুরুর সহিত ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবের ইহ-পরলোকে সমান ভাবে গুরুর অনুগতি। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় বৈষ্ণবের গুরু লইয়াই সব। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, গুরু ও শিষ্য উভয়েই যেন কেমন কেমন হইয়াছেন। রাগের কোন কারণ নাই নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজ যেন এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কতকগুলি ভ্রান্ত উৎপথগামী নারকীয় বিলাস তৎপর হইয়াছেন। উপযুক্ত গুরু শিষ্য সাধন ও শাস্ত্রানুশীলন অভাবে বৈষ্ণব-সমাজ ক্রমে এইরূপ ভ্রষ্ট দশায় উপনীত হইয়াছে।

গুরু অনুগত সাধন, সাধনানুগত সিদ্ধি; বৈষ্ণব-সমাজ যেন এখন উহা বিস্মৃত হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, সাধন না করিয়া কেবল মাত্র বেশ সম্বল করিয়া সাধন রাজ্য হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

অন্তরের উন্নতি সাধনে অনাদর করিয়া বাহিরের উন্নতি প্রদর্শন প্রয়াসকে ভণ্ডামী বা কাপট্য বলে। ইহাতে লিপ্ত নির্লিপ্ত কে তাহা একবার বৈষ্ণব মাত্রেই মনে মনে বুঝিয়া বিশুদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন এ আশা কি আমরা করিতে পারি? বর্ত্তমানে নানা ভাবে উচ্চ শিক্ষিতের দৃষ্টি বৈষ্ণব-সমাজের উপর পড়িয়াছে, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে সমবেত শক্তিতে বোধহয় সমাজের উন্নতি-বিধান করা কষ্টকর হয় না।

একদিন এমন ছিল যেদিন কনিষ্ঠ অধিকারী উত্তমাধিকারীর অনুগত হইতেন কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ এখন আর সে ভাব দেখিতে পাই না। এখন পণ্ডিত হইলে বৈষ্ণব-সমাজের চক্ষুর বালী হইতে হয়। কেন না সমাজের সাধারণ বিশ্বাস বিদ্যা ভজন কণ্টক। বড়ই দুঃখের বিষয়, বলিতে প্রাণ ফাটে, মিথিলা হইতে সুদূর উড়িষ্যার সমগ্র দক্ষিণ প্রান্ত যে ধর্ম্মের প্রবল তুফানে এক সময় সমান তরঙ্গিত হইয়াছিল, পশ্চিম রাজস্থানের প্রবল প্রতাপ স্বাধীন রাজগণও একদিন যে পূত বারি মস্তকে ধারণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, যাহার প্রবাহে

অমন কাশীধামও টলিয়াছিল সেই গৌড়দেশের গৌরব কত। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এখন সাধারণের নিকট একটী বিদ্বেষের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কাহার দোষে, কি কারণে এমন হইল আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। বিশেষ ভাবে আমি পুনঃ পুনঃ সকলের নিকটই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার বক্তব্য দ্বারা কেহ যেন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি বলিয়া মনে না করেন, আমি যথার্থই নানা ভাবে সম্প্রদায়ের মধ্যে গোলমাল দেখিয়া তাহার নিবারণ কল্পে প্রাণের কথা নিবেদন করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য সমাজের মঙ্গল সাধনে যাহাতে সকলে বদ্ধ-পরিকর হয়েন, নতুবা গ্লানি কীর্ত্তন করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা কখনই আমার উদ্দেশ্য নয়। আশা করি সমাজের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণ আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বক্তব্য বিষয় রূঢ় হইলেও আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সমালোচনা

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামসুধারস।—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন রায় কর্ত্তৃক গ্রন্থিত ও প্রকাশিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয় গুণে ও লেখকের লেখনী মাধুর্য্যে প্রিয়াজির সুধা মধুর নাম অতি সুন্দর ভাবেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়াগতপ্রাণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী প্রভু, গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লিখিয়াছেন—"গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নামগান করিবার সৌভাগ্য কোটির মধ্যে একজনের ভাগ্যে উদয় হয়।" গোস্বামী প্রভুর কথা অতি সত্য, বহু জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য থাকিলে তবে প্রভুর লীলা কথা আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। গৌর বিষ্ণু-প্রিয়ার ভজন প্রচারক ত্রিশের সুপ্রসিদ্ধ বসন্ত সাধু গ্রন্থকারের মুখে প্রিয়াজির এই নামাবলী শুনিয়া খুবই আনন্দ পাইতেন। আমরা বহির্ম্মুখ জীব হইলেও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগ্রন্থের প্রচার কামনা করি। মুদ্রণ দোষে যাহা দু'একটা ভ্রম লক্ষিত হইল আশা করি পুনর্মুদ্রন সময়ে তাহা সংশোধিত হইবে পোঃ সাইস্তাগঞ্জ গ্রাম মুজাপুর জেলা শ্রীহট্ট গ্রন্থকারের নিকট শ্রীগ্রন্থ পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বীর তর্পণ।—জাতীয় ভাবের নবীন কবি শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত, মূল্য ।০ আনা, কাইগ্রাম, বর্দ্ধমান গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ৫০ পৃষ্ঠার পদ্য গ্রন্থ খানিতে গ্রন্থকার "বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার, কেশবচন্দ্র, আশুতোষ আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, হরিশ্চন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, নৌরজী, গোখলে, তিলক, রামমোহন ও শ্রদ্ধানন্দ" এই সকল মহাত্মার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ভূমিকার মধ্যে লিখিয়াছেন—"ছোট ছোট অত্যাচার উপদ্রবে তিনি নিজে আসিতে না পারিয়া এক একটী মহাপুরুষকে সময় সময় এখানে পাঠাইয়াদেন, এই সব মহাপুরুষ তাঁহার প্রেরণা লইয়া এখানে আসিয়া কাজ করেন। শ্রীভগবান কদিন আসিয়া পূর্ণরূপে যে কার্য্য সাধন করিবেন এই সকল মহাপুরুষও তাঁহারই ইঙ্গিতে আসিয়া সেই কার্য্য আংশিক ভাবে করিয়া যান।" লেখকের লিখন ভঙ্গী বড় সুন্দর। আমরা এ গ্রন্থের প্রচার বহুল পরিমানে দেখিতে পাইলে যথার্থই আনন্দিত হইব।

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

পূজ্যপাদ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ২।১ দিনের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া ২৬এ আশ্বিন রঘুনাথপুর গিয়াছেন, সেখান হইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর হইয়া ষষ্ঠী কিম্বা সপ্তমীর দিন পুনরায় কলিকাতার মঠে ফিরিবেন। ৺দুর্গা পূজার অষ্টমী হইতে কলিকাতায় তাঁহার মঠেই থাকিবেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৯০নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে গেলেই দেখা পাইবেন। ৺পূজার পর ত্রয়োদশীতে শোভাবাজার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়ের বাটীতে তিন প্রভুর সূচক হইবে। তারপর বোধ হয় পূর্ণিমাতেই কটক রওনা হইবেন।

নিত্যধামগত প্রভুপাদ শুকদেব গোস্বামী মহোদয়ের আশ্রিত ভক্তগণের সহায়তায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী ও প্রভুপাদের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ গৌরহরি গোস্বামী বিগত ৩১এ ভাদ্র প্রভুপাদের আদ্য শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যথারিতি সম্পন্ন করিয়াছেন। তৎপরে বিগত ৫ই আশ্বিন অধিবাস করিয়া ৬ই অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তন করিয়া ৭ই রবিবার মহা সমারোহে মহোৎসব কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলবলে মহোৎসবে যোগদান করিয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনাদি যথা নিয়মে করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল বিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভু কয়েকদিনই উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনে ও সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত নানাবিধ আলাপ আলোচনায় সকলকে আনন্দিত করিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় লিখিত নিম্নলিখিত শোকোচ্ছ্বাসটী সমাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।—

সোদরোপম শুকদেব গোস্বামীর তিরোধানে, শোকোচ্ছ্বাস।

(মৃত্যু দিবস শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ১৩৩৫)

শুকদেব—অগ্নিহোত্রি দ্বিজ যেন, প্রজ্জ্বালিত রাখে হেন,
বিরহ অনল তোর, দহিবে হৃদয় মোর, যাবৎ মরণ।

শুকদেব—এসেছিলি ধরাধামে, বিতরিতে হরিপ্রেমে,
সাধি কাজ, চলে গেলি—জিনিয়া মরণ॥

শুকদেব—চির হাস্য মুখরিত, হরি গুণ গান রত,
প্রফুল্ল আনন তোর, ভুলিব কেমনে।
স্মরিতে সে সব কথা, হৃদয়ে পাই যে ব্যথা,
ছিঁড়িয়াছে হৃদি তার দেখাব কোন জনে॥

শুকদেব—সাধি সে আপন কাজ, নিত্যধামে গেছ আজ,
নিত্য সিদ্ধ দেহ তোর জানি বহুদিন,
নিত্যানন্দ ধামে রহ, নিত্যানন্দ সঙ্গি-সহ,
নিত্যানন্দে ভাস চিরদিন॥

তোর গুণমুগ্ধ "হরি দাদা"
৩১শে ভাদ্র সন ১৩৩৫।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় পুত্রশোকে কাতর ছিলেন এ সংবাদ ভক্তির পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। অনেকেই তাঁহার সংবাদ জানিতে আগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পত্রাদি দিতেছেন, সকলকে পৃথক পত্র দেওয়া কষ্টকর, তাই এই পত্রিকা দ্বারে জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে তিনি পুনরায় বৈষ্ণবজগতের কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দাদা আমার বৈষ্ণব-জগতের মঙ্গলের জন্য জীবন পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব প্রদর্শনীকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে কি ভাবে যে তিনি দিবা রাত্র পরিশ্রম করিতেছেন তাহা একমাত্র সেই প্রভুই জানেন। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও আমরা সকলকে বিনীত অনুরোধ করি, যিনি যে ভাবে পারেন দাদাকে সাহায্য করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ করিতে যত্নবান হউন। দাদার ঠিকানা—

পোঃ পানিহাটী, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির, জেলা ২৪ পরগণা।

পানিহাটির শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয়ের পত্র পাইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহোদয় বিগত ৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার পানিহাটীতে গিয়াছিলেন। ভট্ট মহাশয়ের পুত্র-শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি দান কামনাতেই গোস্বামী প্রভুর গমন। সেখানে অমূল্যবাবুর সহিত বহু সময় শ্রীমন্মহা প্রভুর লীলা কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্বরচিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসম্বলিত "শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতিকাব্য" গ্রন্থ পাঠ এবং কীর্ত্তন দ্বারা সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সেখান হইতে কলিকাতা হইয়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় মাসিলা "ভক্তি-নিকেতনে" "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তসম্মিলনীর" সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিগত ১৯এ আশ্বিন শুক্রবার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ের কীর্ত্তন সম্প্রদায়সহ হাওড়া জিলার ফুলেশ্বরের নিকট খলিসানী গ্রামে গিয়াছিলেন। শুক্র ও শনি দুই দিনই সেখানে সভা হইয়াছিল। সভায় সহস্রাধিক ভক্ত সমবেত ছিলেন। কীর্ত্তনানন্দ ও প্রভুর "শ্রীশ্রীগৌর লীলা গীতিকাব্য" গ্রন্থ পাঠ শ্রবণে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ

সকলেই পরমানন্দ পাইয়াছেন। বহু দূর হইতে ভক্ত সমাবেশ হইয়াছিল। রবিবার সকালে উলুবেড়িয়া শ্রীশ্রী৺কালী বাড়ীতে গিয়া কীর্ত্তন করিয়া নৌকাযোগে রাত্রে আন্দুলে ফিরিয়া তৎপর দিবস গোস্বামী প্রভু কলিকাতা গিয়াছেন। ৺দুর্গা পূজার সময় গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় থাকিবেন

কটক শ্রীশ্রীরাসবিহারী মঠ হইতে আমরা "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভাগমন মহোৎসবের" পত্র পাইয়াছি। বিজয়া দশমীর দিন নীলাচলধাম হইতে বৃন্দাবন গমন মানসে শ্রীমন্মহাপ্রভু বহির্গত হইয়া ত্রয়োদশীতে কটকে আসিয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীল রামানন্দ রায়ের উদ্যানে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের আশ্রিত ভক্তগণ দ্বারা এই উৎসবটী আজ ৯ বৎসর হইতেছে, এবারও নিম্নলিখিত ভাবে উৎসব কার্য্য হইবে। রাসবিহারী মঠের শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু মহাশয় সর্ব্বসাধারণকে যোগদান করিতে আবেদন জানাইয়াছেন;—
উৎবের কার্য্যবিবরণী—৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতঃকালে সতীচউরা নিকটস্থ প্রাচীন ঘাট হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অভ্যর্থনাসূচক স্বাগত সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যায় আরতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন।

১০ই শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে লীলাগান ও সঙ্কীর্ত্তন। অপরাহ্নে বক্তৃতা, সন্ধ্যায় আরতি ও স্থানীয়ভক্তগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন।

১১ই রবিবার—অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মহোৎসব ও শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যায় মহানদী গড়গড়িয়া ঘাট পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন ও তথায় লীলাকীর্ত্তন।

"শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্য" সম্বন্ধে প্রেরিত পত্র

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু—

মহাশয়! আপনার সুবিখ্যাত ভক্তি মাসিকপত্রে পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বরূপ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতি-কাব্য" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন

দৃষ্টে একখানি শ্রীগ্রন্থ আনয়ন করিয়া ছিলাম, পাঠে প্রাণে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। একে প্রভুর লীলা তাতে আবার সময়োপযোগী ভাবে বর্ণনা, গ্রন্থখানি যে, কি উপাদেয় হইয়াছে তাহা বর্ণনার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না, তবুও প্রাণের আবেগে কিছু লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনার ইচ্ছা হইলে ভক্তি পত্রিকার একপার্শ্বে একটু স্থান দিতে পারেন।

আপনাদের আশীর্ব্বাদে ইতিপূর্ব্বে নানা শ্রীগ্রন্থে ও মাসিক পত্রিকাতে প্রভুর লীলাচরিত্র পাঠ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, নানাস্থানে পাঠ ও বক্তৃতাদিতেও কিছু কিছু শুনিয়াছি। প্রথমে শ্রীগ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম অন্যান্য গ্রন্থাদিতে যে ভাবে বর্ণনা দেখি এ বুঝি সেই ভাবেরই লেখা, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমার সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। গ্রন্থের ভাব, ভাষা, সাজাইবার প্রণালী সকলগুলিই অতীব মনোহর হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার পূর্ব্বাভাসটী পাঠে আমার বহুদিনের একটি সন্দেহ মিটিয়াছে। অনেকে বলেন স্বপ্ন বিলাসটী ছয় গোস্বামী পাদের আস্বাদ্য নয়, উহা শ্রীশ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের অনুভব সিদ্ধ। স্বপ্নবিলাসের যে সকল পদ মুদ্রিত দেখি তাহা শ্রীমৎ চক্রবর্ত্তী পাদের আনুগত্যে বৈষ্ণব মহাজনগণ করিয়াছেন। ঐ পদের সংখ্যাও ৩।৪ টী মাত্র আমি পাইয়াছি, এতদতিরিক্ত কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীগ্রন্থে এই লীলাটী যেরূপ পরিস্ফুটভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে লীলাটির রসেরপর্য্যায় যে বিশেষ ভাবে পুষ্ট হইয়াছে তাহা ব্রজরস তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

তারপর অন্যান্য যে কয়টি লীলার অবতারণা করিয়াছেন তন্মধ্যে "শ্রীশ্রীহরিদাস-অদ্বৈত মিলন" প্রসঙ্গটী ঐতিহাসিক সত্যের সহিত কাব্যের এক অভিনব সমাবেশ হইয়াছে। "শ্রীধাম নবদ্বীপ বর্ণন" গ্রন্থকারের লেখনীমুখে এমন সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন বর্ণনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। "নিমাইয়ের পৌগণ্ড ও কিশোরলীলা" বাল্য চাপল্য হেতু মধুর হাস্যরসের এক অফুরন্ত উৎস ছড়াইয়াছে। "দিগ্বিজয়ী পরাভব" "গৌর গদাধর মিলন" "মুকুন্দের সহিত রঙ্গ" সবই হাস্য এবং করুণ রসময়, বিশেষ শ্রীধরের সহিত

বাঙ্গটী আমার নিকট যে কি মধুর লাগিয়াছে তাহা আর কি বলিব। গ্রন্থখানির আগাগোড়া সমস্তই মধুর কোনটী রাখিয়া কোনটীর কথা বলিব। আমার মনে হয় শ্রীগ্রন্থখানি গৌরলীলা রসতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই আলোচ্য হইবে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় ভূমিকার মধ্যে গ্রন্থকার গোস্বামী প্রভুর কবিত্ব, বর্ণন প্রণালী, ভাষার লালিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তদতিরিক্ত বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। এক একটী প্রসঙ্গের শেষে সময়োপযোগী এক একটী সঙ্গীত সংযোজনা করিয়া প্রসঙ্গের মাধুর্য্য শতগুণে বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। তবে একটী বিষয়ে গ্রন্থকারকে অনুযোগ না করিয়া পারিলাম না, সেটী এই যে, এমন মধুর রসাস্বাদনে তিনি বাধা দিলেন। কেননা—কেবলমাত্র আদিলীলা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এই সঙ্গে পাইলে রসাস্বাদনে সকলে ভরপুর হইয়া যাইত। যাহাতে আমরা প্রভুর সমগ্র লীলাটী গোস্বামী পাদের নিকট হইতে পাইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা আপনি করিবেন। ইহাই আমার নিবেদন।

প্রাণের আবেগে লিখিতে লিখিতে পত্রখানি দীর্ঘ হইয়া গেল, ক্ষমা করিবেন। আশা করি আপনার কুশল। ইতি—*

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীতিনকড়ি ঘোষ এম, বি।

---

*। পত্রলেখক শ্রীগ্রন্থপাঠে আনন্দ পাইয়া প্রাণের আবেগে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি সত্য, প্রকৃত পক্ষেই শ্রীশ্রীগৌরলীলা-গীতি-কাব্য গ্রন্থখানি ভক্তগণের আদরের জিনিষ হইয়াছে। যেমন লেখা, তেমনই ছাপা, তেমনই কাগজ, তেমনই বাঁধান। কোনটীই অপছন্দ হইবার নয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীপ্রভুর চরণে গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থের প্রারম্ভে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্রটী অতীব মনোরম হইয়াছে। গ্রন্থখানির মূল্য বাঁধান ২।০ টাকা আবাঁধা ২৲ টাকা। কলিকাতা ৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ ও ৭-সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট্ এম, এল সাহা। বার্ড কোং একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্ট শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ পাইন। গ্লোব ভলক্যানাইজিং কোং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত শিখরিজা নাথ রায় চৌধুরী সাতক্ষীরা হাউস্ কাশীপুর কলিকাতা এই সকল ঠিকানায় গ্রন্থ পাওয়া যায়। ভক্তিকার্য্যালয়েও গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে। (ভঃ সঃ)

গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কথা

কাপড়ে বা জামায় কোন ফলের দাগ লাগিলে দাগটী উত্তমরূপে লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে গরম জলে ধুইলে পরিস্কার হইয়া যায়।

—o—

তপ্ত ব্যাঞ্জন বা দুগ্ধ শীঘ্র শীতল করিতে হইলে একটী প্রসস্তপাত্রে জল লইয়া তাহাতে এক মুঠা লবণ ও একমুঠা কাপড় কাঁচা সোডা ফেলিয়া দিয়া তাহার মধ্যে পাত্র ডুবাইয়া ধরিলে শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয়।

—o—

নূতন রং করা ঘরে খুব বেশী রংয়ের গন্ধ থাকিলে ৩।৪টী পেয়াজ ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া ঘরের মধ্যে রাখিলে কয়েক ঘন্টার মধেই রংয়ের গন্ধ কমিয়া যায়।

—o—

ব্যবহৃত রুমাল কাচিয়া আর্শি অথবা পালিস করা পাথরের মেজের উপর টানিয়া মেলিয়া দিলে উহা শুখাইলে ঠিক ইস্ত্রি করা রুমালের মত দেখায়। লেস্ ফিতা বা ঐরূপ কোন দ্রব্য কাচিয়া ভিজা অবস্থাতে যদি বোতলের চারিদিকে সমান করিয়া জড়াইরা দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা শুখাইলে ঠিক নূতনের মত দেখাইবে।

—o—

দুইভাগ ক্যাষ্টর অয়েল ও একভাগ ভিনিগার মিশাইলে উৎকৃষ্ঠ পালিস প্রস্তুত হয়। প্রথমত ছোট কাপড়ের টুকরাদ্বারা লাগাইয়া শেষে বড় কাপড় দ্বারা ঘসিয়া দিতে হয়।

—o—

শাটিন কাপড় ধুইবার জলে কিছু মেথিলেটেড্ স্পিরিট দিয়া দিলে সাটিনের রং উজ্জ্বল থাকে।

—o—

চিম্‌নিতে ময়লা জমিয়া দাগ হইয়া গেলে একটু কাপড়ের টুকরায় বা তুলায় স্প্রীট লইয়া দাগের উপর লাগাইয়া শুকনা কাপড়ে পুছিয়া দিলে নূতনের মত পরিস্কার হইয়া যায়।

—o—

অ্যালুইমিনিয়মের বাসনে দাগ ধরিলে নুন ঘসিয়া দিলে দাগ উঠিয়া যায়।

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

প্রার্থনা

হে চির মঙ্গলময়! ভাবিয়াছিলাম আর প্রার্থনা করিয়া তোমাকে বিব্রত করিব না, কিন্তু তোমার অদ্ভুত লীলাভঙ্গী দেখিয়া, প্রার্থনা না করিলেও মধ্যে মধ্যে দু'একটা প্রাণের কথা বলিতে না পারিয়া যেন প্রাণটা কেমন আন্-চান্ করে তাই আজ আবার কিছু বলিবার জন্য বসিয়াছি। তোমার নিকট বলিয়াই আমি খালাস, যাহা করিবার হয় তুমি করিও।

বাল্যকাল হইতে ভাবিয়াছিলাম সংসার করিয়া সুখী হইব, যথাকালে সংসার সাজাইয়া এক দুই করিয়া দিনগুলি যেন বেশ কাটিতে লাগিল। তারপর হাট যখন বেশ জমিয়া গেল তখন ক্রমে ক্রমে যেন সংসারের উপর একটু একটু করিয়া বিরক্তি আসিতে লাগিল। আজ ছেলের অসুখই, কাল্ মেয়ের বিবাহ, পরশু স্ত্রী রোগের তাড়নায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এই অর্থের অভাব, এই আবার অর্থ পাইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, এ

সকল নানাবিধ ব্যাপারে মুখ ফুটিয়া হয় ত দুই একবার বলিয়াও ফেলিলাম যে, আর পারি না। আবার একটু নিভৃতে চিন্তা করিয়া নিজেকেই ধিক্কার আসিল, নিজের উপর নিজেই ধমক দিয়া বলিলাম—সংসারের ভোগ সুখ যাচিয়া যাচিয়া নিয়াছ, এখন পারিনা বলিলে চলিবে কেন? নিভৃতে একটু হাসিলাম, আর তোমার উদ্দেশে বলিলাম—বেশ! একটা কাঠের পুতুলকে লইয়া রং বেরংয়ের খেলাটা বেশ খেলিতেছ?

যাক্—এখন এত কাণ্ড কারখানার মধ্যেও দেখিতেছি, তোমার প্রতি নির্ভর রাখিয়া যে কার্য্যটী করি তাহাতেই খুব শান্তি পাই, আর সেই কার্য্যটি যেন অনায়াসে নিষ্পন্ন হইয়া যায়। তারপর যখন দেখি, —কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে তোমার নাম স্মরণ করিয়া যে কার্য্য করিব বলিয়া কল্পনা করি তাহাতেও সেই কার্যের শুভাশুভ বুদ্ধিরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়া তুমি বুঝাইয়া দাও, তখন তোমাকে সর্ব্বমঙ্গলময়—বাঞ্ছাকল্পতরু না বলিয়া থাকিতে পারি না।

শাস্ত্রমুখে, সাধুমুখে শুনি তুমি অনন্ত শক্তিদাতা, আবার নিজের ক্ষুদ্র জীবনেও বহু কার্য্যে প্রত্যক্ষ করি যে, তুমি অনন্ত শক্তিদাতা, আনন্দময়। তোমার মত শান্তি-সুখ-বিধাতা জীবের হিতৈষী বন্ধু আর কে আছে। তোমাকে বলিয়া জানাইবার কি আছে নাথ! তুমি ত বাসনা প্রাণে জাগিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার ফলাফল ঠিক করিয়া আমার প্রতি সেই মত ব্যবহার করিতেছ। তবে আর তোমাকে বলিয়া কি জানাইব? তোমার যাহা-ইচ্ছা তাহাই কর। যদি আমার প্রার্থনা জানিতে চাও তবে আমি এইমাত্র বলি যে, আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখিবে, ধন, জন, গৃহাদির সহিত এবং ভোগ্যবস্তুর সহিত সংযোগ ও বিয়োগ যখন যাহা ঘটাও তাহাকেই যেন তোমার মঙ্গলময় বিধান বলিয়া সরল প্রাণে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। তুমি যে শুধু আমার নয় সর্ব্বজীবের চক্ষুর চক্ষু,

কর্ণের কর্ণ, রসনার রসনা, সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, মনের মন, জীবনের জীবন, একমাত্র আরাধ্য বস্তু ইহা যেন বুঝিতে—ভাবিতে এবং প্রত্যেক কার্য্যে অনুভব করিতে পারি। সংসারের সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ এ সকলই যে তোমার প্রদত্ত এবং জীবনের উন্নতির হেতু ইহা যেন বুঝিতেপারি। অকপট প্রাণে যেন বলিতে পারি "প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।" আজ আমার তোমার নিকট এইটুকুই প্রার্থনা।

দীন—সম্পাদক

ব্রহ্ম হরিদাস আবাহন

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত।)

নীচ কুলেতে জনম তোমার ভক্তকুলের কণ্ঠহার।
নামীর চেয়ে নামটী বড় এই জানাতে অবতার॥
তৃণের চেয়ে সুনীচ হ'য়ে সহিষ্ণুতায় তরুর মত।
মান না নিয়ে পরকে দিয়ে নাম জ'পেছ অবিরত॥
কাজির বেতের আঘাত খেয়ে নামটী তুমি ছাড়নি।
লক্ষ্যহীরার নয়ন বানে নামের বলে টলনি॥
স্বেচ্ছায় তুমি মৃত্যু বরিলে ভীষ্মের মত ভক্ত বীর।
তোমায় অঙ্কে ধারণ করিয়া বাংলা আজিও উচ্চ-শীর॥
বৈষ্ণব-কুল-চূড়া-মণি তুমি তুমিই আদর্শ ভক্ত।
একবার এসে অধিকার কর তোমারি শূন্য তক্ত॥
আবার মাতুক জগতবাসীরা নামের নিশান উচ্চে তু'লে।
নামীও তখন আসিবে মরতে তাঁহার সাধের গোলক ভু'লে॥

—o—

সত্যের শিক্ষা

(শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায় বি, এ লিখিত)

যাঁহাকে সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা শিক্ষা দান করেন তিনিই প্রকৃত ভাগ্যবান। অনুভবের দ্বারা যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই প্রধান। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সীমাবদ্ধ শক্তি বিশিষ্ট, এই জন্য আমরা তদ্বারা বস্তু-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারি না।

আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারকালে শ্রীভগবান আমাদের ধী শক্তির বিচার করিবেন না। অতএব জগতের গোপনীয় ও জটিল বিষয় সমূহ গবেষণা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?

সাধ করিয়া কৌতূহলোদ্দীপক অপিচ নৈতিক জীবনের ক্ষতিজনক ব্যাপার অনুসন্ধান করতঃ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আত্মোন্নতিকর বিষয়গুলিকে অবহেলা করা বিষম মূর্খতার কার্য্য সন্দেহ নাই। হায় হায়! আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। অতএব ন্যায় শাস্ত্রের শুষ্ক যুক্তি তর্ক লইয়া থাকিবার আবশ্যক কি?

যাঁহার কর্ণ "সনাতন বাণী" শুনিতে পায় তাঁহার আর যুক্তি তর্কের কোন প্রয়োজন থাকে না।

সেই আদিবাণী প্রণব হইতে বিশ্ব চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয় বুঝিতে বা সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

যাঁহার লক্ষ্যস্থল একমাত্র শ্রীভগবান, ধর্ম্মই যাঁহার নীতি, এবং সকল বস্তু যিনি ভগবদ্দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন তিনিই ধীর ও ভগবৎ পাদপদ্ম লাভের প্রকৃত অধিকারী।

হে সত্যস্বরূপ ভগবান! তোমার নিত্য নির্ম্মল প্রেমে আমাকে চির-দিনের জন্য তন্ময় করিয়া রাখ।

হে নাথ! নানা বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করিতে আর আমার ভাল লাগে না। হে পূর্ণ! আমি যাহা কিছু চাই সকলই তোমাতে আছে।

হে জগদ্‌গুরু! তোমার সম্মুখে সকল শিক্ষক নীরব হউন। নিখিল বিশ্ব গভীর নীরবতায় পরিপূর্ণ হউক, আর তুমি নিজ করুণাগুণে তোমার অতুলনীয় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আমাকে উপদেশ দাও।

যিনি যত অচঞ্চল চিত্ত এবং আন্তরিক সরল ভাবাপন্ন তিনি তত সহজে সুগভীর ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কারণ তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধ বলিয়া উহা ভগবৎ কৃপা জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। (যেমন সূর্য্যের আলো নিখিল বস্তুর উপর পতিত হইলেও স্বচ্ছ দর্পণাদিতে যেরূপ প্রতি-ফলিত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না।)

পবিত্র চরিত্র সরল এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি তাঁহার কর্ত্তব্যের সংখ্যা দেখিয়া ভীত হ'ন না, কারণ তিনি তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ভগবানের সন্তোষ বিধানার্থ করিয়া থাকেন—নিজের জন্য নহে। এজন্য নিখিল কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার হৃদয় শান্তিতে পূর্ণ থাকে।

তোমার নিজ হৃদয়ের অসংযত বাসনারাশি তোমার অশান্তির প্রধান কারণ এবং অন্তরায়—অন্যে নহে।

নীতিমান ভগবৎভক্ত প্রথমেই তাঁহার কি কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করতঃ উহা পালন করিতে যত্ন করেন এবং কার্য্যকালেও কোনরূপ লোভ বা দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া তাঁহার বিবেক বুদ্ধির সহায়তায় যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান।

ক্রমশঃ

নিতাই আমার অকুলের বন্ধু

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন রায় লিখিত।)

এ মহীমণ্ডলে. সবে পদে ঠেলে
ঘৃণায় না চায় ফিরে।
জঘন্য পাতকী বিষম নারকী,
সবে দূর্ দূর্ করে॥
পরশিলে স্নান, সর্ব্ব পাপ স্থান,
দেখিলে পাতক রাশি।
ক্রোধে দেয় গালি, অঙ্গে দেয় ধুলি,
ছি ছি ব'লে যায় চলি॥
(তখন) অকুল পাথারে, পড়িয়া ফাঁপরে
হাবু ডুবু যবে খায়।
হাঙ্গর কুম্ভীরে, আসে গ্রাসিবারে,
ভুজঙ্গ দংশিতে চায়॥
মোর কেহ নাই, কোথা মুই যাই,
কি করিব হায় হায়।
যখন ক্রন্দন, করয়ে পরাণ,
নিতাই ছুটিয়া যায়॥

---

* সুপ্রসিদ্ধ নামপ্রচারক, নিত্যানন্দ-প্রেমেপাগল মহাত্মা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পদামৃত আস্বাদনে লিখিত। (দীন লেখক)

"আমি আছি" ব'লে,　　নিয়ে তারে কোলে,
আদর সোহাগ করে।
(বলে) "গৌর হরি বল,　　ভব পারে চল,
আসিনু তোদের তরে॥"
জীবের লাগিয়া,　　নিতাই কাঁদিয়া,
আপনি পাগল পারা।
গৌরাঙ্গ বলিয়া,　　প্রেম ধন দিয়া,
নেচে গেয়ে আত্মহারা॥
এ দাস যোগেন্দ্র,　　দীন হীন মন্দ,
নিতাই চরণ সার।
নাই কোন ধন,　　অতি অভাজন,
ভবার্ণবে কর পার॥

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত)

(২০)

মাধাই বলিল—"প্রভু, আমার পাপের সীমা নাই সুতরাং তোমার নিকট হইতে দণ্ড পাওয়াই আমার যোগ্য হইতেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইতেছে না যে, তুমি একেবারে আমাকে ত্যাগ করিবে। প্রভু, আমাকে বলিয়া দাও কি করিলে আমি তোমার কৃপা পাইব।"

মাধাইএর বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়াছে, করুণাময়ের করুণ আঁখি করুণায় ছল ছল করিতেছে। তিনি সাধ্যমত স্বীয় ভাব গোপন করিয়া বলিলেন "মাধাই, তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গ হইতে রক্তপাত করিয়াছ, তুমি নিতাইর নিকট অপরাধী, তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করেন তবেই তোমার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। তিনি দয়াময়, তুমি তাঁহারই চরণ ধরিয়া পড়।" নিমাইএর কথা শুনিয়া মাধাই তখনই নিতাইএর চরণ দু'খানি ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভু! এখন তুমি ক্ষমা করিলেই আমি শ্রীভগবানের কৃপা পাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যেরূপ দয়াল, তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগেই, তুমি যে তাহাকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত, তাহা জগতে সকলেই জানে কিন্তু তাহা উচিত নয় যেহেতু তাহা হইলে এই দুরাত্মা ইহার অপরাধ রাশিকে অতি লঘু ভাবিবে। অতএব এই অপরাধীকে ক্ষমা করিতে আমি তোমার নিকট মিনতি করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলে ইহার হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহার অপরাধ এইরূপ গুরুতর। শ্রীপাদ! তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুজন অনুতপ্ত ও চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব এ অধমকে ক্ষমা করিয়া সাধু ও পাপাত্মায় কি বিভিন্নতা তাহার পরিচয় দাও।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ গদগদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ; তাহাই হউক, আমি উহাকে ক্ষমা করিলাম, তাহা কেন, আমি তোমার সমক্ষে সরল ভাবে বলিতেছি যে, যদি আমি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা আমি সমুদায় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম দুঃখী অনুতপ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাও। (শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত)

বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে কৃপা করিতে যুয়ায়॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ দ্বারে কৃপাকর সেই শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি।
সব দিব মাধাইরে শুনহ নিশ্চিতি॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়ি কৃপা কর তোমার মাধাই॥

প্রভু বলিলেন "শ্রীপাদ। তুমি যদি মাধাইকে ক্ষমা করিয়া থাক তাহাহইলে তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন কর। নিতাই বলিলেন "প্রভু তুমি আমার গৌরব দেখাইবার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া মাধাইকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তখন তিনি সেই পদ-লুণ্ঠিত মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ওরে অবোধ, শ্রীভগবান তোকে অগ্রেই ক্ষমা করিয়াছেন। দেখিতেছিস না তিনি তোর জন্য আমাকে অনুনয় করিতেছেন? "মাধাই সব কথা শুনিতে পাইলেন না. তিনি নিত্যানন্দের আলিঙ্গন লাভ করিবার পরক্ষণেই দীঘল হইয়া চেতনা হারাইয়া পড়িয়া গেলেন। ভক্তগণ "হরিবোল" বলিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

লোক সংঘট্ট দেখিয়া প্রভু জগাই মাধাইকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নদীয়াবাসী প্রকাশ্যভাবে আজি এই সর্ব্ব প্রথম প্রভু কর্ত্তৃক এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন। ভক্তগণ পর্য্যন্ত অবাক, বিস্ময়ে অভিভূত। সকলে কি এক স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া প্রভুর বাটীতে বসিয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এমন সময় জগাই মাধাই আসিয়া বাহির

হইতে প্রভুকে "ঠাকুর" "ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তখন প্রভু মুরারিকে বলিলেন—

এথানে আমার ঠাই আনহ মুরারি !
আজ্ঞা পাই দুহারে আনিল কোলে করি ॥

মুরারির দেহে তখন হনুমান আবেশ হইয়াছে। তিনি অবলীলাক্রমে জগাই মাধাইকে কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহাতেও জগাই মাধাইয়ের বল গর্ব্ব নাশ হইল।

দুই ভাই আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িল। তখন প্রভু নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! এই দুই জনকে গঙ্গা তীরে লইয়া গিয়া তুমি ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম মন্ত্র প্রদান কর।" জগাই মাধাইয়ের চেতনা নাই। ভক্তগণ তাহাদিগকে ধরা ধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। প্রভুও ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন। "দুই ভাইয়ের চেতনা নাই, সুতরাং তাহাদিগকে ধরা ধরি করিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে মৃত ব্যক্তির ন্যায় শোয়াইলেন। তখন নদীয়া টলমল হইয়াছে। সকলে জগাই মাধাইয়ের এ সংবাদ শুনিয়াছেন, শুনিয়া সেই স্থানে দৌড়িতেছেন। যেমন কোন বৃহৎ অনিষ্টকারী ব্যাঘ্র ধরা কি মারা পড়িলে, দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধরা পড়িয়াছে, ইহা দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমেই নাগরিকাগণ জুটিতেছেন ও অভিনব কলরব হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেখিতেছেন, যে জগাই মাধাই একটু পূর্ব্বে নদীয়ার "রাজা" ছিলেন, নদীয়ায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন ও করিতেন, সেই নদীয়ার রাজা অদ্য নিমেষের মধ্যে আর এক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা-দ্বয় অদ্য ধূলায় লুণ্ঠিত !

"তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীরস্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোক শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আমি এই দুইটী জীব আপনাকে দিলাম, আপনি ইহাদিগকে গঙ্গাস্নান করাইয়া হরিনাম দান করুন," এই মুহূর্ত্তের কার্য্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে, তাহার মধ্যে একটী নিম্নে দিলাম। নিত্যানন্দ দুই ভাইকে বলিতেছেন—

আয় রে জাহ্নবী তীরে দুটি ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই ॥ ধ্রু ॥
মাধাই, মারলি মারলি কর্‌লি ভালরে,
এখন হরি বলে নেচে আয়।
তুই মেরেছিস কলসীর খণ্ড,
আজ হরিনাম দিয়ে করিব দণ্ড ॥ (শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত)

জগাই মাধাইয়ের তখনও জ্ঞান হয় নাই। ভক্তগণ মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া দুই ভাইকে কাঁধে তুলিয়া জলে নামিলেন। এইবার দুই ভাইয়ের চেতনা হইল। জ্যোৎস্নাময়ী, রজনী, সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাতীরে সমবেত হইয়াছে। সকলেই প্রভুর কার্য্য দেখিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাজলে নামিয়া দুই ভাইয়ের নিকট তাহাদের পাপ মাগিলেন। বলিলেন "হে জগন্নাথ! হে মাধব! তোমরা এই তামা তুলসী ও গঙ্গাজলের সহিত তোমাদের কৃত সমস্ত পাপ আমকে অর্পণ করিয়া তোমরা পবিত্র হও।" জগতের লোক দেখিতেছে প্রভু এই কথা বলিয়া সেই দুই ভ্রাতার পাপ গ্রহণ করিবার জন্য অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইলেন।

পতিতপাবন প্রভুর এই অহেতুকী কৃপা শুনিয়া ত্রিজগৎ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। জগাই মাধাইর চক্ষু দিয়া ধারার আর বিরাম নাই, তাহারা ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল "প্রভু! আমরা পাপ করিয়াছি তজ্জন্য অনন্ত কাল নরক ভোগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার ভক্তগণ তোমার

শ্রীকরে ফুল চন্দন উপহার দিয়া পূজা করে আর আমরা এমনই পাতকী তোমাকে পাপ উপহার দিব! তাহা হইবে না ঠাকুর! তুমি দণ্ড দাও, আমরা তোমার দণ্ড মনোস্থুখে গ্রহণ করিব। তবে প্রার্থনা যেন আমরা কখনও তোমার চরণ বিস্মৃত না হই।"

দয়াময় প্রভু একবার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি আবার অঞ্জলি পাতিলেন এবং তাঁহার—

এ বোল শুনিয়া আঁখি করে ছল ছল।
মেঘের গম্ভীর নাদে বোলে হরি বোল॥
পুনরপি পাপ দান চাহি কর পাতে।

"প্রভু বলিলেন"—জগাই মাধাই! তোদের পাপ দে, দিয়া সুখে হরিনাম কর।" ইহাতে মাধাই বলিলেন "প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে আমাদিগের পাপ দিতে পারিব না। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ লোকে বলিবে যে, দুইটী নরাধম জগাই ও মাধাই, ভগবানের হস্তে তাহাদের পাপ রাশি দিয়াছিল।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাধাই কি নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছ? ভগবানের এক নাম পতিত পাবন। অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন, ভগবান সাধুর বন্ধু, ও পতিতের অরি, তিনি যে পতিতপাবন, অদ্য তোমরা দুই ভাই তাহার সাক্ষী হও। তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে, কিন্তু তোমাদের যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবানের যশ হইবে। জীবের কলঙ্ক হয় হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের যশ হউক। ভগবানের যশ অদ্য তোমাদের দ্বারা জীবের নিকট সম্যকরূপে প্রকাশিত হউক। অতএব তোমরা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পাপ প্রদান কর।"

এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জগাই মাধাই! আমি ত্রিলোক মাঝে তোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ

আমাকে দিয়া তোরা নির্ম্মল হ।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ দান মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই সে মন্ত্র পড়িয়া প্রভুর শ্রীহস্তে আপনাদের পাপ উৎসর্গ করিয়া দিল। আর প্রভু সকলকে শুনাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তোদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম।"

অন্তরঙ্গগণ তখনি দেখিলেন যে, প্রভুর সোনার বর্ণ অমনি কাল হইয়া গেল।" (শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত)

"দুইজন শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার॥" (চৈঃ ভাঃ)

তখন—

"প্রভু বলে—আর তোরা না করিস পাপ।
জগাই মাধাই বলে, আর নারে বাপ॥" ঐ

তারপর—

প্রভু বলে—শুন শুন তুমি দুইজন।
সত্য এই তোরে আমি বলিল বচন॥
কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর॥" ঐ

তখন লক্ষ কণ্ঠ ভেদিয়া হরিধ্বনি হইতেছিল। ভক্তগণ এই সুমঙ্গল হরিধ্বনির মধ্যে জগাই মাধাইকে লইয়া প্রভুর বাটীতে গমন করিল। প্রভু গৃহে নিত্যানন্দ ও ভক্তগণের সহিত উপবেশন করিলেন। জগাই মাধাইয়ের তখনও আর্ত্তি যায় নাই; তাহারা যুক্ত করে দুই প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। যথা—

"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরাধর॥
জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচার্য্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥

জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ॥
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিত -দুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥
সেই জয় জয় তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয় জয় শঙ্খ -চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর॥
জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর।
জয় হরিদাস বাসুদেব প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যাহা নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত যাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আজি দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার॥
অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী॥
কোটী ব্রহ্মবধ করি যদি তোর নাম লয়।
সত্য মোক্ষ তার, বেদে এই সত্য কয়॥

হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি বিচিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
আমি দ্রোহ কৈঁনু প্রিয় শরীর তোমার।
তথাপিহ আমা দুই করিলে উদ্ধার॥
নিলক্ষে তারিলা ব্রহ্ম দৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥" (চৈতন্যভাগবত)

ভক্তগণ বলিলেন, প্রভু! আজ আমরা অনেক দেখিলাম। বিশেষ এই দুই ভাই যেভাবে তোমার স্তুতি করিল, তাহাতে ইহাদের প্রতি তোমার কৃপা স্পষ্টই বোঝা গেল।

ক্রমশঃ

কৃতজ্ঞতা

(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা লিখিত।)

উপকারীর নিকটে উপকার স্বীকারের নাম কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতা ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতি যেমন জানিত, তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। পরমেশ্বরে অকপট বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা এই জাতির স্বভাব। ভক্তিযোগ ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান বিশ্ব জুড়িয়া,—ইহাদের ঈশ্বর বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বরূপ; সুতরাং ইহাদের ভক্তিও বিশ্ব ব্যাপিনী, ইহাদের কৃতজ্ঞতাও আদর্শের অনুরূপ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক আদর্শ মহারাজ বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের কৃতজ্ঞতা শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

জন্ত স্বভাবতঃই উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। বিক্রমাদিত্যের কৃতজ্ঞতার একটি পরিচয় আজ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

উড়িষ্যায় এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র। তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বিধবা ভগ্নি, ও নাবালক ভাগিনেয় প্রভৃতি লইয়া তিনি সর্ব্বদাই অভাবের পেষণে কষ্ট পাইতেন। দুর্ভাগ্য তাঁহাকে যেন ছাড়িতে চাহিত না। তাঁহার নিত্য দুঃখে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসী সকলেই খুব দুঃখিত থাকিত।

সকলে তাঁহাকে একবার পরামর্শ দিল, "আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় একবার গমন করুন; তিনি যেমন গুণগ্রাহী, তেমনি বিদ্যোৎসাহী, তেমনি দাতা। তাঁহার সভায় গমন করিলে আপনি নিশ্চয়ই অভাবের কবলে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"কর্ম্মফল গঠিত অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আমি বিক্রমাদিত্যের সভায় যাইলেও আমার দুর্গতির অবসান হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না।" যাহা হউক, ব্রাহ্মণ সকলের অনুরোধে বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায় গমন করিলেন।

দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষতলে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে স্নানাদি করিয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণাপ্রপীড়িত কলেবরে, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য সেদিন অন্দর হইতে বাহিরে আসিলেন না। ক্রমে চারিদিন বিক্রমাদিত্য অন্দরেই রহিলেন। ব্রাহ্মণ তখন আপন অদৃষ্টের খেলা চিন্তা করিয়া উজ্জয়িনী হইতে বাহির হইলেন; এবং এক নির্জ্জন বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন দুরদৃষ্ট খণ্ডনের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

কিছুকাল গত হইল। বিক্রমাদিত্য একদিন নিজ পাত্র মিত্রাদির সঙ্গে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। তিনি এক বন্য মহিষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে

করিতে বহু দূরবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ অদৃশ্য দেশে পড়িয়া রহিল। বেলা ক্রমে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইলেন; তাঁহার অশ্বও ক্ষুৎ-পিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি বন-মধ্যে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

সহসা দেখিলেন, ছোট একটী তৃণ কুটীর। সামান্য একটু ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া এক ব্রাহ্মণ তাহার মধ্যে ধ্যান-নিমগ্ন। তিনি তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ ধ্যান ত্যাগ করিয়া, ব্যস্ত হইয়া উত্থিত হইলেন, এবং বিক্রমাদিত্যকে সুবাসিত শীতল জল ও ফল মূল আনিয়া প্রদান করিলেন। তাঁহার অশ্বের ঘাস ও পানীয় জল প্রদান করিলেন। ক্রমে বিক্রমাদিত্য সুস্থ হইলেন।

বিক্রমাদিত্য নিজে সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের আতিথেয়তায় অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ সদালাপে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও কঠোর তপস্যার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী নহেন। অথচ সন্ন্যাসীর মত বনবাসী। তখন কৌতূহল বশে অতি বিনীতভাবে তাঁহার আশ্রমোচিত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার নিবাস উড়িষ্যায়; আমি, বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রাদি নিয়া অভাবের পেষনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতাম। শেষে দেশবাসীগণের অনুরোধে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় সাহায্যের জন্য উপস্থিত হই। কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে। আমি উজ্জয়িনীতে আসিয়া যে চারিদিন রাজসভায় গমন করিলাম, সেই চারদিনই মহারাজা অন্দরে রহিলেন, তখন বুঝিলাম, সমস্তই আমার কর্ম্মফলমূলক খেলা। যে দুষ্কৃতির জন্য আমার এই দুর্গতি, সেই দুষ্কৃতি খণ্ডনের জন্য

তখন বাহির হইলাম। আর দেশে যাই নাই। এই নির্জ্জন কাননে বসিয়া বিশ্বনাথের চরণ কমলে কৃতপাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

মহারাজা বিক্রমাদিত্য নীরবে সমস্ত শ্রবণ করিলেন, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া আপন অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে আসিলেন। রাজবাড়ীর মত এক বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া। মহাসমারোহে ব্রাহ্মণকে আনাইয়া সেই বাড়ী এবং যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বীয় পরিজনবর্গকে আনাইয়া তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

বিক্রমাদিত্য কথায় কথায় প্রায়ই ব্রাহ্মণকে বলিতেন, "আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিদান হয় না। আপনার এই রাজ্য,—আপনার জন্য আমার এই দেহ,—আপনার অর্চ্চনায় আমার সর্ব্বস্ব নিত্য অর্পনীয়।"

ব্রাহ্মণ এই সব কথায় বিশেষ তৃপ্ত হইতেন না, বরং সন্দিগ্ধ হইতেন। তিনি বুঝিতেন, তিনি এমন কোন উপকারই করেন নাই, যাহার জন্য মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বদা এইরূপ বাক্য বলিয়া স্তুতি করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যের কথার পরীক্ষা নিতে সঙ্কল্প করিলেন। ব্রাহ্মণের ভবনে একদিন বিক্রমাদিত্যের শিশু পুত্র বহু লক্ষ টাকার অলঙ্কার পরিয়া প্রবেশ করিল। রাজকুমার বা মহিষীগণ ব্রাহ্মণের গৃহে যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মণ রাজকুমারকে খুব স্নেহ যত্ন করিয়া, ভুলাইয়া আপন ভবনে তিন দিনের জন্য গোপনে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে রাজকুমারের অন্বেষণে রাজ বাটীতে ধুম পড়িয়া গেল। চারি দিকে লোক জন ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। পুলিশের লোকেও নানাস্থানে খানাতল্লাসী আরম্ভ করিল। যাহাকে পায় তাহাকেই সন্দেহ করিয়া তারা ধরিতে লাগিল। রাজকুমারকে খুন করিয়া কোন দুর্ব্বৃত্ত

তাহার বহু মূল্য অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছে ইহাই লোকের ধারণা হইল।

চারিদিন গত হইল। রাজপরিবার মধ্যে কান্নাকাটী উত্থিত হইল। রাজধানীর মধ্যে ভয়, বিস্ময় ও শোকের ছায়া পতিত হইল। এমন সময় ব্রাহ্মণ তাহার এক অতি বিশ্বাসী ভৃত্যের হাতে রাজকুমারের গলার হার বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিল। আর বলিয়া দিল, "এক কাজ করিস,—যেখানে দেখিবি অনেক লোক একত্র হইয়া রাজকুমারের বিষয় আলোচনা করিতেছে, সেখানে যাইয়া এই হার বেচিবার প্রস্তাব করিবি। এবং বলিবি "আমার প্রভু ব্রাহ্মণ অলঙ্কারের লোভে রাজকুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন। এখন তিনি সেই সব অলঙ্কার বিক্রী করিতেছেন।"

ভৃত্য তাহাই করিল। বাজারের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পুলিশ দলে দলে তখনই ব্রাহ্মণের ভবনে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন "হা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, অলঙ্কারের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাজকুমারকে হত্যা করিয়াছি। তখনই তাহাকে বাঁধিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইল। বিচারও সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গেল। বিচারক অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণকে সহরবাসীর সন্তোষ ও তিরস্কারের সঙ্গে বধ্য ভূমিতে আনিয়া দণ্ডায়মান করা হইল। কেবল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আদেশের অপেক্ষা করা হইতে লাগিল।

মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমস্তই শুনিতেছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, ব্রাহ্মণকে বধ্য ভূমিতে নিয়া যাওয়া হইয়াছে, তখনই ছুটিয়া সেখানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে নিজে একবার ঘটনার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হা মহারাজ! আমি ধনলোভে আপনার কুমারকে হত্যা করিয়াছি। কি করিব! আমি হাজার হইলেও দরিদ্র

ব্রাহ্মণ ; আপনি হাজার উপকার করিলেও আমি লোভের মোহে উন্মত্ত ; —সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর নাই। আমি এত টাকার অলঙ্কারের লোভ ত্যাগ করিব কিরূপে ? আমি রাজকুমারকে হত্যা করিয়া সেই সকল অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছি।"

তখন সহস্র কণ্ঠে ব্রাহ্মণকে কৃতঘ্ন, বর্ব্বর, পশু, রাক্ষস, প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করা হইতে লাগিল। "এখান পাপীষ্ঠকে শূলে আরোপন কর।" "এখনই বধ কর, সংহার কর," ইত্যাদি আদেশ বিপুল জনসঙ্ঘ হইতে প্রদত্ত হইতে লাগিল। কিন্তু ধীমান মহাপুরুষ বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের বন্ধন নিজ হস্তে খুলিয়া দিলেন, এবং সসম্মানে হাত ধরিয়া রাজ সভায় নিয়া রাজ সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। আর বলিলেন, "আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে অমন শত পুত্র নাশ করিলেও আপনার কোন অপরাধ হইতে পারে না। এই রাজত্ব, আর এই আমি বিক্রমাদিত্য আপনার।" শুনিয়া রাজধানীর সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ বিস্ময়ে চমৎকৃত হইল। ব্রাহ্মণ তখন বিক্রমাদিত্যের কৃতজ্ঞতা দর্শন করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে সসম্মানে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ ! আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতে-ছিলাম। আপনার পুত্র আমার গৃহে পুত্রগণের সঙ্গে পরমানন্দে খেলা করিতেছে। আজ জানিলাম আপনি যথার্থই বিক্রমাদিত্য—আপনি যথার্থই সত্যময় অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ! জগতের লোক আপনার নিকটে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করুক। আর যিনি জনমের পূর্ব্ব হইতে মরণের শেষ পর্য্যন্ত, অপার করুণার হস্ত বিস্তৃত করিয়া, আমাদিগের নিত্য মঙ্গল করিতে-ছেন সেই পরাৎপর পরম করুণাময় বিশ্বনাথের নিকটে নিত্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার শ্রীচরণকমলে দেহ মন স্বজন পরিজন অর্পণ করিয়া, মানব-জীবনের গৌরব রক্ষা করুক।"

বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এমন পরীক্ষায় নিযুক্ত

হইয়াছিলেন, যাহাতে আপনাকে শূলে চড়িয়া, নিষ্ঠুরভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ! যে আপনার প্রাণ বাঁচাইয়া অপরকে পরীক্ষা করিতে বসে, সে কখনও প্রকৃত পরীক্ষক হইতে পারে না। যে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া কোন লোকহিতকর বা দেশহিতকর কর্ম্ম করিতে বসে, সেও কখন কৃতকার্য্য হয় না।

ঐ ব্রাহ্মণ একদিকের আদর্শ, আর মহারাজা বিক্রমাদিত্য অন্যদিকের আদর্শ! হিন্দুজাতির সম্মুখে এই সকল আদর্শ থাকায় তাহারাও তাহাদের কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণপণ করে। হিন্দু জাতির কৃতজ্ঞতা বিক্রমাদিত্যের আদর্শে গড়া। জানিনা আবার কবে হিন্দু নিজেদের প্রাচীন আদর্শ নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া জাতির গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ যাঁহাদের দোহাই দিয়া বেড়ান, তাঁহারা কি ভাবে কোথায় বসিয়া সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য কি করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য পরপর কয়েকখানি পত্র আমরা পাইয়াছি। সম্প্রদায়ের নানারূপ আচরণ দেখিয়া অনেকে আবার মৌখিক জিজ্ঞাসাও করিতেছেন। আবশ্যক হইলে পত্র লেখকগণের নামধামসহ এক একখানি করিয়া পত্রগুলি সবই আমরা মুদ্রিত করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমরাও আজ সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নিকট একটী আবেদন জানাইতেছি।

পূজনীয় প্রভুপাদগণ, আচার্য্যগণ, বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থহানি ঘটিলে যে ভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়েন সম্প্রদায় মধ্যে কোন বিভ্রাট ঘটিলে সে ভাবের কোন সাড়া দেন না কেন? কয়েক মাস যাবৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রভৃতির নানাবিধ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া সমাজের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইতেছেন। কিন্তু কৈ, তাঁহার আহ্বানে কেহ সাড়া দিয়াছেন বলিয়াত কোন সংবাদ পাইতেছি না। তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট যে ভাবে তাঁহাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রতিবাদ একমাত্র "গৌড়ীয় ভিন্ন যে কয়খানি বৈষ্ণব সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা আছে তাহার কোনখানিতে হইয়াছে কি?

সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, প্রবীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মন্তব্য জানিতে উৎসুক। আমরা শুনিয়াছিলাম কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কৈ, তাঁহারও ত কোন সাড়া শব্দ নাই। ঘরে ঘরে বিবাদ বাঁধাইয়া কার্য্য পণ্ড করিতে অনেক সময় লোকের অভাব হয় না কিন্তু বাহিরের লোক আসিয়া যখন বুকের উপর চড়িয়া নিজের আরাধ্য দেবতাকে অকথ্য অশ্রাব্য হৃদয়-বিদারক ভাষায় গালাগালি দেয় তখন কেহ প্রকাশ হন না কেন বুঝি না।

প্রতিবাদ যদি না করিতে পারেন তবে লেখকের মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিবার অবসর দিয়া নিজেদের সমাজ হাল্কা করিয়া দিন তাহাও আবার কেহ কেহ বলিতেছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের কলঙ্কের কথা শ্রীপাদ্ হরিদাস গোস্বামীর কৃপায় চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। মোটামুটি ব্যাপারটী এই যে—শ্রীবৃন্দাবনে

গোবিন্দজির গোস্বামীগণ গোবিন্দজির জমিদারীর মধ্যে কসাইখানা বসাইয়া প্রাণী হত্যার প্রশ্রয় দিতেছেন। বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ স্বরাষ্ট্র কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ বর্ত্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ স্বামীজি নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীধামে বাস করিতেছেন। তিনিই আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী, তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ নহে সমগ্র হিন্দু-সমাজেরই সহানুভূতি দেখান দরকার। শ্রীবৃন্দাবন ধাম কেবলমাত্র বাঙ্গালির তীর্থ নহে, সমগ্র হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"* * * প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় বৎসরের অধিকাংশকাল শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন এবং সেখানে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি এ বিষয়ে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা তাঁহার মুখেই প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। কারণ তাঁহার কথার মূল্য অধিক এবং তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিলে এই কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। তিনি স্বয়ং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্য ভাবে শ্রীধামের এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য কি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে চাই। শ্রীধামে গমন করিয়া শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীধামের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে তিনি কি করিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার মুখে ইহার উত্তর চাহেন। শাস্ত্র রক্ষা আগে তারপর শাস্ত্র ব্যাখ্যা—শ্রীধাম রক্ষা আগে তবে ধামে বাস। তীর্থ-কণ্টকোদ্ধার আগে তবে তীর্থ মহিমা গান। তিনি বহুদর্শী, শাস্ত্রদর্শী ও ভজনবিজ্ঞ। এ সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে না।

শ্রীহট্টের অবসর প্রাপ্ত জেলাম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকিশোরীমোহন সেন মহাশয় বাড়ী করিয়া শ্রীধামে বাস করিতেছেন এবং ভজনানন্দে আছেন। কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীসত্যচরণ গুহ মহাশয়ও শ্রীধামে মধ্যে মধ্যে বাস করেন, তাঁহারও সেখানে বাড়ী আছে। শ্রীহট্টের নামজাদা জজ আদালতের উকিল প্রবর শ্রীরাধাবিনোদ দাস মহাশয়ও ব্রজবাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং ভজননিষ্ঠ। এই ভজন-বিঘ্নকারী শ্রীধামের কলঙ্ক অপনোদনের জন্য তাঁহারাই বা কি করিতেছেন, তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক।

স্বনামধন্য রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলবলে মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কীর্ত্তনানন্দে ব্রজবাসী বৈষ্ণবের মন হরণ করেন, তিনিই বা এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন। *

স্থানীয় জননায়ক শ্রীযমুনা সংস্কার কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী পুরুষসিংহ শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু বি-এ, এই গুরুতর বিষয়ে শ্রীমান্ শরৎকুমার ঘোষকে কি ভাবে সাহায্য করিতেছেন, তাহাও আমাদের জানা প্রয়োজন। শুনিতে পাই শ্রীবৃন্দাবনের মিউনিসিপালিটীর এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে। এ কথা যদি সত্য হয় তবে নারায়ণবাবুর ভাবী চেয়ারম্যানত্ব কালে শ্রীবৃন্দাবনের এই ভীষণ কলঙ্ক দূরীভূত হইবার আশা আমরা করিতে পারি কিনা তাহার উত্তর আমরা তাঁহার নিকটেই চাই।

বিরক্ত বৈষ্ণব চূড়ামণি পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ, মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ এখনও শ্রীধামে বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীধামে এই কসাইখানা কয়েক বৎসর হইতে অবাধে চলিতেছে। সহস্র সহস্র প্রাণী হত্যা শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের চক্ষের উপর হইতেছে। ইহাতে তাঁহাদের আসন টলিতেছে না কেন?

ভজননিষ্ঠ কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সেও বহু পরিশ্রমে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একটী নূতন সংস্করণ বাহির করিতেছেন, তিনি শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার রীতিমত লেখক। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবন্ধাদি

---

* পূজনীয় বাবাজী মহাশয়ের সহিত আমরা এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তিনি বলেন যে, "প্রভুপাদগণ, আচার্য্য সন্তানগণ বা যে কেহ আলোচনার অগ্রণী হইয়া আমাদিগকে সম্ভবমত কার্য্যের ভার দিলে আমরা তাহা লইতে বাধ্য, নচেৎ কোনরূপ আন্দোলন আলোচনায় অগ্রণী হইয়া আমরা স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিতে পারি না, তারপর এসব কার্য্যে যে ভাবে আলোচনা চালাইতে হয় তাহা করিতে গেলে কোনও আচার্য্য সন্তান বা প্রভুপাদকে অগ্রণী হওয়া আবশ্যক। তবে এ সকল কলঙ্ক অপনোদনে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আশা করি আন্দোলনের নেতাগণ বাবাজী মহাশয়ের অবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। (লেখক)

শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি উদাসীন কেন? তাঁহার মুখে আমরা ইহার উত্তর চাই।

শ্রীকামিনীকুমার ঘোষ বি-এ বহুকাল শ্রীধামে বাস করিতেছেন। তিনি রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের বিশ্বস্ত ম্যানেজার ছিলেন। শ্রীধামে তাঁহার প্রভুত্বও আছে। তিনিই বা এ বিষয়ে নীরব কেন?

শ্রীবৃন্দাবনে "বিপত্তির মধুসূদন" আর নাই। কিন্তু তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত গোষ্ঠী শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবাইত গোস্বামি-যুবকগণ বিদ্যমান আছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীমদনমোহন গোস্বামি ভাগবতরত্ন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী প্রভৃতি বল-বিত্তশালী গোস্বামি-কুলধুরন্ধর যুবক-বৃন্দইবা এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন?

আজ এই পর্যান্ত। আমরা আমাদের কার্য্য করিব। তেজস্বী বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, নির্ভীক বক্তা ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি-এ. মহাশয়কে এই সময় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার জন্য আমরা বিশিষ্ট ভাবে অনুরোধ করি। স্বামী বিশ্বানন্দকে তাঁহার মহাবীর দল লইয়া শ্রীধামে যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। এ বিষয় ভারতবর্ষব্যাপী তুমুল আন্দোলন প্রয়োজন। পরে সত্যাগ্রহ।"

গোস্বামী প্রভু যাহা কিছু বলিবার সবই বলিয়াছেন এবং সপরিবারে আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়াছেন। এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। এখন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ গোস্বামী প্রভুর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে শ্রীধামের কলঙ্ক দূর হয় তাহার চেষ্টা করিলেই আমরা সুখী হইব এবং আমাদের আবেদন নিবেদনের সুফল ফলিল বলিয়া মনে করিব। এ সম্বন্ধে যাঁহার যাহা বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইলে যথাকালে ভক্তিতে প্রকাশ হইবে।

দীনহীন—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র অধিকারী।

সঙ্কলন

মহদ্বাণী

মিতব্যয়িতা নিজস্ব টাকশাল।

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরপ্রত্যাশায় মানুষকে ছোট করে।

মনের অন্ধকার অপেক্ষা গাঢ় অন্ধকার আর কোথাও নাই।

অর্থ, ধূলিকণার ন্যায় প্রায় সকলেরই চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয়।

কিছু করিয়া ফেলিয়া আহাম্মক হওয়া অপেক্ষা করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দ্বিতীয়বার চিন্তা করা উচিত।

অসৎ পথে থাকিয়া লাভবান হওয়া অপেক্ষা, সৎপথে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া শতগুণে ভাল, তাহাতে হৃদয়ে শান্তির অভাব হয় না।

তোষামদপ্রিয় হামবড়া লোককে সন্তুষ্ট করিবে, ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। (সম্মিলনী)

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা

ডাক্তার বেণ্টলী—"বলেন আজকাল যে সমস্ত রোগে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন হইতেছে, সেই সমস্ত রোগই বাঙ্গালীর অপর্যাপ্ত খাদ্যের জন্য আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিতেছে।" অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর দুই;একটি কথা বলিয়া বলেন, "আজ কাল বাঙ্গালীদের গড়ে যে আয়, তাহাতেও যদি তাঁহারা একটু হিসাব করিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তাঁহারা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট হইতে পারেন। ফলে কোন প্রকার রোগই সহজে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।" তিনি ব্রাহ্মণদিগের এক পাক ও নিরামিষ আহারের প্রশংসা করিয়া বলেন, "আজ কাল সিদ্ধ চাউলের ভাত বিশেষতঃ ফেন ফেলা সিদ্ধ চাউলের ভাত খাওয়ার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা খুবই অনিষ্টদায়ক। ইহাতে চাউলের সার ভাগ থাকে না।"

সহজে পরিপাক হয় বলিয়া অনেকে পুরাতন চাউলের ভাত পছন্দ করেন। ডাঃ বেণ্টলী তাহারও নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই ধরণের

চাউলের মধ্যেও সার ভাগ খুব কম।" তিনি আস্ত ছোলা প্রভৃতি খাদ্যের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের দেশের বালক বালিকারা তেমনভাবে দুগ্ধ পান করিতে পায় না। তাঁহার মতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলে ম্যালেরিয়া বেরিবেরি, এমন কি কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত হইতে পারেনা।

(মেদিনীপুর হিতৈষী)

গারো পাহাড়ে বিরাট শুদ্ধি কার্য্য

শ্রীযুক্ত ললিতা দাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনস্থিত, "গৌরাঙ্গ দরিদ্রালয়" নামক "হাসপাতাল" ও "অরফেনেজের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহাশয়ের শিষ্য। তিনি সম্প্রতি বাঙ্গালার গারো পাহাড়ে অবস্থান করিতেছেন। তথায় তিনি খুব অল্পদিনের মধ্যেই ১০,৭৬৭ জন গারো হাজং ডালু কোচকে (যাঁহারা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল তাহাদের) শুদ্ধি করিয়া লইয়া জনৈক গোস্বামী সন্তান দ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া "হরিনাম কীর্ত্তন" করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, অতি সত্বরই আরও বহু খৃষ্টানকে হিন্দু সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন। এই শুদ্ধি ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা তিনি সমস্তই তাঁহার নিজ তহবিল হইতে বহন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সঙ্গে "খদ্দর" ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা পাহাড়ীদের মধ্যে বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে খদ্দর প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। (সময়)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলন

কাশিমবাজারের মহারাজকে মুখপাত্র করিয়া কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতিষ্ঠান-নির্ম্মাণের আধুনিক ও বহিরঙ্গ পদ্ধতি-সমূহ বেশ সুনিপুণ ভাবেই অবলম্বিত হইয়াছিল। এখন এই প্রতিষ্ঠানের একখানি নিজের গৃহে আছে। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, প্রতিষ্ঠানটি ভালরূপে চলিতেছে না। কি করা যায়? যাহা হইয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন কি করা যায়, তাহাই ভাবিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের দ্বারা প্রবর্ত্তিত যে বৈষ্ণবধর্ম্ম,

তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের যাহাতে প্রতিষ্ঠা হয় ও প্রচার হয়, এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকে যাহাতে একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের ধর্ম্মের যুগোপযোগী সংস্কার করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের ধর্ম্ম যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ আছে, এই মতভেদ স্বাভাবিক, ধরিয়া লইতে হইবে মতভেদ থাকিবে। এই মতভেদ সত্ত্বেও মিলনের ভূমি কোথায় প্রথমে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনের গৃহ নির্ম্মিত হওয়ার পর, অন্ততঃপক্ষে আরও তিনটিদল বলিতেছে আমরাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সুতরাং আমাদেরও কলিকাতায় গৃহ চাই। এজন্য আবেদনপত্র বাহির হইয়াছে এবং কেহ কেহ কাশিমবাজারের মহারাজকেও ধরিয়াছেন। এই তিনটি দল ছাড়া আর একটি প্রবল ও সক্ষম দল রহিয়াছে, ইহাঁদের কলিকাতায় মঠ আছে, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, ছাপাখানা ও কাগজ আছে, মোটারগাড়ী আছে মোটারগাড়ীতে চড়িয়া কলিকাতায় ভিক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য সম্মিলন ব্যতীত অন্ততঃপক্ষে আরও চারিটি প্রতিযোগীদল এই কলিকাতা সহরেই রহিয়াছে। প্রথম প্রয়োজন, এই চারিটিদলের নেতৃগণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনের গৃহে সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, এই সম্মিলনের গৃহ আপনাদের সকলেরই, আপনারা কেহ কাহাকেও গালাগালি না করিয়া আপনাদের নিজ নিজ মত এইস্থানে ব্যক্ত করার তুল্যরূপ অধিকারী। এই কার্য্যটি প্রথম দরকার। মায়াপুরের দলের সহিত গোস্বামীদের বিরোধ আছে থাকুক ; সূর্য্যবাবুর দল, শ্রীখণ্ডের দল, রামদাসের দল, বা সধুচাঁদের দলের ভিতর যে সব মতভেদ আছে থাকুক; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলন কোনও দলের পক্ষপাত করিবেন না। এই সব দলের নেতৃবৃন্দকে তুল্যরূপ অধিকার দিয়া ও তুল্যরূপে সম্মানিত করিয়া সম্মিলনের ভবনে লইয়া আসিবেন এবং প্রত্যেককেই বলিবেন আপনি আপনার কথা বলুন, কিন্তু কাহারও অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মতাবলম্বী বলিয়া যাঁহারা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁহাদের কাহারও কোনরূপ নিন্দা করিবেন না। সম্মিলনকে সফল করিতে হইলে ইহাই প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী, তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনায় ও ধর্ম্মসমন্বয়ে অভ্যস্ত, কয়েকটি সুশিক্ষিত (caltured)

লোক। এই লোকগুলি সম্মিলনের অন্তরঙ্গ শাখা হইবেন। ইহাঁরা কোন দলের পক্ষপাতী হইবেন না, প্রত্যেক দলের যাহা ভাল শ্রদ্ধার সহিত তাহা স্বীকার করিবেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম" কি প্রকারে যুগ-ধর্ম্ম বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিবেন। এই প্রকারে কার্য্য করিলে এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে। তাহা না করিয়া এই সম্মিলন যদি বিবাদমান শাখা বা উপসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোন একটির পক্ষপাতী হইয়া অপর-গুলিকে উপেক্ষা করেন তাহাহইলে এইসম্মিলনের কোন কাজ হইবে না। টাকার জোরে যদিইবা কেহ ইহাকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহাহইলেও সেই বাঁচিয়া থাকা মরিয়া ভূত হওয়ার মতো একটা অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার হইবে। এই সম্মিলনের যদি কেহ কর্ত্তৃপক্ষ থাকেন, এবং তাঁহারা যদি "সর্ব্বজ্ঞ" না হন, তাহাহইলে তাঁহারা আলোচনা করুন। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অতীতের আলোচনায় বেশী লাভ নাই, বর্ত্তমান এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের যতটুকু কল্যাণ করা যাইতে পারে, তাহা করার পন্থা নির্দ্ধারণ করা হউক। (বীরভূমি)

নবদ্বীপে যাত্রীনিগ্রহ

ভেটের সৃষ্টি

আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল নবদ্বীপে ভেটের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভেট ৵০ আনা, পরে ৶০ আনা ক্রমশঃ।/০ আনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে, পরে কতদূর গড়ায় কে জানে? শ্রীনিত্যানন্দ দেব স্থাপিত হইয়াছেন প্রায় ৪৫ বৎসর। শ্রীবাস অঙ্গনও প্রায় ঐরূপ। পরে "সোনার গৌরাঙ্গ" "পঞ্চতত্ত্ব" প্রভৃতিও প্রায় ২৫।৩০ বৎসর স্থাপিত হয়। এখন, নবদ্বীপের এই নূতন ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জ্জন দেখিয়া প্রায় ১০০ শত বাড়ীতে ভেটের ব্যবস্থা হইয়াছে! আবার কোন কোন আখড়াতেও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বাবাজী মহাশয়েরাও ভেটের ব্যবস্থা করিতেছেন!

সরাইবাড়ী

ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবমণ্ডলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণ ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া মোক্ষলাভ বাসনায় আকুল আবেগে কত অর্থব্যয়, কত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া দলে দলে নবদ্বীপ পরিদর্শন মানসে শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য বহু সরাইবাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম ইহা যাত্রিগণের সুবিধার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন মিউনিসিপালিটীর অভিভাবকগণের অমনোনিবেশবশতঃ অনেক সরাইবাড়ী কষাইখানায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রধানতঃ ধর্ম্মগতপ্রাণা নিরক্ষরা, অসহয়া মহিলাগণই তীর্থস্থানে ছুটিয়া থাকেন। আর নবদ্বীপের অধিকাংশ সরাইবাড়ীর কর্ত্তাগুলিও নিরক্ষর চরিত্রহীন। কাজে কাজেই মাতৃগণ পদেপদেই লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রতারিত হইয়া থাকেন।

কোন কোন সরাইবাড়ীর অধিকারীরাই আবার ভেটবাড়ীর "দালাল"। ইহাদের সহিত ভেটবাড়ীর উপার্জ্জনের অর্থ অংশভাগে চুক্তি থাকে। কাজেই যাত্রিগণ অর্চ্চন পূজাদি বর্জ্জিত প্রতিষ্ঠাহীন অর্থলোভীদিগের দ্বারা স্থাপিত অপ্রতিষ্ঠিতপ্রাণ বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া প্রতারিত হন।

যদি কোন যাত্রী অর্থাভাববশতঃ কোন ভেটবাড়ী যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তাঁহাকে সরাইবাড়ীর কর্ত্তার দ্বারা যেরূপে লাঞ্ছিত হইতে হয় তাহা শ্রবণ করিলে শরীরের প্রতিরুধিরবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। সে কাহিনী হৃদয় বিদারক।

ভেটবাড়ীর অত্যাচার

অধিকাংশ ভেটবাড়ীর গোস্বামীগণ নিজেদিগের অন্তরালে রাখিয়া নষ্টচরিত্র মনুষ্যত্বহীন পিশাচদিগকে ভেট আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে বহুবার বহুব্যক্তি সংবাদপত্রে পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সব হৃদয়বিদারক ব্যাপার শ্রবণ করিলে তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কালের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মজগতেও এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ধর্ম্মের সুনির্ম্মল স্রোতে পঙ্কিলতার আবির্ভাব হইয়াছে।

যে চৈতন্যদেব কামিনী কাঞ্চন বর্জ্জিত হইয়া, আচণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া অভিনব ভ্রাতৃপ্রেম দেশমধ্যে আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পথা-বলম্বী কুলাঙ্গার পিশাচগণ দেশের ও দশের প্রতি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে অনাচার অবিচারের স্রোত অপ্রতিহতভাবে বহাইতেছেন, ইহার প্রতি ধর্ম্মপ্রাণ মনীষিমণ্ডলীর এবং দেশবাসী আপামর সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত একান্ত কর্ত্তব্য।

আশাকরি দেশনেতৃগণ ও দেশভ্রাতৃগণ আজ স্বদেশবাসীকে পাষণ্ডের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণকে প্রতারিত হইতে না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। (মেদিনীপুর হিতৈষী)

বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য

পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় বিগত ১৭ই কার্ত্তিক হইতে ১৯শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত হাওড়া জেলার পোদ্‌ড়া গ্রামে সাধারণ হরিসাধন সমাজের ১৪শ বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তন করিয়া ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ২৪শে কার্ত্তিক ফিরিয়া ঐ দিনই আন্দুলের সন্নিকট গড়মুক্তাপুর গ্রামে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহানুভব কালাচাঁদ বাবাজী মহাশয়ের মঠে কীর্ত্তন করেন। উক্ত মঠে নূতন শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রবেশের কারণ এই কীর্ত্তন। পরদিন ২৫শে কার্ত্তিক পানি-হাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন হইয়াছে।

পানিহাটীতে কীর্ত্তনের পর একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। ফিরিয়া কলিকাতায় ২।১ স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের প্রথম কয়েকদিন কলিকাতা অঞ্চলে থাকিয়া অগ্রহায়ণের ৫ই সদলে বাবাজীমহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন। তথায় নিত্যধামগত শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয়ের স্মরণ মহোৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন থাকিয়া ১৩ই কিম্বা ১৪ই মথুরা হইয়া এলাহাবাদ যাইবেন। তথা হইতে ৺কাশীধামে ও গয়াক্ষেত্রে কীর্ত্তন শেষ করিয়া ২১শে অগ্রহায়ণ শ্রীখণ্ডের মহোৎসবে যোগদান করিবেন। সেখান হইতে দাইহাটী প্রভৃতি ঘুরিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিবেন। তথা হইতে পৌষ

মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলিকাতার মঠে ফিরিবেন। পৌষ মাসের তালিকা যথাসময়ে প্রকাশ হইবে।

—০—

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীমৎ রাধারমণদেবের অতিপ্রিয় শিষ্য ৺পুরীধামের শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজের মহান্ত শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী দাদা মহাশয় বিশেষ অসুস্থ হইয়া বিগত ২৪শে কার্ত্তিক পূজনীয় বাবাজী মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারী দাদা ও অন্যান্য দুই চারিজন ভক্ত গোবিন্দ দাদাকে ২৫শে কার্ত্তিক শ্রীধাম নবদ্বীপে লইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধারমণ দাদাকে শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

—•—

শ্রীপাট পাণিহাটিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষে মহা সমারোহে কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। তৎসহ পরম ভাগবৎ শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী বসিয়াছিল, আমরা উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়া বৈষ্ণব প্রদর্শনী দর্শনে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি। উৎসবের ও বৈষ্ণব প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হইবে।

—০—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীয় সুযোগ্য সম্পাদক বহুভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ অসুস্থতা নিবন্ধন কিছুদিনের জন্য সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অমূল্যবাবুকে শীঘ্র শীঘ্র রোগমুক্ত করুন ইহাই প্রার্থনা। যতদিন না তিনি সুস্থ হইয়া পুনরায় কার্য্যে যোগদান করেন ততদিন সম্মিলনীয় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দে মহাশয় সম্পাদকের কার্য্য করিবেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নবীন সম্পাদকের কার্য্যের সর্ব্ব প্রকার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

পৌষ ১৩৩৫

[একদিন শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য, ব্রজ-বনের ভজননিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গদাস দাদা মহাশয়ের সহিত পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভুর "শ্রীশ্রীনিতাই তত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, ইতিমধ্যে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় আলোচনা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুই জনের সিদ্ধান্তের মিমাংসা করিয়া দিলেন। শ্রীল বিশ্বরূপ প্রভুর সহিত শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গদাস বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের যে স্থানে অমিল হইতেছিল শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয় তাহার সমীচিন মিমাংসা করিয়া দিয়া শ্রীল গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তই রসপুষ্ট বলিয়া সমর্থন করিলেন এবং প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের—

"যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।"

এই পদের আনুগত্যে তদনুরূপ "শ্রীশ্রীনিতাই-গুণ" বর্ণন করিবার ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের ইঙ্গিতে আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বরূপ প্রভু নিজ স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব শক্তিতে উল্লিখিত পদের অনুরূপ যে নিতাই গুণ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা ভক্তির পাঠকগণের অবগতি এবং আনন্দবিধানের জন্য নিম্নে তাহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম।]

(ভক্তি-সম্পাদক)

"শ্রীশ্রীনিতাই-গুণ"

যদি, নিতাই না হ'ত কেমনে কি হ'ত
এ ঘোর কলিতে গতি।
ওকে, গৌর সন্ধান দিয়া মহা দান
শোধিত জীবের মতি॥
গোরা নামাক্ষরে কত সুধা ঝরে
কিবা তার আস্বাদন।
যদি, সেধে না পিয়াত কোন্ কলিহত
জুড়াত তাপিত জন॥
উদিল নিতাই ত্রিভুবনে তাই
ডাকিল প্রেমের বান।
তাহে, ভক্ত হংস পতিত বংশ
পাথারে করিল স্নান॥

বদনে নিতাই গুণ গাও ভাই
দয়ালের শিরোমণি সে।
গৌর প্রেমে সে হেন মাতোয়াল
দিশেহারা প্রতি নিমিষে ॥
"গোরা গোরা" বলি ম্যারে মালসাট
কভু পড়ে ভূমে আছাড়ি।
ধূলায় ধূসর হয় কলেবর
কভু কাঁদে বাহু পসারি ॥
ব্রজ বনবাসে যে উজ্জ্বল রসে
শ্রীরাধা শ্যামের পিরীতি।
সে রস ছানিয়া নিঙড়িয়া
দেখাইল তার মূরতি ॥
প্রেমের আশ্রয়ে বিষয়ে নিতাই
সহায়, শুধিতে ধায়
দাস "বিশ্বরূপে" কয় হেন যে নিতাই
বলিহারী যাই তায় ॥

"পাঁচালী" প্রভৃতি কাব্যে ভক্তিরসের উপকরণ।

"ভক্তি" পত্রিকার বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় আমি দুইখানি গীতাভিনয় হইতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিরসের উদাহরণ প্রদর্শনা করিয়াছি। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ভক্তিরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাই প্রভুর জন্য প্রাণ কাঁদিলেই আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়

থাকি। আমি তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস ও বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও ঘনরাম, কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের সুশীতল পদছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ জুড়াইতে চেষ্টা করি। আবেগপূর্ণ হৃদয় লইয়া যখনই প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখনই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদের অসীম কৃপায় আমাকে কদাপি বিফলমনোরথ হইতে হয় নাই।

প্রাচীন কবি বলিতে আমি ভগবদ্ভক্ত সাধক চণ্ডীদাস হইতে মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পর্য্যন্ত গণনা করিতেছি। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং বঙ্গীয় কবিওয়ালা ও পাঁচালীগায়কেরা এমন কি সাধক হরিনাথ মজুমদারও আমার মতে প্রাচীন কবি-শ্রেণী ভুক্ত। ফলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্যভাবের প্রভাববর্জ্জিত যে কিছু সাহিত্য বঙ্গভাষায় বর্ত্তমান, তাহাকেই আমি সংক্ষেপতঃ বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য নামে অভিহিত করিতেছি। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, সাহিত্যই খাঁটি স্বদেশী বাঙ্গলা সাহিত্য—এই সাহিত্যেই বাঙ্গালী সাধারণের জীবন ও জাতীয়ভাব ও চিন্তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে লৌকিকতা নাই, কৃত্রিমতা নাই, কপটতা নাই। কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর পরিশূন্য এই সকল কবিই খাঁটি বাংলা কবি। মহাকবি বিদ্যাপতি ও সাধক চণ্ডীদাসের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। অপরের কথা দূরে থাকুক কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ের কবিতারস-মাধুর্য্য পানেই বিভোর হইয়া যাইতেন। যথা—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

তারপর কবিকঙ্কনের "চণ্ডীকাব্য" ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ভক্তিরসমিশ্রিত কতই যে সুমধুর ভাব ও দিব্য বাক্যে সমুজ্জ্বল, তাহা সুরসিক ভক্ত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তাহার পর সর্ব্বজন পরিচিত কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের পরিচয় দেওয়া সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল মহাকবি কত নরনারীর দগ্ধপ্রাণে যে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছেন ও অদ্যাপি দিতেছেন, তাহা গণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। তাহার পর হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি বঙ্গের কবিওয়ালারা এবং দাশরথি, ব্রজমোহন, রসিকচন্দ্র প্রভৃতি "পাঁচালি" গায়কেরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতাবলী ও গীতের জন্য পূর্ব্ববঙ্গীয় নরনারীর ধর্ম্মভাব পোষণে যে কতই সাহায্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ঋণভারে আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়ে। অধিক কথা বলিতে কি, লোক-চিত্তজ্ঞ ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ ভক্ত-সাধক দাশরথিকে আমি মনে মনে পাশ্চাত্য মহাকবি সেক্সপীয়রের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত সমালোচক দাশরথিকে তাঁহার অশ্লীলতা হেতু ভদ্রসমাজের বহির্ভূত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অশ্লীলতা দোষের কথা ধরিলে, শুধু দাশরথি কেন জগতের বহু বহু সুপ্রসিদ্ধ কবিকেই ভদ্রসমাজ হইতে বিদূরিত করিতে হয়। ফলতঃ মহাকবিগণের অশ্লীলতা দোষ পরিমার্জ্জনীয় বলিয়াই মনে হয়। আর যে সকল ভাগ্যবান মহাত্মা, সাধনাবলে অথবা ভগবৎকৃপায় ভাবশুদ্ধি ও চিত্তের পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জগতে অশ্লীল কিছুই নাই। তবে তরলমতি অপরিপক্কবুদ্ধি বালক বা যুবকগণের পক্ষে অনেক সময়ে অশ্লীলতা দোষ চিত্তোন্নতির অন্তরায় বটে। যাহা হউক, দাশরথির নামে নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া আমি প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকাকে তাঁহার গ্রন্থাবলী সহানুভূতি পূর্ণ হৃদয়ে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দাশরথির পাঁচালীগ্রন্থের ন্যায়

ব্রজমোহন ও রসিকচন্দ্রের পাঁচালীগ্রন্থও অবশ্য বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকার আদরণীয় ও অবশ্য পাঠ্য।

পাঁচালীগ্রন্থ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ছড়া ও গান। ছড়াগুলির মধ্যে অনেক ভাল কথা পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে গানগুলিই পাঁচালী গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ। বিশেষতঃ দাশরথির কোন কোন গানের তুলনা নাই বলিলেই হয়। তাঁহার শক্তিবিষয়ক "আগমনী" গান অদ্যাপি শরৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাঁহার কৃষ্ণ বা রামচন্দ্রাদি বিষয়ক গানগুলিও ভক্তিরসে পরিপূরিত। ব্রজমোহন ও রসিকচন্দ্র রায়েরও কোন কোন গীত অদ্যাপি সাদরে গীত হইয়া থাকে। আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে, অতএব দাশরথির দুই একটী সুপ্রসিদ্ধ গীতমাত্র উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চিন্তাশীল পাঠক ও সহৃদয়া পাঠিকাগণ নীরবে নির্জ্জনে দাশরথীর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন করিবেন।—গুহক চণ্ডালের সরল ও অকপট প্রেম স্মরণ করিয়া ভগবান রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"কার প্রাণ নাশন, করবি রে ভাই শোন
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
প্রেমে "ওরে হাঁরে," ও বলে আমারে
আমি ওরে বড় বালবাসি তাই॥
"ওরে হাঁরে" বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরে উহার বড়ই ভক্তিভাব,
চাইনে অন্যধন, সাধু নইলে মন, জুড়ায় না রে—
আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে জুড়াই॥
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণেরো নই,
ভক্তিতে আমি চণ্ডালেরো হই,

ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর, সুধাইনে রে—
ভক্তে বিষ দিলে সুধাবলি খাই ॥”

জননী মেনকার নিকট জগন্মাতার আগমন উপলক্ষে—

“বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বেরে ল’য়ে কোলে।
হেরি গনেশ জননী রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন জলে ॥
ব্রহ্মাদি বালক যাঁর, গিরিবালিকা সেই তারা,
পদতলে বালকভানু, বালকচন্দ্রধরা,
বালকভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি,
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন রূপে সঁপিয়া রাখি নয়ন-যুগলে—
দাশরথি কহিছে রাণি! দুই তুল্য দরশন,
হের ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্মরূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে, বসেছে মা ব’লে ॥”

কবির অন্তিমকালে ত্রিতাপহারিণী ভাগীরথী-সমীপে প্রার্থনা—

“অন্তে পদপ্রান্তে মোরে, স্থান দিও মা সুরধুনি।
ভয়ে ডাকি মা গঙ্গে ভয়-ভঞ্জিনি তরঙ্গিনি ॥
জনক জননী দারা সুত বন্ধুবান্ধবে
নয়ন মুদিলে তারা, কেহ না সঙ্গে যাবে
অপার ভবসাগরে ভরসা জননি ॥
এ মা তরে অশেষ পাতকী
শমনেরে দিয়ে ফাঁকি,

বেদে শুনি মা তুমি নাকি পতিত-পাবনী—
আমি ত পতিত, দুঃখ দিওনা ফিরে ফিরে,
অজ্ঞান বালক তোমার সজ্ঞানে এল মা তীরে,
নির্ম্মল তব সলিলে ত্যজিতে পরাণি।”

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

ভারতে সভ্যতার চরম অবস্থা।

ভারতীয় সভ্যতা যে কতকালের তাহা নির্ণয় করিবার আশায় বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী অনেক রকমে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং স্ব স্ব চিন্তার ফলও তাঁহারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীষিগণের নানা জনে এ সম্বন্ধে নানা সমীচিন কথাও কহিয়া থাকেন এবং পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত এদেশেরও অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই সব কথায় সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমরা বলি, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে তাঁহাদের এ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। জগৎ-সৃষ্টির প্রথমেই ভারতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পৃথিবীর অপর সকল অংশ যখন অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, এমন কি কোন কোন অংশে যখন, মানবের অস্তিত্বই ছিল না, তখন হইতেই এই ভারতে সভ্যতার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতি,—যাঁহারা অল্পদিন মাত্র ধরাপৃষ্ঠে আপনাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও অতি অল্পদিন ;—বলিতে গেলে এই দিনকতক মাত্র ধরাতলে আপনাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহারা বোধহয় একেবারে এতটা মানিয়া লইতে কিছুতেই পারিবেন না

তাহা না পারিলেও ভারতীয় সভ্যতা যে অল্পদিনের নহে, পরন্তু ইহা যে অতি প্রাচীন সভ্যতা এ কথা স্বীকার সকলকেই করিতে হইবে। যাহা হউক, একথা লইয়া বেশী আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য জাতি কি বলিল না বলিল, তাহার জন্য আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়ারও কোন আবশ্যকতা আমরা বুঝি না। ফল কথা আমরা এইটুকুমাত্র বুঝিব যে, ভারতীয় সভ্যতা কোন স্মরণাতীত কাল হইতেই ধরাধামে প্রকাশিত হইয়াছে

বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী সেদিনের পাশ্চাত্য জাতি আজ স্বকীয় সভ্যতার যথেষ্ট বড়াই করিলেও, পাশ্চাত্যের এই নবীন সভ্যতা এবং প্রাচ্যের সেই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান রহিয়াছে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সভ্যতার মূলেই ভেদ বর্ত্তমান। প্রাচ্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ছিল—ত্যাগে, আর এই বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তিই হইল—ভোগপরায়ণতা। প্রতীচ্য সভ্যতা আজ চাহিতেছে,—যেন জগৎটাকে মুঠার মধ্যে পুরিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় ভোগবিলাসের একমাত্র উপাদানরূপে গ্রহণ করিতে;—আর প্রাচ্য সভ্যতা চাহিয়াছিল,—আপনার সব ঢালিয়া, আপনার মন প্রাণ সমস্তই অর্পণ করিয়া জগতের হিতসাধন করিতে। প্রাচ্য চাহিয়াছিল,—আপনার সর্ব্বস্ব জগৎকে দান করিতে, আর প্রতীচ্য চাহিতেছে,—জগতের সর্ব্বস্ব আপনি লইতে। তফাৎ এইটুকুই। চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবিয়া দেখিবেন,—প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ কোন্ ভাবে? তাই দেখিতেছি,—পাশ্চাত্য সভ্যতার (?) এই ভাবে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া আজ সে দেশের যথার্থ চিন্তাশীল মনীষিগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

ভোগে সুখ নাই, শান্তি নাই, ত্যাগেই যথার্থ সুখ শান্তি লাভ হয়; প্রাচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলী একদিন যে কথা বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণ প্রথম অবস্থায় ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত

থাকিতেন বটে, কিন্তু বহুদিন এইভাবে কাটিয়া গেলে অবশেষে তাঁহারাও বুঝিয়াছিলেন, এই সকলে সুখ নাই। ভোগের পর তৃপ্তি হয় না, সুতরাং তাহাতে আনন্দ নাই। প্রকৃত আনন্দ,—ত্যাগে। ত্যাগেই শান্তিলাভ হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা নরশোণিতে ধরাবক্ষ রঞ্জিত করিয়া শত্রুশির লুণ্ঠিত করিলেও নিষ্কৃতি নাই, তাহাতেও ভয় দূর হইবার সম্ভাবনা কোথায়? "বৈরাগ্যমেবাভয়ং" এইরূপ ভাবসমূহ ক্রমশঃ তাঁহাদের হৃদগত হইতে লাগিল। আর্যসভ্যতার ধারাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিতে লাগিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, জগৎ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই উন্নতির স্বরূপই হইল,—সভ্যতার বিকাশ। জগতে যতই সভ্যতার অধিকতর বিকাশ হইতে থাকিবে, জগতের উন্নতির স্বরূপও ততই ক্রমশঃ অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সে উন্নতি তবে কিরূপ? বর্তমানে পাশ্চাত্য জাতি যেরূপ উন্নতির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই উন্নতিই কি জগতের যথার্থ উন্নতি? অথবা এইরূপ উন্নতিতেই কি জগৎ তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিবে? কখনই নহে। কেবল জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতেই জগতের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র স্বার্থপরতা সংসাধন এবং ভোগবিলাস চরিতার্থ করণোদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা কখনও সভ্যতা-পদবাচ্য হইতে পারে না। এই চেষ্টা ব্যক্তিগত হউক অথবা জাতিগত হউক, উভয়তঃই সমান অকল্যাণকর। জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত এই যে নিত্য নূতন নরহত্যার কলকৌশল আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহাই কি সভ্যতার পরিচয় নয়? না, কখনই তাহা নহে। প্রাচীন ভারতীয় জাতি ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছিলেন এবং যথার্থ পথেরও সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন। যাঁহারা জগতের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসবান্‌, সেই সকল

পাশ্চাত্য বুধগণ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধবিগ্রহাদি যখন জগৎ হইতে একবারে উঠিয়া যাইবে, তখনই জগতের যে শান্তিময় অবস্থা ঘটিবে, সেই অবস্থাই সভ্যতার চরম অবস্থা। সেই সভ্যতার চরম অবস্থা যখন উপস্থিত হইবে, তখন মারামারি কাটাকাটি আর জগতে থাকিবে না। সবই মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবে। এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীরও ধারণা।

কিন্তু ধারণা হইলে কি হইবে? শুধু মুখের কথায় ত ইহা হয় না! ইহা করিতে হইলে চিত্তকে অনেকখানি সাধনার পথে লইয়া যাইতে হয়। প্রাণভরিয়া একান্তভাবে প্রেমভক্তির সাধন করিতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের আজ সে ভাব কোথায়? কাজেই বলিতে হয় জাগতিক সভ্যতার সাধনাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যজাতি এখনও মাত্র অজ্ঞান শিশু। এই জগতের বিশাল ক্ষেত্রে এখন কেবল উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে মাত্র। সুস্থির ভাবে বসিবার উপযোগী স্থান এখনও নির্ণয় করিতে পারে নাই। অনেক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া, বহু বিপ্লবের ভিতর দিয়া আসিয়া, অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া যখন জ্ঞানলাভ করিবে, তখন সে জগতে আপনার স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। এখনও বিলম্ব আছে। পাশ্চাত্যের নিজের ধারণা লইয়াই বলিতেছি যে, সভ্যতার চরম অবস্থায় উন্নীত হইতে এখনও উহার বহু বিলম্ব আছে।

তবে এ কথাও এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, প্রতীচ্য আজ যে ভাবের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে,—সভ্যতা মনে করিয়া যে পথে চলিয়াছে; —সে সাধনা মানবের শুভকারী নহে এবং সে পথ জগতের কল্যাণের পথও নহে। দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিবার দিন পর্য্যন্ত যদি সে টিকিয়া থাকিতে পারে, তবেই জ্ঞানলাভ করিয়া যথার্থ সভ্যতার

গৌরব লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিবে। নতুবা তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবার জন্য যে ভাবের পথ আজ সে প্রস্তুত করিতেছে তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, সেই জ্ঞানলাভ করিবার কাল উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সে টিকিবে ত? যদি কোনও দৈব ঘটনায় অকস্মাৎ তাহার এই মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানলাভের বলবতী স্পৃহা জাগিয়া উঠে, তবেই তাহার মঙ্গল। প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া তখন সে যথার্থ সভ্যতারও অধিকারী হইতে পারিবে। জ্ঞানের পূর্ণতাই যদি সভ্যতার চরম অবস্থা হয়, তবে সভ্যতার সাধনাক্ষেত্রে শিশু পাশ্চাত্যের এখন সে জ্ঞান কোথায়? জ্ঞানের পরিপূর্ণ অবস্থাই যে হইল,—ত্যাগের অবস্থা! তাহা ত ভোগের নয়!

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) ইহাই যদি সত্য হয়,—অন্ততঃ পাশ্চাত্য এ কথা খুবই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাহা একান্ত ভাবে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাঁহারা অপরকে ধ্বংস করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তারে সর্ব্বদা যত্নশীল হইতেছেন। কিন্তু এই ধ্বংসবাদই কি যোগ্যতমের পরিচয়? ধ্বংসের পরিণাম ধ্বংস। অপরকে ধ্বংস করিতে গেলে নিজেকেও একদিন অপরের হস্তে ধ্বংস হইতে হইবে। পরন্তু সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিলে সকলেই আপনার হইবে। এ শিক্ষা ত পাশ্চাত্য এখনও পায় নাই! এবং জগতে এ ভাবের মন্ত্রও কই প্রচার করিতে পারে নাই। তাই প্রাচ্যের বর্ত্তমান মহাকবি পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভাবধারা লক্ষ্য করিয়াই গাহিয়াছেন,—

"জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে আলোক নাই আজি প্রভাতের চোখে।"

সত্যই ত ; ভারত ভূমি যুগে যুগে যে আলোকে জাগিয়াছে ;—পাশ্চাত্য সে আলোর সন্ধান পায় নাই। যাউক সে কথা।

ধনগর্ব্বিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আজ প্রকৃত সভ্যতার পথে দাঁড়াইতে না পারিলেও এই ভারতবর্ষ কিন্তু একদিন সভ্যতার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে অবশ্য একবারেই তাহা সম্ভব হয় নাই। এই অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য ভারতকেও কতকাল সাধনা করিতে হইয়াছে। কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া কঠোর ঐকান্তিক সাধনার বলে তবে ভারতভূমি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

হত্যা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আসুরিক ভাবসমূহ যদি জগতে সভ্যতার পরিপন্থী হয়, পক্ষান্তরে ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি দৈবী ভাবনিচয় যদি সভ্যতায় অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ; তবে একথা মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারা যায় যে, বহু অতীত যুগ হইতেই ভারতভূমিতে সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় সভ্যতার যে ধারাটী ক্রমাগত নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে ধীরচিত্তে সেটীর পানে লক্ষ্য করিলে আমরা ইহার কয়েকটী স্তর দেখিতে পাই এবং সেই স্তরগুলির মধ্যে সভ্যতার একটী ক্রমবিকাশও বেশ বুঝিতে পারি। বৈদিক যুগের কর্ম্মকাণ্ড, দার্শনিক যুগের জ্ঞান-কাণ্ড এবং তৎপরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগ অথবা পৌরাণিক যুগের যে সময়কার অবস্থাতেই আমরা লক্ষ্য করি, তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, এই ভারতবাসীর যে কোনও যুগের যে কোনও সাধনপদ্ধতি অথবা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলেই রহিয়াছে, ঐ প্রেমভক্তি অথবা মৈত্রী-করুণার একটী গোপন উৎস। সেই উৎস হইতেই একদিন অমৃতমধুর স্রোতধারা বিনির্গত হইয়া প্রবল বন্যার প্লাবনে সমগ্র ভারতভূমি ভাসাইয়া দিয়াছে। সভ্যতার চরম অবস্থা ভারত সেইদিন জগৎকে দেখাইয়াছে।

আর একটি কথা এস্থানে বলিয়া রাখি। ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা লইয়া জগতের অন্য যে কোনও অংশ হইতে তাহার একটা স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। সে বৈশিষ্ট্য,—ভারতে ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া আবির্ভাব। এটী আর জগতের কোনও দেশে কোনও কালে সম্ভব হয় নাই। ভারতই শ্রীভগবানের একমাত্র প্রিয় লীলাভূমি। ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কখনই সভ্যতার অনুকূল অবস্থা নহে। এই জন্য ভারতে এ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবান তখনই অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া ইহার প্রতীকার সাধন করিয়াছেন। যুগে যুগেই ইহা ঘটিয়া আসিয়াছে।

দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে যখন কুরুক্ষেত্রসমর সংঘটিত হইয়াছিল, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তখন ভারতে উন্নতির চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রীয় ভাবে ভারতের তেমন উন্নতি আর কোনও কালে হয় নাই। কিন্তু জাগতিক নিয়মে উন্নতির পর পতনও অনিবার্য্য। ভারতেরও তাহাই অবশ্য হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হইতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অধঃপতন যে হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াও বলিতেছি যে,—ভারতবর্ষে না হইয়া এটী যদি জগতের আর কোনও দেশে হইত, তবে এই পতনের পর তাহার আর উত্থান সম্ভবপর হইত না। এই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইত। কিন্তু ভারতবর্ষ সে হেন রাষ্ট্রীয় মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াও আবার অন্য দিক দিয়া বাঁচিয়া উঠিল কেন? তার কারণ সে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র পাইয়াছে এবং তাহার প্রয়োগবিধিও শিখিয়াছে। জগতের আর কোনও দেশ ত তাহা পায় নাই! পায় নাই বলিয়াই যে জাতি যখন রাষ্ট্রীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই তখন জগতে একবার দিন কতকের জন্য খুব বাহাদুরী করিয়া লইয়াছে। তার পর রাষ্ট্রীয়

অধঃপতনে যেমন মরিয়াছে, বাঁচে নাই! জগতের সকল দেশই তাই!

রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষ সেদিন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রতীচ্য ভূখণ্ডের মতই সেদিন পরস্পর মারামারি করিয়া মরিতে চাহিয়াছিল। তাই ভারতের ভাগ্যগুণে শ্রীভগবানের আবির্ভাবও অতি প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগ যুগান্তব্যাপী সভ্যতা ও সাধনার মূলীভূত যে ভাবধারা ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে সংগোপনে চিরদিন রহিয়া যাইত, এই রাষ্ট্রীয় উন্নতিলাভ করিয়া এখন ভারতবাসীর অন্তরটা অতি কঠোর যেন মরুময় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বিশুষ্ক মরুভূমি সম হৃদয়ে তাহার সাধনার চিরন্তন ভাবধারাটীও বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ভারতের যে যেখানে ছিল, ছোট বড়, সবল দুর্ব্বল সবাই আসিয়া সেদিন মরিবার ও মারিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইল; কেহ ধর্ম্মের মুখ চাহিল না, বিবেকের অনুশাসন মানিল না, উচ্চ নীচ বিচার করিল না;—অহমিকা ও দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ হইয়া অতি ক্ষুদ্র যে,—সেও আপনাকে মহৎ বলিয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ভারতের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে—সেই মরণোন্মুখ ভারতবাসীকে তাহার চিরন্তন সাধনার মহাসত্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ করিলেন কি? সবাই যখন গর্ব্বে আত্মহারা;—শৃগালও যখন সিংহ হইবার আশায় লালায়িত; তখন সেই মহতোমহীয়ান মহাপুরুষ করিলেন কি? তৃণাদপি সুনীচ হইয়া সামান্য সারথীর কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং সেদিন তিনি যে মহাবাণী প্রচার করিলেন, তাহাই জগতের পক্ষে একান্ত মঙ্গলময়। তাহার আর তুলনা নাই। ভারতে সেদিনকার সেই বীরত্ব ঐশ্বর্য্য সভ্যতার যথার্থ পরিচয় নহে;—প্রকৃত সভ্যতার পরিচয়,—শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত সেদিনের সেই

আর একটি কথা এস্থানে বলিয়া রাখি। ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা লইয়া জগতের অন্য যে কোনও অংশ হইতে তাহার একটা স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। সে বৈশিষ্ট্য,—ভারতে ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া আবির্ভাব। এটী আর জগতের কোনও দেশে কোনও কালে সম্ভব হয় নাই। ভারতই শ্রীভগবানের একমাত্র প্রিয় লীলাভূমি। ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কখনই সভ্যতার অনুকূল অবস্থা নহে। এই জন্য ভারতে এ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবান তখনই অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া ইহার প্রতীকার সাধন করিয়াছেন। যুগে যুগেই ইহা ঘটিয়া আসিয়াছে।

দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে যখন কুরুক্ষেত্রসমর সংঘটিত হইয়াছিল, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তখন ভারতে উন্নতির চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রীয় ভাবে ভারতের তেমন উন্নতি আর কোনও কালে হয় নাই। কিন্তু জাগতিক নিয়মে উন্নতির পর পতনও অনিবার্য্য। ভারতেরও তাহাই অবশ্য হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হইতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অধঃপতন যে হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াও বলিতেছি যে,—ভারতবর্ষে না হইয়া এটী যদি জগতের আর কোনও দেশে হইত, তবে এই পতনের পর তাহার আর উত্থান সম্ভবপর হইত না। এই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইত। কিন্তু ভারতবর্ষ সে হেন রাষ্ট্রীয় মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াও আবার অন্য দিক দিয়া বাঁচিয়া উঠিল কেন? তার কারণ সে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র পাইয়াছে এবং তাহার প্রয়োগবিধিও শিখিয়াছে। জগতের আর কোনও দেশ ত তাহা পায় নাই! পায় নাই বলিয়াই যে জাতি যখন রাষ্ট্রীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই তখন জগতে একবার দিন কতকের জন্য খুব বাহাদুরী করিয়া লইয়াছে। তার পর রাষ্ট্রীয়

অধঃপতনে যেমন মরিয়াছে, বাঁচে নাই! জগতের সকল দেশই তাই!

রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষ সেদিন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রতীচ্য ভূখণ্ডের মতই সেদিন পরস্পর মারামারি করিয়া মরিতে চাহিয়াছিল। তাই ভারতের ভাগ্যগুণে শ্রীভগবানের আবির্ভাবও অতি প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগ যুগান্তব্যাপী সভ্যতা ও সাধনার মূলীভূত যে ভাবধারা ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে সংগোপনে চিরদিন রহিয়া যাইত, এই রাষ্ট্রীয় উন্নতিলাভ করিয়া এখন ভারতবাসীর অন্তরটা অতি কঠোর যেন মরুময় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বিশুষ্ক মরুভূমি সম হৃদয়ে তাহার সাধনার চিরন্তন ভাবধারাটিও বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ভারতের যে যেখানে ছিল, ছোট বড়, সবল দুর্ব্বল সবাই আসিয়া সেদিন মরিবার ও মারিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইল; কেহ ধর্ম্মের মুখ চাহিল না, বিবেকের অনুশাসন মানিল না, উচ্চ নীচ বিচার করিল না;—অহমিকা ও দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ হইয়া অতি ক্ষুদ্র যে,—সেও আপনাকে মহৎ বলিয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ভারতের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে—সেই মরণোন্মুখ ভারতবাসীকে তাহার চিরন্তন সাধনার মহাসত্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ করিলেন কি? সবাই যখন গর্ব্বে আত্মহারা;—শৃগালও যখন সিংহ হইবার আশায় লালায়িত; তখন সেই মহত্তোমহীয়ান মহাপুরুষ করিলেন কি? তৃণাদপি সুনীচ হইয়া সামান্য সারথীর কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং সেদিন তিনি যে মহাবাণী প্রচার করিলেন, তাহাই জগতের পক্ষে একান্ত মঙ্গলময়। তাহার আর তুলনা নাই। ভারতে সেদিনকার সেই বীরত্ব ঐশ্বর্য্য সভ্যতার যথার্থ পরিচয় নহে;—প্রকৃত সভ্যতার পরিচয়,—শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত সেদিনের সেই

মহাবাণী। এ বাণী,—শুদ্ধ ভারত হইতে বিঘোষিত হইয়াছে। জাগতিক সভ্যতার চরম অবস্থার পরিচায়ক এই মহাসত্য ভারতেরই নিজস্ব।

তারপর আরও বহুদিন কাটিয়া গেলে ভারতের এমনই আর এক ঘোর দুর্দ্দিনে শ্রীভগবান আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণাবতারে যে মহা সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার বাকী অংশটুকু এদিন আবার শ্রীচৈতন্যাবতারে প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। সেদিন যে সত্য তিনি উপদেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং মাত্র উপদেশে প্রচার করিয়াই বুঝি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই;—সেই সত্য আপন জীবনাদর্শে জগৎবাসীকে এদিন আরও ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেদিন ছিল,—উপদেশ; এ দিন হইল, দৃষ্টান্ত, সেদিন যাহা বাণীতে ছিল; এ দিনে তাহা একবারে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল।

পুণ্যভূমি ভারতের গৌরবময় বহুযুগব্যাপী সাধনার মূলে যে ভাবের উৎসটী গোপনে গোপনে উৎসারিত হইত,—দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে উত্তাল তরঙ্গময় তটিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুণ্য-শীতল-সলিলে অবগাহন করিয়া শরীর মন জুড়াইতে অথবা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিলে সে প্রেম-নদীর কূলে যাইতে হইত। তাহা বড় সহজসাধ্য ছিল না। কাজেই সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবও হইত না। তাই কলিযুগে আবার তিনি শ্রীচৈতন্যাবতারে আবির্ভূত হইয়া প্রেম-ভক্তির বন্যা আনিয়া দিলেন। তরঙ্গিনীর তীর পর্য্যন্ত আর যাইতে হয় না। অত কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন নাই। প্রেম-ভক্তির প্লাবন আসিয়াছে। চারিদিক ডুবিতেছে। চারিদিক ভাসিতেছে। তুমিও ডুব দাও, তুমিও ভাসিয়া যাও। সবাই নাও, সবাই দাও। কাহারও লইতে বাধা নাই বিঘ্ন নাই। যত পার ডুব দাও যত ইচ্ছা পান কর,

ফুরাইবে না। খাও, ছড়াও, বিলাইয়া দাও। হরি! হরি! হরি! এমন ভাবের মন্ত্র আর জগতে কোন কালে কোনজন এমন ভাবে দিতে পারিয়াছে কি?

১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে মহামহিমময়ী বাণী বিঘোষিত হইয়াছে, তার চেয়ে মানব-কল্যাণকর মহাসত্য আর কিছুই জগতে প্রকাশ পাইতে পারে না। সে মহাবাণী—এই ভারতেরই বাণী। সে মহাসত্য—এই বাঙ্গালারই প্রাণ হইতে উদ্ভূত। আর কোনও সভ্য দেশ, কোনও সভ্যতাভিমানী জাতি এমন উদার মহাসত্য আজ পর্য্যন্ত প্রচার করিতে পারিয়াছে কি?

তাই বলিতেছিলাম, সভ্যতার পরিপূর্ণ অবস্থাতেই এই সত্য প্রকাশ পাইতে পারে। ভারতের যুগযুগান্তকালের সাধনার ভিতর দিয়া যে মহাসত্য চিরদিনই প্রকাশ হইতে চাহিয়াছে, বহুবার বহুপ্রকারে আভাসে যাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সেই মহাসত্য এতদিনে ভারতের ভাগ্যগুণে মূর্ত্ত হইয়া জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইল। ভারতে এই মহাসত্য প্রকাশ জাগতিক সভ্যতার চরম অবস্থা।

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

"শ্যাম-শ্যামা দর্শনে"

(রামপ্রসাদী সুর)

যেম্‌নি দাঁড়িয়ে আছিস্ শ্যামা,　　থাক্ গো শিবের বুকের পরে॥
কালা ভজ্‌তে চায় না যারা,　　দেখুক কালী ব'লে তোরে॥

হাতে দেখি শাণিত অসি
কোথা গেল সে মোহনবাঁশী
তু'য়েতে হয় মন তরাসী বল্ গো আমি দাঁড়াই ফিরে ॥
ত্রিনয়না হবি ব'লে
শিখিপুচ্ছ ধ'রে ছিলে
আবার মুক্তকেশী হবি ব'লে চাঁচর চুল ফেলেছিস্ দূরে ॥
যে মুখে সুধার রাশি
সেথা দেখি অট্টহাসি
আজকে দেখি লোলজিহ্বা যেন লেলিহান করে ॥
যেথা) বনফুল মালা দোলে
আজ) নরমুণ্ড মালা গলে
ওমা অশির অসুর নরে সংহারিছ তুই করে ॥
পীতাম্বর পরিহরি
আজ সেজেছ দিগম্বরী
পাষাণে পাষাণী বটে ব্যথা দিতে বাঘাম্বরে ॥
তোর সাধ পূরে'ছে কিম্বা আরো কিছু আছে বাকি
অধম "মণি"রে যেন অন্তিমে দিও না ফাঁকি
(আমি) শব হ'য়ে প'ড়ব শুয়ে চরণ দুটি হৃদে ধ'রে ॥

দীন---শ্রীমণিমোহন মল্লিক।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা

(ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত)

(৪)

পূর্ব্বে যে অবনতির কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় সমাজের আচার্য্যগণের দোষে। এবিষয়ে পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি পুনর্ব্বার বলিতেছি, সমাজের আচার্য্যগণ যদি নিজেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচরণ, বৈষ্ণব শাস্ত্র সকলের অনুশীলন ছাড়িয়া না দিতেন, এবং কেবল বংশ গৌরবে গৌরব বোধ করিয়া অন্য সকলকে হীন মনে না করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রসকল নিজ হস্তেই অব্যবহার্য্যরূপে অবরুদ্ধ না রাখিতেন, তাহা হইলে বোধহয় এরূপ হইত কি না সন্দেহ। নিজেরা আচার দ্বারা প্রচার না করায় সমাজ ক্রমে এই অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে এ কথা বোধহয় অস্বীকার করিবার কোন কারণই নাই। অবশ্য গুরুসম্প্রদায়, আচার্য্যসম্প্রদায় সকলেই যে বিদ্যা শূন্য তাহা নহে। কিন্তু শুধু বিদ্যা থাকিলে কি হইবে; অর্থলিপ্সা, লোকমুখাপেক্ষিতা এবং অতত্ত্বগ্রাহিতা দোষে দূষিত হইয়া তাঁহারা বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়িয়া গৌণ উদ্দেশ্যের পশ্চাতে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন। গোস্বামী শাস্ত্রের আলোচনা এক প্রকার বন্ধই হইয়া গেল। ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে থাকিলেন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা। তাহাতেও আপত্তি ছিল না কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি-সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়া কথকতা ক্রমে সংগীত রসের মধ্যে পরিগণিত হইল। গলাবাজিতে যাঁহার যত কৃতিত্ব তিনিই সমাজে তত আদর পাইতে লাগিলেন। অর্থবান ব্যক্তিগণ কখন কোনকালে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া একটী কথকতা দিলে তবেই সকলে

শুনিতে পাইত। সর্ব্বদা যে আলোচনা তাহা মোটেই রহিল না। এরূপ কালে ভদ্রে কচিৎ আলোচনা যে আলোচনাই নহে তাহা বোধহয় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না।

কালে ভদ্রে একদিন ভোজ বাড়ীতে দুধ ঘি খাইয়া যদি পুষ্ট হইতে পারা যায়, ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে এইরূপ পাঠে বা কথকতায় ফল হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? বলবান হইতে সাধ করিলে যেমন নিত্য নিয়মিত ঘি খাইতে হয়, পুষ্ট হইতে বাসনা থাকিলে যেমন নিত্য দুগ্ধ পান আবশ্যক, সেইরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভের ইচ্ছা থাকিলে নিত্য নিয়মিত ভাবে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয় ও তাহার সাধন করিতে হয়। ভক্তি লাভ এত সহজ নয় যে, একবার কোন রকমে একটু শুনিয়াই হইবে। ভক্তি লাভ অতি দুর্ল্লভ। ইহা এত সহজসাধ্য হইলে গোস্বামীগণ চতুঃষষ্টী প্রকার ভক্তি অঙ্গ যাজনের ব্যবস্থা দিতেন না। প্রণয়াশক্ত যেমন প্রেমাস্পদকে তিলমাত্রও বিস্মৃত হইতে পারে না, আহারে বিহারে, শয়নে, গমনে, সর্ব্বদাই যেমন তাহারই কথা লইয়া থাকে, ভক্তও সেই প্রকার ভগবানের কথা লইয়া কাল কাটায়, এক তিলার্দ্ধ সময়ের জন্যও ভুলিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই ভক্তি। এই ভক্তির চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনাঙ্গ আছে। ইহা সাধন করিয়া ক্রমে সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং এখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই ভক্তির আচার প্রচার কিরূপ গুরুত্বযুক্ত। যখনকার কথা আমি বলিতেছি তখনকার গুরুগণের যদি জীবোদ্ধার প্রবৃত্তি থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা কখনই ইহাকে একটী অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতেন না।

যাহা হউক, যে কোন রকমেই হউক এ সময় ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে কথকতার ভাবেই হউক বা অন্য যে কোন ভাবেই হউক বর্ত্তমান থাকিল একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা, তবে যে সকল

গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের সারতত্ত্ব সঙ্কলিত আছে, যাহাতে জীবের ভজন-তত্ত্ব নিরূপিত আছে, যাহাতে পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভৃত জীবে-দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত আছে সেই সকল সাধক-সুহৃদ গোস্বামী শাস্ত্রের অনুশীলন না থাকায় সাধনপথ এক প্রকার বিলুপ্তই হইয়া উঠিল। এমন কি বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তি বিলাস যাহা বৈষ্ণবমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় তাহাও সকলে ভাল করিয়া দেখিল না। অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থের নামও হয় ত অনেকে জানিতেন না।

গোস্বামি-গ্রন্থ ভিন্ন নানা প্রকার ভক্তিশাস্ত্র, যাহাতে, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী মহাত্মাগণ জীবেদয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়া ভাবী কালের জন্য বৈষ্ণবের ভজনক্রম সুখবোধ্যভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার কতকগুলি ভাষাগ্রন্থ, কতকগুলি সংস্কৃত, কিন্তু ক্ষুদ্রাবয়ব বলিয়া না জানি কোন্ অপরাধে সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ রত্ন সকল পশ্চাতে পড়িয়া পচিতে লাগিল। যাঁহাদের হাতে শাস্ত্র ছিল তাঁহারা শাস্ত্রালোচনাটা শুধু অর্থাগমের একটী সুগম পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং সাধারণের সঙ্গে এমনভাবে উহার আদান প্রদান চালাইতে লাগিলেন যে, সাধারণে বুঝিল অনেক অর্থ খরচ না করিতে পারিলে ঐ সকলগ্রন্থ কাহাকেও শুনিতে বা শুনাইতে নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাঁরা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, যে সকল মহাত্মাগণ ঐ সকল গ্রন্থাদি প্রণয়নে জীবনপাত করিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ব্যক্তিবিশেষের ভাবী ব্যবসার সাহায্যার্থ করেন নাই। আর ব্যবসার মোহে পড়িয়া এটুকু ভাবিবারও অবসর সব পণ্ডিতগণ পাইলেন না যে, জীবেদয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শাস্ত্রকারগণ কি মহান্ নিঃস্বার্থ ব্যবহার করিয়াছেন, আর আমরা কি করিতেছি।

এইভাবে অর্থাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের

অনুসন্ধান করিতেও পারিলেন না। সুতরাং ভাগবত মাত্রই নানারূপে তাহাদের নিকট অর্থাগম সুলভ বলিয়া চলিতে লাগিল, আর সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ লুপ্ত হইতে বসিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিসিদ্ধান্তাদি নাই তাহা যেন কেহ মনে না করেন। অধিকন্তু দেখিতে গেলে শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির প্রকৃষ্টতা যতদূর নিরূপিত হইয়াছে অন্য কোন শাস্ত্রই তাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়; তথাপি যখন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু গোস্বামীগণের প্রতি নিজ শক্তি প্রদান করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছেন তখন অবশ্যই যে তাহার কোনও বিশেষ কারণ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এটা ঠিক যে, অকারণ কখনই গোস্বামী শাস্ত্রাবলি প্রণয়ন হয় নাই।

বৈষ্ণবের কেবল ভক্তির সিদ্ধান্তসকল অবগত হইলেই কার্য্য হইল মনে করা উচিত নয়। ভক্তির সিদ্ধান্ত সকল অবগতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সাধনও আবশ্যক। সেই আবশ্যকীয় সাধনক্রম প্রদর্শনই গোস্বামীশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তারপর গোস্বামী শাস্ত্রে যে কেবল সাধ্য সাধন তত্ত্ব ও সাধনক্রম মাত্রই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই নহে। রাগমার্গীয় ভক্তির সাধন অবগত হইতে হইলে গোস্বামী গ্রন্থ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যে গোস্বামী শাস্ত্রের এত মহিমা সেই গোস্বামী শাস্ত্রের সংগোপনেই যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধঃপতন হইয়াছে বোধহয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যক হইবে না। তবে একটা কথা—এই দোষের জন্য কাহাকে দোষী করা যায়। আমি খুব সাবধানে, অতি সন্তর্পণে সম্প্রদায়ের এই দোষের বোঝা সম্প্রদায়ের প্রচারক প্রভুগণের উপরই প্রথম চাপাইতেছি। কেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ অভ্যাগত বৈষ্ণবগণকেও একেবারে দোষশূন্য বলিতে পারিলাম না। কেন না গোস্বামীগণ যেমন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অভ্যাগতগণও

সেইরূপ বৈষ্ণব-সমাজের আদর্শ। আদর্শে দোষ পড়িলে তাহা যেমন শীঘ্রই বহু ব্যাপক হইয়া পড়ে এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

প্রধানতঃ অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহাতে আবার গুরুবংশ নিষ্প্রভ হওয়ায় তাঁহারা অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া পড়িলেন, পক্ষান্তরে এই স্থান হইতে ইহাদের দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিতবিদ্বেষিতার বীজ রোপিত হইল। ইহারা জাতি, বিদ্যা ও মহত্বকে ভক্তিকন্টক বলিয়া বড়াই করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় এ সকলের বড়াই থাকিলে তাহাদের বড়াই থাকে না। বেসেরগুণে আর দেশেরগুণে ইহাদের কথা লোকে সমীচিন বলিয়া গ্রহণ করিল। শিক্ষাশূন্য প্রতিষ্ঠাপ্রিয় গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ইহাদের দেখাদেখি ঐ ধুয়া ধরিয়া গুণাপেক্ষা বেসের ও অন্তঃ-শৌচাপেক্ষা বাহ্যশৌচের আদর অধিক দেখাইতে লাগিল। রাগপথের মানসী সেবা, মানসী ভজন ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাহ্যিক মৌখিক ভজনের পক্ষপাতী হইলেন। রাগমার্গের ভজন গিয়া কেবল বাহ্যিক তিলক ছাপা কণ্ঠিধারণ শিখারক্ষণ প্রভৃতির সহিত মালার ঝুলি হস্তে ভ্রমণ ও দশজন এক সঙ্গে বসিয়া জপমালা হস্তে নানাবিধ খোস গল্প কচিৎ কীর্ত্তনগানের বা কথকতার আসরে বসিয়া দুই চারিটি সঞ্চারী ভাবের আভাসমাত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তন ক্ষেত্রে দম্ভময় উল্লম্ফন আর সময় সময় চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রসাদ সেবন আর অহঙ্কারপূর্ণ বাহ্য শৌচ, বৈষ্ণবে অস্থায়ী প্রীতি তদিতরে স্থায়ী বিদ্বেষ এইমাত্র বৈষ্ণবাচার বলিয়া অবশিষ্ট রহিল। এইরূপ নানাভাবে বাহ্যিক আচার মাত্র বৈষ্ণবতা বলিয়া সমাজে রহিল। ইহা দ্বারা পক্ষান্তরে যে মুখ্য মুখ্য ভজনাঙ্গ, বিশুদ্ধ রাগের অনুগত ভজনপথ বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা আর কেহ তত আমলেই আনিল না। রাগানুগা ভজন পথই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য। প্রগাঢ় অনুরাগে ইষ্ট সেবন ও অনুরাগ নয়নে ইষ্ট মূর্ত্তি স্ফুরণ ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃষ্টতা, এই মহৎগুণের নিকটই

একদিন ভারতের অন্যান্য ধর্ম্ম-সমাজ হেট মুণ্ড হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের দারুণ দুর্দ্দৈব দর্শন করিয়া তাহার শান্তির জন্য এই ভজন-পথ মহৌষধ স্বরূপ দান করিয়া বৈধী শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুপান-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যেই হউক আর যে কোন কারণেই হউক বিকৃত বৈষ্ণব সমাজ মহৌষধ হারাইয়া কেবলমাত্র অনুপানের মধুটুকু লেহন করিতে লাগিলেন। ফলে রোগ শান্তিত হইলই না অধিকন্তু রোগের বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ উপসর্গের উৎপত্তি হইয়া অধঃপতনের পথ অধিকতর প্রসস্ত হইতে চলিল। সুতরাং এই অধঃপতনের মূলে আচার্য্য গোস্বামীসন্তান, অভ্যাগত, গৃহস্থ বৈষ্ণব ইহাঁরা সকলেই অল্প বিস্তর দোষী। আমার ন্যায় অযোগ্যের যদিও এত বড় একটা কথা বলার অধিকার নাই অথাপি আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশাকরি সকলেই আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন। মনে রাখিবেন আমি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এ সকলকথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকে বলিবেন, এইটাই আমার বিনীত নিবেদন।

ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন লিখিত)

প্রশ্ন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই দ্বাত্রিংশদক্ষর নাম মন্ত্র যোগে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে অষ্ট প্রহরাদি হইতে পারে কি না?

উত্তর।—"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে।"

"তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি কীর্ত্তনম্।
কলৌযুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥"
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিলাস (১৯৪।১৯৫)

"বাতোঽপাতো হরের্নাম উগ্রাণামপি দুঃসহ
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ।" ঐ ১৯৭
"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ং।"
"পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে।" ঐ ২০৯
"সত্তদ্ধোমুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানু কীর্ত্তনাৎ।"
"এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরং তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্ত কীর্ত্তনম্ ॥"
"অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥"
"যেন জন্ম শতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেব সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥"

টীকা—ইত্থং নামকীর্ত্তনস্য পরম সাধনত্বং সাধ্যত্বঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং স্বতঃ পরমপুরুষার্থ রূপাণাং শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি ভক্তি প্রকারাণামপি মধ্যে শ্রীমন্নাম কীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখন্ তত্রাদৌ তেষেব পরমশ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীমুক্তা-ফলাদিগ্রন্থকারাণাং সম্মতাৎ স্মরণাদপিশ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি অঘেতি বিষ্ণোঃ স্মরণং অঘং সংসার দুঃখং তন্মূলং পাপং বা ছিনত্তীতি অঘচ্ছিন্তবত্যেব। কিন্তু বহুলায়াসেনৈব তৎসাধ্যতে মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ কীর্ত্তনন্তু ওষ্ঠস্পন্দন মাত্রেণাঘচ্ছিৎ অতস্ততস্তস্মাৎ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠঃ।...স্মরণাদীনামপি পূজাঙ্গত্বাৎ পূজায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্য তস্যাপি সকাশান্নাম সঙ্কীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি যেনেতি "কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ।" টীকা—হরেভগবতঃ হরীত্যক্ষরদ্বয়স্য বা কীর্ত্তনমাত্রেণ তৎ সর্ব্বং কলৌ ভবতীতি।"

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের কারিকা ও টীকার তাৎপর্য্য শ্রীহরি কীর্ত্তনকেই জগতের লোকের, বিশেষতঃ কলিকালে উত্তম তপস্যা বলা হইয়াছে এবং উহা সমাচরণীয়। সূর্য্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করে তদ্রূপ হরিনাম সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকে। ইত্যাদি।

পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী টীকায় উহা আরও পরিষ্কার লিখিলেন— নাম কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ সাধন এবং শ্রেষ্ঠসাধ্য। স্বতঃ পরম পুরুষার্থরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি বিবিধ প্রকার সাধন ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপনার্থ শ্রীমুক্তা ফল গ্রন্থকারাদির সম্মত স্মরণ হইতেকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতর লিখিত হইয়াছে—"অঘচ্ছিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু স্মরণ সংসা দুঃখ ও তাহার মূলভূত সকল পাপকে ধ্বংস করেন এই জন্য উহার নাম "অঘচ্ছিৎ" হইয়াছে। কিন্তু কলিযুগে সতত কলুষমগ্ন জীবের ভগবৎ স্মরণ বহু আয়াসে হইয়া থাকে, যেহেতু বহু ব্যবসায় লইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত মনকে স্থির করিতে সহজে পারা যায় না। শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন-জনিত ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এজন্য স্মরণ হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। উহার অপর বিশেষ কারণ অন্তরিন্দ্রিয় মন, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, এবং বাগিন্দ্রিয় মুখের যুগপৎ কার্য্য হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখ বিশেষের সম্পাদন করিয়া থাকে। অথবা পক্ষান্তরে যদি স্মরণাদিকে পূজাঙ্গ মধ্যে ধরিয়া পূজারই শ্রেষ্ঠতা বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশে "হরি" এই অক্ষরদ্বয়ের কীর্ত্তন মাত্রেই সকল যুগের সকল সাধনের দ্বারা অপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠ-সাধ্য ভগবৎকৃপা লাভে জীব সক্ষম হইয়া থাকে।"

ইহা হইতে শ্রবণাদি হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা বিশেষ প্রতিপাদিত হই এবং হরিনাম কীর্ত্তনও পাওয়া গেল। কিন্তু হরিনামের কীর্ত্তন

বিধি পাইলেও সাক্ষাৎ "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রের কীর্ত্তন সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল না বলিয়া যদি ভ্রম হয় তন্নিবারণার্থ এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত লঘু ভাগবতামৃতের প্রারম্ভে প্রভুর বন্দনা শ্লোকে এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। যথা—

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥"

টীকা যথা—অত্র কলৌ প্রকটিতাতি প্রভাবত্বাৎ স্বপ্রভুনা সংপ্রচারিতত্বাৎ পরম পুমর্থদত্বাৎ তদ্রূপত্বাচ্চ কৃষ্ণ নাম্নাং বিজয়ং মঙ্গলমাঽপ্রীতি হরেকৃষ্ণেতি ইতি শব্দ আদ্যর্থঃ" ইতি হেতুপ্রকরণ প্রকাশাদি সমাপ্তিষু ইত্যমরোক্তেঃ তেন দ্বাত্রিংশদক্ষরো নাম মন্ত্রো বোধ্যতে। তদাহ্বয়াঃ কৃষ্ণনামানি" হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা………।"

এখানে "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর বদন নিঃসৃত হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম জগজ্জনকে প্রেমমগ্ন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছে।" পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এখানে ইতি শব্দ আদ্যর্থে স্বীকার করিয়া দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রের আদিতে হরেকৃষ্ণ আছে, সেই সম্পূর্ণ নাম মন্ত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতএব উক্ত নাম মন্ত্র জপাদি হইতে উচ্চ কীর্ত্তনের বিশেষ বিধিই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নাম মন্ত্রে অষ্টপ্রহরাদি উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন অবাধে হইতে পারে। অলমিতি।

প্রতিধ্বনি

আমাদের সকল কর্ত্তব্যের প্রধান কর্ত্তব্য শরীর রক্ষা। কিন্তু আমাদের অনেকেরই এই দিকে তেমন দৃষ্টি নাই। ফলে আমরা দিন দিন হীনবীর্য্য, ক্ষীণদেহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছি। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম,উপযুক্ত খাদ্য,যথা—দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকরদ্রব্য শরীর রক্ষার পরিপোষক। তাই বোধ হয়, সেই যুগে চার্ব্বাক কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, এই সমস্ত দ্রব্য ক্রমেই আমাদের দেশে শুধু দুর্মূল্য নহে—দুষ্প্রাপ্যও হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে গোধনের সংখ্যা হ্রাসই যে ইহার প্রধান কারণ, সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই। ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশে গাভীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৯৪লক্ষ কিন্তু পাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই অর্থাৎ ১৯২০।২১ খ্রীষ্টাব্দে সেস্থানে গাভীর সংখ্যা ৪ কোটী ৮৯ লক্ষ। পাঁচ বৎসরে পাঁচ লক্ষ গাভীর সংখ্যা হ্রাস হওয়া শুধু অস্বাভাবিক নহে—ভয়াবহ। আমাদিগকে ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতি বৎসর বৃটিশ শাসিত ভারতে গো-খাদকের রসনা তৃপ্তির জন্য এক কোটী গরু নিহত হয়। বিলাতে শুষ্ক গো-মাংস চালান দেওয়ার জন্য প্রতি বৎসর গড়ে দশ লক্ষ গরুর প্রাণ নাশ হয় এতদ্ব্যতীত শুধু চামড়ার জন্যও নির্ম্মম ভাবে নানাস্থানে নানাভাবে বহু গোহত্যা করা হয়। রোগে যদি গো মহিষাদি মারা যায়, বাজারে সেই মৃত গো-মহিষাদির চামড়ার তেমন চাহিদা নাই, তাই এই জন্যও গো-হত্যার ব্যবস্থা আছে। এই কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে যে জবাই

খানা আছে, তাহাতেই তো প্রতি বৎসর এক লক্ষ গরু জবাই করা হয়। সুতরাং অবস্থা যে কি ভীষণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা তো সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? শৌর্য্য, বীর্য্য ও মেধা অর্জ্জন করিয়া আমরা যদি জাতি হিসাবে দশ জনের একজন হইতে চাহি, তাহা হইলে অন্যান্য সমস্যার সহিত আমাদিগকে এই সমস্যারও সমাধান করিতে হইবে, নতুবা আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। (বসুমতী)

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

গত অগ্রহায়ণ মাসের ৫ই শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন এ সংবাদ ভক্তির পাঠকগণ অবগত আছেন। সেখানকার শ্রীনামযজ্ঞের শুভানুষ্ঠান ও অন্যান্য বিবরণ যথা স্থানে দেখিবেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, চাকালেশ্বরের শ্রীল সনাতন দাস বাবাজী ও কুসুম সরোবরের পণ্ডিত শ্রীল উদ্ধারণ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীধামের প্রাচীন কীর্ত্তি অনেকগুলিই সংস্কার অভাবে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এ সময় কাহারও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা কায়-ক্লেশে কিছু করিতে পারেন না শ্রীভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের অর্থের অভাব নাই কেহ অগ্রণী হইয়া কার্য্য করিলে অনেকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এই শ্রেণীর ভক্তগণের এ মহা সুযোগ ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নয়। এই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার জন্য

পূজনীয় বাবাজী মহাশয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত। ইঁহার অনুগত ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অর্থশালী তাঁহারা এই সময় অর্থের সৎ-ব্যবহার করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি বজায় রাখুন পক্ষান্তরে বাবাজী মহাশয়কেও যাহাতে এ বিষয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে না হয় তাহারও ব্যবস্থা হউক। মোট কথা শ্রীশ্রীরাধারমণের ইচ্ছাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া বাবাজী মহাশয় আজ যে কার্য্যের সঙ্কল্প লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন আমাদের সকলেরই উচিত সে সঙ্কল্প সিদ্ধির যতটুকু আনুকূল্য আমাদের করিবার সামর্থ আছে ততটুকু করা। বলা বাহুল্য শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার কল্পে যিনি যাহা সাহায্য করিবেন এই ভক্তি-পত্রিকায় তাঁহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীপুলিনচন্দ্র দে

২১নং ডাক্তার লেন, তালতলা, কলিকাতা।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ৺পুরীধামের শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজের মহান্ত শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী দাদা মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ যখন তাঁহার নিজ জনকে অভয় দিয়াছেন তখন আমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই। আমরা খুবই আশা করি আগামী মহোৎসবের সময় গোবিন্দ দাদা ভক্তগণকে লইয়া খুবই আনন্দ করিতে পারিবেন। জয় জয় শ্রীশ্রীরাধারমণ।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় সম্প্রদায় সহ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে এলাহাবাদ, কাশী ও গয়ায় কীর্ত্তন করিয়া আসিবেন কথা

ছিল কিন্তু শ্রীধামের বহু ভক্তের অনুরোধে সেখানেই কয়েক দিন বিলম্ব হওয়ায় এবং ২১এ অগ্রহায়ণ শ্রীখণ্ডের উৎসবে যোগদান করিতে হইবে বলিয়া মথুরা হইতে আর কোথাও না যাইয়া একেবারে শ্রীখণ্ডে আসিয়াছিলেন।

৫ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ৬ই শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌছিয়া ঐ দিনই শ্রীশ্রীনাম যজ্ঞের শুভাধিবাস করিয়া ছিলেন। ৭ই প্রাতঃকাল হইতে শ্রীশ্রীনাম আরম্ভ হয়, ১১ই পর্য্যন্ত নামযজ্ঞ চলিয়াছিল। এই নামযজ্ঞের মধ্যেও ৭ই ও ৮ই শ্রীশ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন হয়। ১০ই শ্রীনামযজ্ঞের ক্ষেত্রে কীর্ত্তন করেন। ১১ই শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে পৌছান তিথি পড়ে। ঐ দিন শ্রীচরিতামৃত হইতে উক্ত লীলাটী নগরকীর্ত্তন হয়। তৎপরে ১২ই প্রাতে নগর কীর্ত্তন এবং ১৩ই নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহোদয়ের সমাধি প্রতিষ্ঠা হয় ও কীর্ত্তন হয়। ১০ই শ্রীল বিনোদবিহারী গোস্বামীর বাড়ীতে নগর কীর্ত্তন হয়। ১৫ই শ্রীল মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের টোরে এবং ১৬ই রাত্রে শ্রীবঙ্ক বিহারীর মন্দিরের নিকটস্থ জয়লাল হরগুলাল হাবিলিতে কীর্ত্তন হয় তৎপর দিন। অর্থাৎ ১৭ই বৈকালে মথুরায়গিয়া বিশ্রাম করেন ১৮ই সকালে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তীরে কীর্ত্তন করিয়া ১৯এ শ্রীখণ্ডাভিমুখে রওনা হয়েন।

২১এ শ্রীখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীএকাদশী বলিয়া হরিবাসর কীর্ত্তন হয়। ২২এ শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সূচক কীর্ত্তন করিয়া ২৩এ নগর কীর্ত্তন করেন। ২৪।২৫।২৬।২৭ পর্য্যন্ত অন্যান্য ভক্তগণের আগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কীর্ত্তন করিয়া ২৮এ তারিখে শ্রীপাঠ যাজিগ্রামের মহান্ত শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব মহোৎসব শেষ করেন ২৯এ সকালে কাটোয়ায় কীর্ত্তন করেন। তৎপর ১লা পৌষ নবদ্বীপ হইয়া ২রা কলিকাতায় পৌছিয়াছেন।

গত ১লা পৌষ রবিবার শিবপুর ষষ্ঠীতলায় "মাতৃ-মণ্ডপে" কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাম্মিলনীর হাওড়া শাখার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহোদয়। শ্রীসম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন কাগজে বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল "ঐ বুঝি কেঁদে ফিরে যায়" নির্দ্দিষ্ট বক্তা ছিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ। নানা যুক্তি ও নানা প্রকার উপমা দিয়া সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বিষয়টী শ্রোতৃবর্গের নিকট অতি অপূর্ব্বভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা শেষে সভাপতি মহাশয় বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য সঙ্গীত করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় রজনীকান্ত সেনের "কেন বঞ্চিত হব চরণে" গানখানি গাহিয়া সকলের তৃপ্তি-সাধন করিয়া ছিলেন। এই শাখা-সম্মিলনীর নির্দ্দিষ্ট গৃহ আছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে এই ভাবের অধিবেশন দেখিতে পাইলে অত্যধিক আনন্দিত হইব।

BENG...
WRITERS' LIBRARY

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

মাঘ
১৩৩৫

"অদিনের পথে"

কেগো, অদিনের পথে কাণ্ডারী মোর ভগ্ন এ দেহ ভার
নগ্ন পরিয়া, ফিরে চাও আগে গর্জ্জিছে পারাবার
পড়ি, তপ্তবালুকা শয়নে
মরি, মর্ম্মের মহা দহনে
বন্ধু আমার কেহ নাই, যারা আছিল সকাল সাঁঝে
ফেলিয়া গিয়াছে অদিনের পথে তপ্তবালুকা মাঝে।

* * * *

সেদিনের সুখ নিত্য বুঝিয়া বাঁধিনু যে গৃহ খান
কোথায় সে গৃহ পরিজন মোর প্রাণের অধিক প্রাণ
এবে, অদূরে আঁধার ঘোর
আসে, নামিতে নয়নে মোর
আসে, স্তব্ধ তিমির আদি অনাদির সঙ্গী হ'তে আমার
ওগো, কাণ্ডারী কোথা কাণ্ডারী ঐ নামিছে ঘন আঁধার।

* * * *

রসনা নিরস ক্রমশঃ অবশ ডাকিতে না পাই শকতি
সুজনের ডাক ডাকি নাই আগে, ভাবি নাই হবে এ গতি
আমি, কুজনের ছিনু বাধ্য
তাহে, সুজন না হ'ল সাধ্য
আজ, তার ফলে কেহ আঁধার অতলে নাহি সামালিতে তাল
ডুবে যায় রবি সেদিনের ছবি এদিনের মহাকাল।

*   *   *   *

ক্রমে, শিথিল অঙ্গ শিহর শূন্য বাহুতে নাহিক বল
ভয়ে তনু কাঁপে মরমের তাপে বুদ্ধি হতবিকল
আর, নিবেদন নাহি সরে
বুঝি, নীরব করিল মোরে
তার হে এবার ভব পারাবার পদতরি করি দান
রক্ষ এ দীনে কে আছ হে কর অদিনের সমাধান।

*   *   *   *

তবে কি হে গুরু তুমি কাণ্ডারী, একি কর্ম্মের পাক
ত্রাহিমে দয়াল ত্রাহিমে বন্ধু, ফুরাইল মোর ডাক
এসে, মাভৈঃ অভয় দানে
যদি, প্রাণ দাও মরা প্রাণে
তবে, বিশ্বরূপের বিশ্বের পাপ ত্রিতাপের হয় শান্তি
নহে, যায় তার ইহ পরকাল গৃহ তনু মন ভাব কান্তি।

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত।)

(২১)

ভক্তগণ আনন্দে নাচিতে লাগিলেন নিতাই গৌরও ভুবনমোহন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পরে জগাই মাধাই উঠিয়া নাচিতে লাগিল। তখন প্রভু-দ্বয়, ভক্তগণের সহিত পিঁড়ায় বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। এখন লোচন দাসের গীত শ্রবণ করুন—

"ও জগাই মাধাই নাচে একি ঠাকুরালি।
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলি॥
"এ হেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর।
দোষ নাহি দেখে করে করুণা প্রচুর॥
জীবের উদ্ধার লাগি নাচয়ে উল্লাসে।
এ বড় ভরসা বান্ধে ত্রিলোচন দাসে॥"

বৃন্দাবন দাস বলেন—

"যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়।
সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥"

দুই ভাই প্রভুর আঙ্গিনায়, পরম আনন্দে নৃত্য করিতেছে। শচী মা ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, ইহাদিগকে পুর্ব্বে কত ভয় করিতেন, গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় ইহাদের নাম শুনিলে পুর্ব্বে ভয়ে কাঁপিতেন। আর আজ সেই জগাই মাধাইয়ের কি পরিবর্ত্তন। তাহারা তাঁহাদের আঙ্গিনায়, "হরিবোল" বলিয়া নাচিতেছে। দেবীদ্বয় গৃহের অভ্যন্তর হইতে তাহা দর্শন করিতেছেন। ক্রমে জগাই মাধাই স্থির হইল। পুর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া তাহারা আবার

কাঁদিতে লাগিল। ভক্তগণ অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিলেন।

দুই ভাই আর গৃহে গেলেন না। ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়া দুইলক্ষ হরিনাম জপ করেন আর অনুতাপে কাঁদেন। ইহাই তাঁহাদের এখন প্রতিদিনের কাজ।

"জগাই মাধাই এখন পরম ভাগবত। মুহূর্ত্তকাল তাঁহারা বৃথা অপব্যয় করেন না, দিবারাত্র কৃষ্ণনাম জপ করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান—সুরধুনী স্নান, তারপর হরিনাম করিতে বসেন। হরিদাস প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম লইতেন, ইঁহারা প্রথম হইতেই প্রত্যহ দুইলক্ষ হরিনাম লইতে লাগিলেন। দুইলক্ষ নাম গ্রহণ সোজা কথা নহে, দুইলক্ষ নাম লইতে এক দিবারাত্রের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া যায়। বিবেচনা করুন, প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টাকাল একস্থানে বসিয়া একচিত্তে নামগ্রহণ অল্প শক্তির কথা নহে। নামের প্রতি তীব্রতর অনুরাগ ও অটল বিশ্বাস না জন্মিলে এরূপ হইবার আশা নাই। নামের কোন সুমিষ্টরসে, কোন অজ্ঞাত শান্তিপ্রদ রসে আকৃষ্ট না হইলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধচিত্তে নিয়ত নাম গ্রহণে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। ইহা শাস্ত্রের নির্দ্ধারণ; যুক্তি ইহার সাপক্ষে, প্রত্যক্ষ উদাহরণ ইহার সজীব প্রমাণ। অতএব অল্পদিন মধ্যেই জগাই মাধাই পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন। চরিতামৃতে লিখিত আছে—"নামের ফল কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়।" জগাই মাধাইর চরিত্রে ইহার পরিচয় পাই। কৃষ্ণনাম শ্রবণেই এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণেই, তাঁহাদের নয়নে জল আসিত, এবং জগতের তাবৎ কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপ অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইতেন।"—(অচ্যুতবাবু)

এইরূপ দিনের পর দিন যাইতেছে কিন্তু দুইভায়ের হৃদয়ের তাপ

গেল না। পূর্ব্বকৃত পাপ তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ হইত, তখন তাঁহারা নিতাই গৌর দুইভায়ের নাম লইয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এইরূপ ইহাদের ব্যাকুল অবস্থায়, অনেক সময় তাঁহারা, আহার পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না, তখন দয়াল নিতাই, আবার কখন বা ভকতবৎসল শ্রীশচীনন্দন, তাঁহাদের নিকট বসিয়া, কত আশ্বাসবাণী বলিয়া তাহাদের যে আর পাপ নাই, তাহা শত শতবার বুঝাইয়া আহার করাইতেন। কিন্তু তথাচ তাহাদের হৃদয়ের তাপ একেবারে নিবৃত্ত হইল না।

মাধাই, প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিল—তাঁহার সে মনোকষ্টের আর অবধি নাই। দুই প্রভু তাহাকে কত সান্ত্বনা দেন, কিন্তু হায়!—"তথাপি মাধাইর চিত্তে না পায় প্রসাদ।"

একদিন মাধাই নিভৃতে নিতাইচাঁদকে একাকী পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার অভয় পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া এইরূপ স্তব করিলেন—

জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়।"
"ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোমার কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী শঙ্কর॥
তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥"
"তুমি যে জগৎপিতা মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য॥"

"তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার সর্ব্ব পাষণ্ডীর প্রাণ॥
তুমি সে করহ প্রভু বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণবধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা॥"
"পরম কোমল-সুখ বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে আমি করিনু প্রহার।
মুঞি হেন দারুণ পতকী নাহি আর॥"
"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া॥
যে অঙ্গ স্মরণে সর্ব্ব বন্ধ-বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে মোহের কারণ॥"
"যে অঙ্গ সেবিয়া শৌণকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন॥"
"যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবেদের নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ।
আরো মোর কুশল! লঙ্ঘিনু হেন অঙ্গ?"
"বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই॥"

চৈঃ ভাঃ

"মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন "প্রভু! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, তাহাতে আমার তত দুঃখ নাই, কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার পুত্র। অবোধ পুত্র এইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে কতজীবকে হিংসা করিয়াছি, তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে যে, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগি। কিন্তু আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়া কার কি অনিষ্ট করিয়াছি, তাহা জানি না। আমি যদি সেইসব লোকের দেখা পাই, আর তাহাদের চরণ ধরিতে পারি, তবেই বোধহয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে।

(অমিয় নিমাই চরিত।)

দয়াল নিতাই, মাধাইয়ের মনোভাব বুঝিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বেশ, তুমি যদি ঐরূপ না করিলে শান্তি না পাও, তাহা হইলে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া প্রত্যেক স্নানার্থীর নিকট তোমার অজানিত দোষের জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা চাহিয়া লও।"

"নিত্যানন্দের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র। উপবাস, অনিদ্রা ও ক্রন্দনে শরীর জীর্ণ। সেই নদীয়াররাজা আজ ঘাটের এককোণে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া নাম জপ করিতেছেন। যে কেহ ঘাটে আসিতেছেন, মাধাই উঠিয়া তাহার চরণে পতিত হইয়া কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "আপনি কৃপাকরিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, আমি জানিয়া বা না জানিয়া, যদি আপনাকে কোন দুঃখ দিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"মাধাই বিচার না করিয়া, বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, প্রতি জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার রাজার এইরূপ দশা দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন তাহা নহে,

যিনি মাধাইকে দেখিতে লাগিলেন তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে মাধাইয়ের দ্বারা, লোকের মন নির্ম্মল ও নগরে ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রচার হইতে লাগিল।"

"মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না। শ্রীনিত্যানন্দ আজ্ঞা করিতেছেন তবু মাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, কেবল ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাদ দিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আসিয়া দেখেন যে, মাধাই সম্মুখে অন্ন রাখিয়া—আহার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে বসিলেন, বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "মাধাই! তোমার অনন্ত পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া আছি এবং আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে, তাহাও তোমায় দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি শান্ত হও।"

ইহাতে মাধাই বলিলেন, "প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার সম্মুখে, তখন আমি আর চাইব কি? আর তুমি যখন আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি। কিন্তু এখন যে রোদন করিতেছি, এ পাপ স্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণা স্মরণ করিয়া। আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত দণ্ড যদি আমাকে ভোগ করিতে হইত, তবে আমার দুঃখ থাকিত না। আমি অস্পৃশ্য পামর, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তুমি আমাকে যত করুণা করিতেছ—ততই আমার আত্মগ্লানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে আমাকে অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুনয়-বিনয় করিতেছ—কিন্তু তুমি বা কি, আর আমি বা কি? প্রভু! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে আমাকে করুণা করিতেছ, সেই পরিমাণে আমার দুঃখ বাড়িতেছে।"

"এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান যখন স্বয়ং

মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার এত কাতরে রোদন কেন? ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন কিন্তু তত্রাচ তিনি কখনও আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে ঐ পাপ অনুতাপানলে গলিয়া নয়নদ্বারা বাহির হইয়া থাকে। এই তাঁহার নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল। যদিও তিনি মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তবুও তাহার সে পাপের কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ভগবানের আজ্ঞা যে, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধাইয়ের পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু সমুদায় নিয়ম ঠিক রাখিয়া তিনি স্বেচ্ছায় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া বালকের মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন না।

তিনি যে গৌরদেহ অবলম্বন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ও চিন্ময় এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন। তবে তিনি কেন আহার করিতেন? কেন যাইতেন? ঐ দেহের কেন রোগ হইয়াছিল? শ্রীভগবান যখন দেহ লইয়া নরসমাজে বিরাজ করেন, তখন দেহেরও যে সমুদায ধর্ম্ম তাহাও সাধারণ জীবের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। মাধাইয়েরও সেইরূপ, স্বভাবের যে নিয়ম তাহা পালন করিতে হইল।"

(শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।)

মাধাই নিজ হস্তে কোদালি ধরিয়া নবদ্বীপে গঙ্গায় একটী ঘাট প্রস্তুত করেন। ঐ ঘাটের নাম হইল "মাধাইয়ের ঘাট" মাধাইয়ের ঘাট আজও নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ। মাধাইয়ের সেই গান—

"তোমরা দু'ভাই গৌর নিতাই।
আমরা দু'ভাই জগাই মাধাই॥"

আজিও মোহন সুরে আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। মাধইয়ের বংশীয়গণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা পরম গৌরাঙ্গ ভক্ত।

ক্রমশঃ

"তীর্থ চিন্তা"

(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবা লিখিত।)

প্রয়োজন হইলে পরচর্চ্চাও করিতে হয়। পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া যে মুখে ঘোষণা করা যায়, সেই মুখেই আবার পরনিন্দা করিতে হয়। তাই দেখিতে পাই, রামায়ণে রামের মহিমা বর্ণন করিতে রাবণের দুর্নাম গান করিয়াছেন, তাই মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপ্রাণতা প্রচার করিতে দুর্য্যোধন এবং দুঃশাসনের দুষ্কর্ম্মাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীভাগবত গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব প্রদর্শন করাইতে তাই জরাসন্ধ, শিশুপাল, কংস, দন্তবক্র প্রভৃতির নিন্দা প্রচার করিয়াছেন।

প্রয়োগের বিধান অনুসারে তীব্র হলাহলও অমৃতের ফল প্রদান করে। যখন সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে, নানারূপ ব্যাভিচারের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, এবং মোহের অন্ধকারে সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে, তখন বিশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে কথা বলিতে হয়, দুর্জ্জনের কদাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে হয়, এবং তাহাদ্বারা সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব তাহার নিদর্শন। স্বরূপকথনের নাম নিন্দা নহে। সমাজের মঙ্গলের জন্য, ঈর্ষার বশবর্ত্তী না হইয়া, যখন দুরাচারের সমালোচনা করা যায়, তখন তাহাকে নিন্দা বলে না। যে দুর্জ্জন শাসন করিতে রাজা রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাহার নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইলে, লোকলজ্জা ভয়েও সে অনেক সময়ে স্বভাবের পরিবর্ত্তন করে। সাধুবাদ প্রচারে বা হরিনাম প্রচারে জীবের যেমন মঙ্গল সাধিত হয়, সাধুর

পদস্খলনের সংবাদ, অথবা ভণ্ডের ছল-কৌশলের বিবরণ প্রচারেও সময়ে সময়ে জনসমাজের অনেক কল্যাণ ঘটিয়া থাকে। একজনের দৃষ্টান্তে দশজনের শিক্ষা হয়। পাপের অবাধবাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং দুষ্টে দুর্ম্মতি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে গমন করে।

বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা দর্শন করিয়া ভাল মন্দ অনেক প্রকারের চিন্তাই মনের মধ্যে স্থান পায়। স্বদেশ, স্বজাতি বা আপন সমাজের উন্নতি চেষ্টায় সকলেরই অধিকার আছে। যে যতদুর শক্তিমান সে তৎদুর চেষ্টা করে। যে যাহা ভাল বিবেচনা করে, সে তাহাই ডাকিয়া দশজনকে শুনাইয়া থাকে। আমিও যাহা সৎ ও সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, সদুদ্দেশ্যে তাহাই জগৎকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। সমাজের অসদংশ বা ভণ্ডের দুরাচার সংস্কার করিতে, প্রধান ও প্রবীণ পুরুষগণের সম্মুখে স্থাপিত করিলাম। আমার উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তাহা হইলে ইহার জন্য আমি অপরাধী নই।

যার যা ইচ্ছা সে তাই করুক, তুমি তাহার প্রতিবাদ করিও না, করিলে পরনিন্দার পাপে পাপী হইবে, ইহা একদলের মত। সে দলের মধ্যেও তাহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদ দর্শন করা যায়। তাহারা যখন ভণ্ডের নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন পরনিন্দার ধূয়া ধরে; কিন্তু সেই ভণ্ডের নিন্দা বা সমালোচনা করিতে কোন সাধু সত্যবাদী দণ্ডায়মান হইলে, তাহারা তাহার নিন্দা করে। তাহাদের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন ব্যাপার!

বুদ্ধদেব অদৃষ্টবাদী অকর্ম্মা লোকের জড়তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধগণের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেব মায়াবাদ ও হিংসার বিরুদ্ধে জগতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষক তাহার ছাত্রকে সাধুবাদ শিক্ষা দিতে

অসাধুতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদই দূষণীয় নহে। যাহা সত্য, যাহা সারগর্ভ, তাহা গ্রহণীয়। সত্য প্রচারিত হউক। সত্যের উপাসনা আরম্ভ হউক। প্রবীণ পুরুষগণ জনসাধারণকে সত্যের মর্ম্ম ও সত্যের মহিমা বুঝাইয়া দিউন। আর্য্য সমাজের কল্যাণ হউক। যাহা মিথ্যা তাহা ভাসিয়া যাউক, জলে আলিপনার মত মিশিয়া যাউক। আবেগ উদ্বেগ ও অসার প্রলাপ ধর্ম্মজগত হইতে অন্তর্হিত হউক। এইবার আমার বক্তব্য বলিব।

তীর্থের উৎপত্তি।—পরমপুরুষ পরমেশ্বর তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তগণের পদস্পর্শদ্বারা অতীর্থকে তীর্থ করিয়া থাকেন। তীর্থের তীর্থত্ব কেবল সাধু মহাপুরুষগণের অবস্থিতি লইয়া, এবং তীর্থের মহিমা কেবল তাঁহাদের গমনাগমনে সম্বর্দ্ধিত হয়। সাধুগণই তীর্থের অলঙ্কার এবং তীর্থের অন্ধকারনাশক বিমল নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ সুধাকর। সাধুগণই তীর্থের গৌরবস্তম্ভ এবং তীর্থ-যাত্রিগণের শান্তিলাভের অক্ষয় মঙ্গলনিকেতন। আর যে সকল গৃহস্থ তীর্থে বাস করেন, সাধুগণ তাঁহাদের নিত্যাশীর্ব্বাদক পরম সহায়।

সাধু ভক্তের অভাবে তীর্থ যেমন অন্তঃসারশূন্য তেমনি সৌন্দর্য্য-বিহীন। সাধুর অভাবে তীর্থস্থান গৃহস্থ পরিত্যক্ত শূন্যগৃহময় বাস্তুভিটা অথবা উপেক্ষণীয় রুক্ষ রুদ্র মরুভূমি। যে তীর্থে সাধু নাই তাহা দর্শন-যোগ্য নহে; তাহা গমনীয় নহে এবং সেবনীয় নহে। তাহাতে গমন করিলে যেমন বৃথা পরিশ্রমে শরীরক্ষয় ও মনঃক্লেশ ঘটে তেমনি অর্থনাশ ও বিড়ম্বনার সন্তাপে চিত্ত ব্যথিত হয়।

তীর্থ পর্য্যটনের উদ্দেশ্য।—তীর্থ পর্য্যটনের উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে অন্তরে আশা ও উল্লাসের সঞ্চার হয়। কারণ তীর্থ পর্য্যটনের মত আত্মোন্নতির সহজ উপায় আর নাই। তীর্থের

মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য যাত্রীর অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে। নানাপ্রকারের সাধকগণের সাধনপদ্ধতি ও ত্যাগশীলতা দর্শন করিয়া অন্তরে বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। কেহ যোগাসনে বসিয়া নিমিলিত নেত্রে ধ্যানস্থ, কেহ ভক্তশিষ্যগণ মধ্যে উপবেশন করিয়া জ্ঞান-বিচারে নিযুক্ত, আবার কোন কোন স্থানে সাধুগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য উন্মাদের মত নৃত্যময়, কোথাও বা ভাগবত শ্রবণে একাগ্র অন্তরে নীরবে ধ্যানস্থ যোগীর মত উপবিষ্ট, ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাব দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীর চিত্ত ক্ষণকালের জন্য বিষয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়।

সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নে সারাজীবন অতিবাহিত করিলে যে জ্ঞান লাভ না করা যায়, একটীমাত্র সাধুদর্শনে তাহার দশগুণ জ্ঞানের উদয় হয়। প্রচলিত প্রথার অনুসরণে ধর্ম্মাচরণ করিয়া দীর্ঘকালে যে অধিকার না জন্মে, দুই চারিদিন সাধুসঙ্গ করিলে তাহা জন্মিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করিলে তীর্থের বিশেষত্ব সহজে এবং স্বল্প সময়ে অনুভব করা যায়। সাধুসেবায় চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে, ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, এবং সংসার কলহের নিবৃত্তি হয়। তীর্থে যাইয়া সাধুসঙ্গে একত্রবাসে যে আনন্দ অনুভব করা যায়, তাহার স্মৃতি দীর্ঘকাল অন্তরে জাগ্রত থাকিয়া শান্তিদান করিয়া থাকে। সুতরাং তীর্থ পর্য্যটনে যে পরমানন্দ লাভ করা যায় ও অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় একথা কাহারো অস্বীকার করিবার অধিকার নাই।

যাহারা তীর্থে যাইয়া সাধুদর্শনে বঞ্চিত হয় সাধু সেবায় বিমুখ থাকে এবং সাধুর উপদেশ অন্বেষণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে তাহাদের তীর্থস্নান হস্তিস্নানের মত, তাহাদের তীর্থপর্য্যটন মর্কটের গ্রাম প্রদক্ষিণের মত। তাহারা লক্ষ্যহীন নাবিকের মত সমুদ্র ভ্রমণের

কষ্টই মাত্র সহ্য করে। তাহারা অমৃতকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়া বালুকায় স্নান করে এবং আপনার বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ উন্মত্তের মত জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

শ্মশানের বিভীষিকা।—শ্মশান সাধনায় বিভীষিকা বিঘ্ন উৎপাদন করে। ভূত প্রেত আসিয়া সাধককে ভয় প্রদর্শন করে। কত ব্যাঘ্র ভল্লুকে গ্রাস করিতে সম্মুখে উপস্থিত হয়। কখনো কত মনোহরা রমণীমূর্ত্তি, মনোরম ভোগসমূহ সম্মুখে ধরিয়া সাধককে বিপথ-গামী করিতে চেষ্টা করে। শ্মশান সাধনায় তাই বীরত্বের প্রয়োজন হয়। তাই শ্মশান সাধককে বীরসাধক বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ সাধনা যে বীরের কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সংগ্রামজয়ী বীর অপেক্ষা শ্মশানজয়ী সাধকের শক্তি ও প্রতিভা অনেক অধিক। সিদ্ধের ত তুলনাই নাই। সংগ্রামজয়ী বীর প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিকে পরাজিত করিয়া তাহার সম্পত্তি উপভোগ করে, আর শ্মশান-সাধনায় সিদ্ধবীর স্বরাট সম্রাট জগন্নাথকে বশীভূত করিয়া পরম শান্তি-লোকে চিরস্থির রাজত্ব লাভ করে।

কাহার নাম শ্মশান?—সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই শ্মশান সাধনা সর্ব্বত্র বিরাজিত। যে কোন স্থানেই সাধনা করিতে উপবেশন কর, সর্ব্বত্রই আসনকে শ্মশানের মত করিতে হইবে। যে স্থানে উপসর্গ নাই, সংসারের কোলাহল নাই, এবং মায়া মমতার আকর্ষণ নাই, তাহারই নাম শ্মশান। অথবা যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলে জগতের নশ্বরত্ব স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, বৈরাগ্যের বিষাদ অন্তঃ-করণকে অবসন্ন করে, আপন মরণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া বন্ধুজনের মমতাপাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করে এবং অতীত জীবনের অসৎ কর্ম্মাবলী স্মরণ করাইয়া পরকালের ভাবনা সম্মুখে ধরিয়া শরীরকে

রোমাঞ্চিত করে তাহারই নাম শ্মশান। এইরূপ স্থানই সাধনার স্থান, এবং এইরূপ স্থানে আসন পাতিলেই অনায়াসে একাগ্র অন্তরে সাধনা করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যিনি সাধনা করিতে উপবেশন করিবেন তাঁহার আসন যদি বৈরাগ্যজনক না হয়, যদি শ্মশানের মত মন-প্রাণ উদাসকারী না হয়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাঁহার পক্ষে সুকঠিন। যেস্থানে বসিলে, পুত্র-পরিজনের কোলাহল-তরঙ্গ চিত্তকে অভিঘাত করে, ধন সম্পত্তির বিনিময়বার্ত্তা কর্ণকে ব্যথিত করে, মমতার চিত্র নয়নপথে পতিত হইয়া ভগবদ্দৃষ্টি রোধ করে এবং সংসার বাসনায়, ভগবানের চরণ-কমলে ধ্যানস্থ মন জলৌকার মত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া গতিশীল হয় সেস্থানে সাধনা হয় না।

আসনের সঙ্গে সাধনার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। আসন চঞ্চল হইলে মন নিশ্চয়ই চঞ্চল হইবে। তাই তত্ত্বদর্শীগণ নির্জ্জন, সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনশূন্য স্থানে সাধনার জন্যে আসন নির্ম্মাণ করেন।

ক্রমশঃ

ভ্রম

সুনীল বারিধি রয় নীরবে পড়িয়া,
পাতিয়া বিশাল বক্ষঃ আপনার মনে ;
সে বারিধি বক্ষঃ হ'তে জনম লভিয়া,
নাচে কিন্তু উর্ম্মিমালা ভীম গরজনে।

---

* প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ, আমরা একটু একটু করিয়া প্রকাশ করিব, পরিব্রাজক মহাশয়ের নিজ অভিজ্ঞতায় প্রবন্ধটী লেখা, কাজেই আশা করি ইহার মধ্যে পাঠকগণ অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। (ভঃ সঃ)

কার বক্ষঃ হ'তে তার হ'য়েছে উদ্ভব,
কে তারে বুকের মাঝে রাখিয়াছে ধরি ;
আত্মহারা হ'য়ে গিয়ে ভুলি সেই সব,
ফুলে উঠে অহঙ্কারে গরজন করি।
আশ্রয় ছাড়িয়া আসি পড়ে বেলাভূমে,
ভীমরোলে গরজিয়া মাতি অহঙ্কারে ;
আছাড়ি আছাড়ি কত পড়ি তটভূমে,
তারপর নিজ ভ্রম বুঝিতে সে পারে।
তখন সে উদ্দাম গতি নাহি রয়,
আচা-কা হইয়া যেন কত সঙ্কুচিত,
বারিধির বুকে এসে মুখটী লুকায় ;
মুখে শুধু ফেন পুঞ্জ হয় উদ্গীরিত।
তেমনি এ ভবতলে অজ্ঞান মানব,
মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে কত যে কি করে ;
অহঙ্কারে মোহঘোরে ভুলে' যায় সব,
আপনারে কত বড় ভাবে সে অন্তরে।
অনেক আঘাত ভবে পায় সে যখন,
তখন তাহার মনে জ্ঞানোদয় হয় ;
আপনার যত ভ্রম বোঝে সে তখন,
কাতরে তোমার পদে আশ্রয় সে লয়।

... ...

... ...

প্রভু হে !—তোমা ছাড়া কিছু নাহি হয় যে সম্ভব !
ভ্রমেতেই এইটুকু বোঝে না—মানব !!

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা

(অবধূতের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত।)

[৫]

ইতিপূর্ব্বে আমি গুরুবংশ নিষ্প্রভ হওয়ায় নিম্নশ্রেণী একটু পতিত হইয়া পড়িয়াছিল একথা বলিয়াছি সেইটিই আর একটু খোলসা করিয়া বলিব। হিন্দু সমাজ নানা শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক শাখাই নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে চালিত হইয়া থাকে। এই শাখাগুলির মধ্যে যতই অসামঞ্জস্য দেখা যাউক না কেন, গুরু করণ, গুরু উপদেশ পালন, গুরুমতানুসরণ ইহাতে কোন শাখার সহিত কোন শাখার অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। গুরু যে মূল ইহা সকল শাস্ত্র এবং সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। গুরুকে বাদ দিয়া কোন সাধন করিয়াইযে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না, গুরুই যে সকল সাধন ভজনের মূল ভিত্তি একথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

হয়ত—হয়ত কেন অনেকে বলিয়াও থাকেন যে, অনাদিনিধন শ্রীভগবানের উপাসনায় একজন মনুষ্য মধ্যবর্ত্তী থাকিবে কেন?

একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি আলোচনার অবসর পান কিনা জানিনা কিন্তু যদি সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া দেখেন তাহা হইলেও এভাবের সন্দেহ মনে আসিতে পারেনা। যাক্, যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদের সোজাসুজি বোঝা উচিত যে, যখন গুরুকরণ প্রথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তখন অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহীত আছেই। সমাজে যে কোন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার মূলে উদ্দেশ্য ভালই থাকে। তবে আমাদের ব্যবহার দোষে হয়ত

অনেক সময় অনেক গোলমাল হইয়া যায়, সেজন্য মূলের দোষ দেওয়া যায় না। মনে করুন কোন গৃহস্থের ২৫জন পোষ্য আছে কিন্তু তাহার সংসারে একজনে রন্ধন করে আর সকলে খায়। হয়ত আপনি বলিবেন, বাঃ একজন কষ্টকরিয়া রাঁধিবে আর সকলে বসিয়া বসিয়া খাইবে তাহা হইবেনা। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন যদি পরিবারস্থ সকলকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন রন্ধন করিতে হয় তাহা হইলে অন্য কাজ কর্ম্মের অবকাশ থাকে কোথা হইতে। যদিও অবকাশ থাকে তবে রন্ধন ভোজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এটী যেমন একটি সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষণের ব্যবস্থা, সেইরূপ সমাজের কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই গুরুপদবী স্থাপিত হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিয়া নিজ মত স্থাপনের প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

শাস্ত্রানুশীলন ও ইষ্ট সাধনাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আবার ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব অবগত হওয়াও সকলের সাধ্যায়ত্ব নহে, কারণ সংসারে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই মানুষের প্রথম চেষ্টা অন্ন, দ্বিতীয় চেষ্টা ধর্ম্ম। যাহারা অন্নের চিন্তা অধিক করে তাহাকেই শাস্ত্র বদ্ধজীব বলিয়াছেন; আর যাহারা ধর্ম্মের চিন্তা অধিক করে তাহারাই মুমুক্ষু বলিয়া কথিত হয়। সাধারণতঃ বদ্ধ জীব ধর্ম্মপথে সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে না। তাই সংসারে সাধারণতঃ মুক্ত বা মুমুক্ষু জীবের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয় না। যদিও মুমুক্ষু দু'চারজন পাওয়া যায় কিন্তু মুক্ত অতি সুদুর্ল্ভ। মুক্তজন সংসারের অতীত। সংসারী সাধারণতঃ বরং ধর্ম্মচিন্তা না করিয়াও কোন রকমে থাকে কিন্তু অন্নচিন্তা বিরহিত হইয়া থাকা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তারপর ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সহজ সাধ্য নহে। উহাতে প্রভূত শাস্ত্রানুশীলন, গুরুকৃপা ও নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্ট সাধন আবশ্যক হয়। কেবল তোতা পাখীর মত শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা সেচ্ছাচারীভাবে সাধন

করিলে হয় না, উভয় বলেরই তুল্য রূপ প্রয়োজন। পাণ্ডিত্য হীন সাধক উপযুক্ত গুরুর উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজে কৃতার্থ হইতে পারেন বটে কিন্তু অপরের সংশয় ছেদন করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপথে আনিবার শক্তি হয় না, এইজন্যই উভয় বল সম্পন্ন ব্যক্তিকে স্ব স্ব শাখায় গুরুপদ দেওয়া হইয়া থাকে।

বংশপরম্পরা গুরুগণ যাহাতে গুরুপদবীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন সমাজে তাহারও সুব্যবস্থা নির্দ্ধারিত আছে। দুঃখের বিষয় আমরা তাহা পালন করি না। ব্যবস্থা আছে গৃহস্থ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গুরুগণের অন্নচিন্তা দূর করিবেন, আর গুরুগণ নিজ নিজ শিষ্যের ভক্তিদত্ত অর্থে নিশ্চিন্ত হইয়া বিদ্যা উপার্জ্জন, শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সার আকর্ষণ পূর্ব্বক সাধনবল সঞ্চয় করিয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান-সাধনোত্থ বিশ্বাস গৃহস্থ শিষ্যের মধ্যে প্রচার করিয়া শিষ্যকে সাধ্যসাধনতত্ত্বের সুগম উপদেশ প্রদান করিবেন। এদিকে গৃহস্থগণকেও আত্মসংযমী ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া বিশ্বাস সহকারে আপনাপন গুরুমুখে শাস্ত্রসার সাধনলব্ধ উপাসনা ও তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাই প্রাচীন গুরুশিষ্য পরম্পরা সুনিয়ম। পাঠকগণ! বলুন দেখি এখন সমাজে এ ভাবের নিয়ম প্রচলিত দেখিতে পান কি? কিন্তু যতদিন সমাজে এই সকল সুনিয়ম বলবান ও বর্ত্তমান ছিল ততদিন সমাজ ধর্ম্ম ও অর্থবল সম্পন্ন সকল সুখের আকর ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ যেমন যেমন এই সকল সুনিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল সুখের সাগর নিরাপদ হিন্দু সমাজও তেমনি তেমনি শুখাইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল।

এইখানে আবার একজনের ঘাড়ে দোষ না চাপাইলে এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। এখন এই অধঃপতনের কারণ স্বরূপে কাহাকে দাঁড় করান যায় সেইটীই ভাবিবার কথা। একটু নিবিষ্টচিত্তে কোনরূপ

পক্ষপাতিত্ব না করিয়া ভাবিলে শিষ্যদের দোষ অপেক্ষা গুরুদের দোষটাই যেন হৃদয়ে বেশী জাগিয়া উঠে। কেন তাহাই বলিব। অবশ্য আমার এই রূপ মনে হয়, হয়ত আমার ভুলও হইতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তাহা ধীর ভাবে আগে শোনা দরকার তারপর যাহার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে বলুন।

হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে গুরু মনুষ্য নহেন। হিন্দু গুরুকে উপাস্য দেবতার সমান জানিত এবং সেইভাবে সমান পূজা করিত, সম্মান দিত; এখনও সমাজে গুরুর দেবতুল্য সমাদর দৃষ্টিগোচর হয়।

সিদ্ধে সাধ্যতুল্যতা প্রাপ্তই সিদ্ধি। গুরু সিদ্ধ বলিয়াই গুরুকে ইষ্টতুল্য জ্ঞান করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্র দিয়াছেন। তাহা হইলে সহজেই বোঝা যায় যে, অসিদ্ধ ব্যক্তির গুরুপদবীতে অভিহীত হইবার অধিকার নাই। তবে যে নিজে অসিদ্ধ হইয়া গুরু পদবীতে বসিতে যাওয়া অজ্ঞান মূলক অনধিকারে অধিকার বা হঠকারিতা একথা কে অস্বীকার করিবে? কুল-ক্রমাগত ব্যবধান বিবেচনায় নিজে অনুপযুক্ত হইয়াও উপযুক্তের ন্যায় কার্য্য করিতে যাইয়া, এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া, উভয়েই কূপেতে পতিত হয়, সেইরূপ নয় কি? যে মান সিদ্ধব্যক্তি তৃণতুল্য জ্ঞান করেন সেই দেব-গৌরব সাধনহীন প্রাকৃত স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ধারণ করিতে চান কি বলিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উপযুক্ত পরিপাক শক্তি না থাকিলে কি গুরুপাক খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ হয়? বরং জোর করিয়া খাইলে কঠিন ব্যাধিই হইয়া পড়ে। শাস্ত্রোক্ত সমাচরিত গুরুগৌরবের পরিণামফল অযথা অপব্যবহার নিবন্ধন এখন বিষময় হইয়া পড়িয়াছে। সম্মানের লোভে বিমোহিত হইয়া গুরুবংশধরগণ নিতান্ত অপরিণামদর্শী হইয়া ক্রমশঃ বিদ্যার অনাদর করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন তাহাতে ফল হইয়াছে এই যে, যাহার গৌরবে গৌরব ছিল

সেই সাধন, সেই শাস্ত্রানুশীলনাদি তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল পূর্ব্বপুরুষগণের কীটদষ্ট জীর্ণপাতি (মন্ত্র লেখা কাগজ) আর তিলকমালা ও মনোযোগশূন্য দায়সারা লোক দেখান আহ্নিকপূজা। পাঠকগণ, ভয় নাই এ কিন্তু আমি বর্ত্তমান সময়ের কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা বলিতেছি না। আপনারা আশ্বস্ত হউন, আমি ধীরে ধীরে আলোচনা করিতে করিতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আসিব এইরূপই আশা আছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন এইভাবে গুরুগণ বিদ্যাশূন্য, সাধনহীন, মন্ত্রসার "মুখভাগবতী" পরায়ণ, কেবল আত্মভরণপটু হইয়া বার্ষিক আদায়েই তৎপর ছিলেন। শিষ্যেরাও সকল বুঝিয়া ক্রমে হাত সঙ্কোচ করিলেন। তখন আর চলে না, অগত্যা গুরুবংশধরেরা কেহবা চাকুরী, কেহ বা ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ধর্ম্মসমাজ গুরু বংশধরগণ দ্বারা অবনতিরদিকেই অগ্রসর হইতে চালল।

সহৃদয় চিন্তাশীল পাঠকগণ! এখন বলুন দেখি এ দোষটা যে উপর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করি কেমন করিয়া? গুণবানে প্রীতি যেমন স্বাভাবিক, গুণহীনে অনাদরও তেমনি স্বাভাবিক। এখনও সমাজ যে এত বিকৃত হইয়াছে তথাপি প্রকৃত সাধুর অনাদর করিতে সমর্থ হয় কয়জনে? গুরুগণ যদি প্রকৃত গুরুপদবীর যোগ্যগুণে বলবান থাকিতেন তবে কার সাধ্য তাঁহাদের অনাদর করে। কিন্তু তাঁহাদের সে তেজ কোথায়? তাঁহারা বিদ্যা শিখিবেন না, সাধনবল সঞ্চয় করিবেন না, কেবল পাঁতিতে লেখা মন্ত্র কাণে ফুঁকিয়া বংশের গৌরব দেখাইয়া ষোলআনা মহিমাটুকুর দাবী করিবেন, ইহাতে লোকের শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকিবে কেন? শ্রদ্ধা বা ভক্তি কি কষ্ট কল্পনা করিয়া হয়? উহা স্বভাবতঃ গুণ-পক্ষপাতী।

পাঠকগণ শুনিলে অবাক হইবেন এখন পর্য্যন্তও অনেক স্থানে দলিলে বা চৌকিদারী কাগজে কতকগুলি লোকের ব্যবসা "ঠাকুরালী" বলিয়া লেখা হয়। বলা বাহুল্য ইহা গুরুগিরির নামান্তর। আপনারা বিচার করিয়া বলুন দেখি যাহা এক সময় ভক্তির দান ছিল, তাহা যে এখন ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে ইহা কি অধঃপতনের কথা নহে ?

ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সকলের পূজা পাইতে লাগিলেন, নানাশাস্ত্রে তাঁহাদের উচ্চমহিমা কীর্ত্তিত হইল। ক্রমে তাঁহাদের বংশধরগণ বিলাসিতার মোহে ব্রাহ্মণোচিত গুণে অনাদর করিয়া শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ মহিমাটুকুর ষোল আনা দাবী করিয়া বসিলেন! সদাচার রক্ষার জন্য কৌলিন্য প্রথা স্থাপিত হইয়া নবধাকুললক্ষণের বিধি হইল। কিন্তু কুলিন সন্তানগণ একধামাত্র সুলক্ষণের উত্তরাধিকারী না হইয়া শত শত অনাচার করিয়াও পৈত্রিক কুলমর্য্যাদার ষোল আনা দাবীদার হইয়া বসিল। আমার মনে হয় হিন্দুসাজে গুণগত মর্য্যাদা যে ক্রমে বংশগত হইয়া পড়ে ইহাই সমস্ত অবনতির মূল। এখন পর্য্যন্ত যাহা দেখিতেছি ইহার পর হয়ত ডাক্তারের ছেলেকে ডাক্তার বা হাকিম উকিলের ছেলেকে হাকিম উকিল না বলিলে মানহানি উপস্থিত হইবে। আমার এ সকল কথায় কেহ যেন মনে করিবেন না যে, আমি এই সকল মহদ্বংশের গৌরব বিদ্বেষী। আমি তাঁহাদের শত শত অনাচার অত্যাচার দেখিয়াও অবনত মস্তকে তাঁহাদের গৌরব স্বীকার করিব। কিন্তু কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতার জন্য উচিত সমালোচনা করিতে ভয় পাইব কেন? তাঁহারা যদি নিজ নিজ বংশ-গৌরব রক্ষা করিতে যত্নশীল হন, তাহাতে আমাদের আনন্দ হইবে। আর আমাদের এই সমালোচনাও সার্থক মনে করিব।

আলোচনাক্ষেত্রে একটু একটু করিয়া আমি আমার বক্তব্য বিষয় হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণবধর্ম্মের অবস্থা আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে দু'একটা কথা বলিয়াছি রাগ করিবার ইহাতে কিছুই নাই। আমি যাহা বলিলাম সত্য কি না ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তবে—

"মনুষ্যানাং স্বরূপ কথনং নিন্দা, দেবানাং স্বরূপকথনং স্তুতিঃ।"

এই হিবাবে যদি কেহ নিন্দা বলিয়া ধরিয়া লন, তাহা হইলে আমি নাচার।

ক্রমশঃ

বিশ্ব-হিতে অন্ধপ্রেম

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

মানুষের সুখ কি এবং কিরূপে তাহা লভ্য? এ কথার বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত উত্তর এই যে, মনুষ্যত্বই সুখ এবং মনুষ্যত্বের বিকাশেই তাহা লাভ করা যায়। এই মনুষ্যত্বের উন্মেষ আবার কিরূপে হয়? কর্ত্তব্যপালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব উন্মেষিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তব্যপালনই মানুষের ধর্ম্ম। তাই দেখিতে পাই, কর্ত্তব্যপালনরূপ মানবধর্ম্মের উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যেখানে তাহার অভাব দেখিব, বুঝিতে হইবে, সেখানে মানব-হৃদয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিয়াছে। কর্ত্তব্যপালনে ঔদাসীন্য যথার্থ মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হইতে পারে না। কারণ তাহাহইলে মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। যেহেতু পশুর স্বাভাবিক কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই এবং কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্তিও তাহার নাই। কিন্তু মানুষের আছে। এই গুণেই মানুষ—মানুষ; আর এই গুণের অভাবেই পশু—পশু।

পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গাদি মানবেতর প্রাণীগুলি এই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ

করিয়া বেড়ায়, কোন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ধার অবশ্যই তাহারা ধারে না। ক্ষুধা হইলেই খায়, নিদ্রা আসিলেই শয়ন করে. এই পর্য্যন্ত। সুখ বা দুঃখের একটা অনুভূতি তাহাদেরও অন্তরে আছে বটে, কিন্তু তাহাও "আছে" ঐ পর্য্যন্ত। তা ছাড়া আর কিছুই তাহারা জানে না।

কিন্তু মানুষ তাহা কখনই নহে। মানুষের জন্ম ও জীবন কখনই পশু-পক্ষীর জন্ম-জীবনের এক পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যাইবে না। মানব ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের কথা বলিতে হইলে, এক কথায় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মানবের ধর্ম্ম—কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং মানবেতর প্রাণীর ধর্ম্ম,—কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা।

মানুষেরও এই কর্ত্তব্যজ্ঞান আবার সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় একই-রূপ থাকে না। সময় এবং অবস্থা-বিশেষে মানুষেরও এই একান্ত এবং স্বাভাবিক মানবধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। তবে একথা সত্য যে, মনুষ্যজীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা অবশ্য এই স্বাভাবিক মানবধর্ম্ম প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের অন্তররাজ্যে অবস্থা এবং সময়বিশেষে এই মানবধর্ম্মের প্রাবল্য অথবা দৌর্ব্বল্য যেমন ঘটিয়া থাকে—মানবজীবন তাহার ঐ স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রভাবান্বিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া,—সেই ব্যক্তির মনুষ্যত্বও তেমনি তখন ঐ মানবধর্ম্মের প্রাবল্য অথবা দৌর্ব্বল্যের হিসাবেই অধিকতর বিকশিত হয় অথবা বিমলিন হইয়া পড়ে।

ফলকথা কর্ত্তব্যজ্ঞানই হইল, মানুষের ধর্ম্ম এবং সেই কর্ত্তব্যপালনই মানুষের জীবন। কর্ত্তব্যজ্ঞানের এবং কর্ত্তব্যপালনস্পৃহার অল্পতা অথবা আধিক্য লইয়াই ব্যষ্টি হিসাবেও প্রত্যেক মানুষের মনুষ্যত্ব পরিমাণ করিতে হয়। মানুষরূপে জন্ম লাভ করিয়া একদিনেই কেহ মানুষ হইতে পারে না। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে বহু সাধনার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধেই একথা বলিতে হইবে যে, তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান যতই বর্দ্ধিত এবং কর্ত্তব্যপালনস্পৃহা যতই বলবতী হইবে, তাহার মনুষ্যত্বও ততই অধিকতর বিকশিত হইতে থাকিবে। মানুষ যত "মানুষ" হইতে থাকিবে, তাহার কর্ত্তব্যের সীমাও ততই অধিক-তর বিস্তৃত হইতে থাকিবে। তখন আর ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গৃহকোণে

আবদ্ধ থাকিয়া আপনার এবং আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করিয়াই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারিবে না। তখন গৃহ ছাড়িয়া গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়া ক্রমশঃ দেশের কাজে মানুষের কর্ত্তব্য আসিয়া পড়িবে। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া মানুষ সমগ্র জগতের জন্য আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে চাহিবে এবং অবশেষে বিশ্বেরহিতে আপনাকে ঢালিয়া দিবে। মানুষের প্রতি বিধাতার ইহাই নির্দ্দেশ।

বিধাতা সাধ করিয়া এই যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দিয়া এমন ভাবে যে তাহাকে সাজাইয়াছেন, সে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি শুদ্ধ মানুষের অন্তরেই আছে। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্ব চরাচরই তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপাদান হইলেও, সে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এই সকলের কাহারও ভিতর তিনি দেন নাই। দিয়াছেন—শুদ্ধ মানুষের অন্তরে। মানুষই বিশ্বরচয়িতার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম উপাদান এবং এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতিও তিনি তাই শুদ্ধ মানুষের অন্তরেই দিয়া রাখিয়াছেন। মানুষকে লইয়াই তিনি এই বিশ্বের লীলাখেলা করিতেছেন, মানুষকেই আবার সে লীলা-মাহাত্ম্য বুঝিবারও শক্তি এবং সময় দিয়াছেন। মানুষ যে কে এবং কত বড় অথবা মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ যে কি—তাহা মানুষকেই বুঝাইবার জন্য তিনি আবার মানব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলে মানুষের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মানুষই ভগবানের বিশ্বসৃষ্টির যন্ত্র, মানুষই ভগবানের বিশ্বপালনের আধার, মানুষই ভগবানের বিশ্বধ্বংসের অস্ত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনি মানুষকে দিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহার ভাঙ্গা-গড়া-রাখা সকলেরই মূল উপলক্ষ আছে,—মানুষ। মানুষই ভগবানের হাতের পুতুলের মত বিশ্বসৃষ্টির সেই আদিকাল হইতে বিশ্বের কাজ করিয়া যাইতেছে। কথাটা এই যে, শ্রীভগবান যন্ত্রী, আর মানুষ তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র।

তাহা হইলেই ভগবানের সৃষ্ট এই বিশ্বের হিতসাধনই যে মানুষের কর্ত্তব্য তাহাতে ত আর কোনই সন্দেহের অবসর মাত্র নাই। এই কর্ত্তব্য মানুষকে বুঝিতে হইবে এবং এই কর্ত্তব্যপালনে সচেষ্ট হইতে হইবে। মানুষের প্রতি বিশ্ববিধাতার ইহাই যে বিধান। এই বিধিনির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুবর্ত্তী হইতে যে মানব যতটুকু পরিমাণে সমর্থ হইবে, তাহার জীবনও

ততখানি সার্থক হইবে। মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই যে বিশ্বের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ! বিশ্বস্রষ্টার মহামহিমার মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্বা ডুবাইয়া দিয়া একান্ত ভাবে তদীয় অমোঘ বিধানের অনুবর্ত্তী হওয়াই যে মানবের কর্ত্তব্য এবং এইখানেই যে মানব-জীবনের সার্থকতা।

বুঝিলাম, কর্ত্তব্যজ্ঞান মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যপালন মানব-জীবনের একমাত্র ভিত্তি। এখন আমরা বুঝিতে চাহি যে, মানব-হৃদয়ের এই স্বাভাবিক কর্ত্তব্যজ্ঞান কোন্ শক্তির বলে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানবকে কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করে! যদি বল,—এই কর্ত্তব্যজ্ঞানই যখন মানব-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, তখন সেইজ্ঞানই স্বয়ং মানুষকে কর্ত্তব্যপালনে প্রণোদিত করে! আবার কে করিতে আসিবে! এ কথা স্বীকার করিলেও তাহার উত্তরে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, মানুষ যদি শুদ্ধ কর্ত্তব্যের খাতিরেই কর্ত্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত না। তাহাতে একটা অপূর্ণতা রাহয়াই যাইত। কর্ত্তব্যপালন মানবজীবনের একমাত্র ভিত্তি হইলেও এ ভাবের কর্ত্তব্যপালনে আমরা মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখিবার আশা করিতে পারি না। এইরূপ খাতিরে পড়িয়া যে কর্ত্তব্যপালন, তাহার নিত্যকাল-ব্যাপী স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও প্রচুর সন্দেহের অবসর আছে এবং এরূপ কর্ত্তব্যের সীমাও নিশ্চয়ই দূর প্রসারিণী হইবার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রেরণাতেই যদি মানবের কর্ত্তব্য পরিচালিত হইত তবে তাহা মানবেতর প্রাণীসমূহের কর্ত্তব্যগুলির চেয়ে খানিকটা অগ্রসর হইলেও খুব বেশীদূর যাইতে পারিত না। ব্যবহারিক জগতেও আমরা নিত্য দেখিতে পাই, খাতিরে পড়িয়া অথবা অনুরোধের বশে যে কার্য্য করা হয় তাহা কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়? না, তাহাতে তেমন মাধুর্য্য থাকে? দায়ে পড়িয়া যেটী করিতে হয়, কঠোর কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া হয় বিরক্তিপূর্ণ অন্তরে নয় ত ভীতিবিহ্বল শুষ্কপ্রাণে কোনরকমে সেটী সারিয়া দিয়া দায় মুক্ত হওয়া যায় মাত্র। সে কার্য্য সাধনে, না পাওয়া যায় অন্তরে আনন্দ; না হয় প্রাণে শান্তি। যে কর্ত্তব্যপালন মানব জীবনের একমাত্র ভিত্তি, অথবা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের সুখময় অবস্থা,—এরূপভাবে সেই কর্ত্তব্যপালন একটা আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কি বলিব? এরূপভাবে কর্ত্তব্যপালন করিয়া মানবাত্মার তৃপ্তি

ও শান্তিলাভের সম্ভাবনা আছে কি ? হোক্ না, মানবের সে কর্ত্তব্য বিশ্বহিত সাধন ! তাহাতে কি আসে যায় !

স্বীকার করি, মানবেতর প্রাণীর কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই এবং মানবের তাহা আছে, কিন্তু শুদ্ধ এই কঠোর জ্ঞানের অনুপ্রেরণাতেই যদি মানুষের মন কর্ত্তব্যপালনে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে একদিন না একদিন তাহাকে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া কর্ত্তব্যের সম্মুখ হইতে পলাইয়া আসিতে হইত। সুতরাং মনুষ্যত্বের পূর্ণাবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না এবং মানবজীবন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর—এক কথায় সার্থক হইত না।

তবে উপায় কি ! বিধিবিহিত বিশ্বহিতসাধন তবে কি মানবের দ্বারা সম্ভবপর নহে ? তাহার এই কর্ত্তব্যজ্ঞানটা কি তবে একেবারেই নিরর্থক ? না, একবারেই নিরর্থক এমন কথা বলি না। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ বিশেষ অপর সকল প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তবে তাহার এই জ্ঞান সার্থক হয় তখনই, যখন তাহা প্রেমে গিয়া আত্মসমর্পণ করে। যে জ্ঞানবলে মানুষ অপর সকল প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছি, সেই জ্ঞানই যে মানুষের সুখময় মনুষত্ব বিকাশের একমাত্র উপকরণ ইহা কিন্তু স্বীকার করিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্বের হিতসাধন মানবের কর্ত্তব্য। কিন্তু মানবের এই কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি প্রেমকে পুরোভাগে লইয়া সেই বিশ্বহিতসাধনে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। নতুবা তাহার সিদ্ধিলাভের আশা সুদূরপরাহত। অসম্ভবও বলিতে পারি।

জ্ঞান চক্ষুষ্মান্। সে সমস্তই দেখিতে পায়। ভালমন্দ, সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিতে পারে। বুঝিয়া বুঝিয়া হিসাব করিয়া তালে তালে পা ফেলে। একটী কাজও সে নির্ব্বিচারে করে না বা করিতে পারে না। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটী সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখে। প্রতি কার্য্যের ক্রটী বিচ্যুতি সূক্ষ্ম এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরিয়া ফেলে। তাহার বিচার করিবার নৈপুণ্য আছে, বিবেচনা করিবার শক্তি আছে; সেইজন্য বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ই সে আপন বিচার বিবেচনায় ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়। তাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়। স্বকীয় বিবেচনার বাহিরে তাই সে একপদও অগ্রসর হয় না তাহার বিবেচনার বাহিরে সে আর কিছুকেই আমল দিতে চায় না।

কিন্তু প্রেম অন্ধ। শুধু অন্ধ নয়, বিচার ও বিবেচনার কোনই ধার সে ধারে না। সে একরূপ পাগল। সেইজন্য যাহা তাহার আকাঙ্ক্ষিত, যাহাকে সে পাইতে চায়; তাহাকে পাইবার জন্যই আত্মহারা। বাঞ্ছিতকে পাইবার জন্য সে আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। বাঞ্ছিতের নিকট সে আপনাকে বলি দিতে পারে যেহেতু সে অন্ধ—সে পাগল, সে বিচার-বিবেচনার অতীত। কিন্তু জ্ঞান তাহা পারে না। যেহেতু সে বিচার বিবেচনার অধীন। জ্ঞান তাহার বিচার বিবেচনার শক্তি লইয়া নিজের-স্থান করিয়া লইয়াছে,—মানুষের মাথায়। আর প্রেম—বিচার বিবেচনা শক্তি হীন অন্ধ প্রেম তাহার আসনখানি পাতিয়াছে,—মানুষের হৃদয় মধ্যে!

জ্ঞান যায় বিশ্বহিতসাধন করিতে বিবেচনা করিয়া। বুঝিয়া বুঝিয়া হিসাব করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চারিদিকের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে দেখিতে সে অগ্রসর হয়। সুবিধা বোঝে ত খুব দ্রুত অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু অসুবিধা দেখিলেই আবার পিছাইয়া পড়ে। তাই মনে হয়, বিশ্বহিতসাধন কর্ত্তব্য বলিয়া জানিলেও একাকী জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া উঠিতে পারিবে কি না তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু প্রেম কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে জানে না। যেখানে সে যাইতে চায়, যাহাকে সে পাইতে চায়; সেখানে তাহার কাছে সে যাইবেই। তাই বলিতেছি এই বুদ্ধিশুদ্ধিহীন পাগল যদি জ্ঞানের সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে কিন্তু জ্ঞানের কর্ত্তব্য পালন অসম্ভব নয়। পাগল যেমন করিয়াই হউক জ্ঞানকে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার কর্ত্তব্য দেবতার পায়ের তলে তাহাকে ফেলিয়া দিবে। জ্ঞান ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার গন্তব্য পথের সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে চাহিলে কি হইবে, এই পাগল যদি তার সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে সে যে তাহাকে আদৌ বুঝিবার অবসরই দিবে না। যতক্ষণ জ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে না পারিবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই ছাড়িবে না? বুদ্ধি শুদ্ধি নাই এবং বিচার-বিবেচনা কিছুই সে করে না বটে, কিন্তু অন্ধের ক্ষমতা যে অসীম!

জ্ঞান জানে, বিশ্বহিতসাধন তাহার কর্ত্তব্য। ইহাই তাহার প্রতি বিধাতার নির্দ্দেশ। এ কর্ত্তব্য বড় কঠোর! কিন্তু কঠোর হইলেও ইহা

পালন করিতেই হইবে। ইহা বিধাতার নির্দ্দেশ। ইহা যে তাহার আদেশ। ইহাই বুঝিয়া জ্ঞান চলিয়াছে। সে কর্ত্তব্য পালনে ইহাতে তাহার আনন্দ নাই। কর্ত্তব্যের জন্যই যে কর্ত্তব্য পালনে চলিয়াছে। শুষ্ক হৃদয়ে মলিন মুখে জ্ঞান চলিয়াছে, তাহার অতি কঠোর কর্ত্তব্য দেবতার পূজোপকরণ মাথায় লইয়া। ভাবনায় সে বিভোর হইয়াছে নানারূপ সন্দেহ দোলায় তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছে। একবার ভাবিতেছে পূজোপকরণ যথাযথ লইয়াছি ত? দেবতা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন ত? যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, এই পথেই কি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিব? হয় তো পথভুল হইয়াছে; ফিরিল! আবার অন্য পথ ধরিয়া নবোদ্যমে খুব দ্রুত কিছুদূর অগ্রসর হইল। আবার ভাবিতে বসিল এইরূপে আশার আলোকরশ্মি সম্মুখে দেখিয়া কখনও বা কিছুদূর ছুটিয়া যাইতেছে। আবার হয়তো বা কখনও নৈরাশ্যের অন্ধকারে পথ হারাইয়া আপন মনে ভাবিতেছে এ ভাবে সে কতদিনে যে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবে তা কে বলিবে! এমন বিচার-বিবেচনা করিতে করিতে জ্ঞানের যে অনন্ত কাল কাটিয়া যাইবে; তবে একা সে কেমন করিয়া এই বিশ্বহিতসাধন রূপ তাহার কর্ত্তব্য দেবতার মহাপূজা সার্থক করিবে!

কিন্তু পাগল প্রেম জ্ঞানের সঙ্গে থাকিলে, সে তাহাকে এমন ভাবে বসিয়া ভাবিতে দিবে না। পাগল তাহাকে একবারে, টানিয়া লইয়া যাইবে। অন্ধের কাছে আশার আলোকের শিখাও নাই, নৈরাশ্যের অন্ধকারও নাই। আশা-নৈরাশ্যের ধার সে ধারে না, ভাল মন্দের বিচারও সে করে না সুবিধা অসুবিধা কিম্বা লাভ ক্ষতির হিসাবও সে দেখে না, সুখ দুঃখের তোয়াক্কাও সে রাখে না, সে চলিয়াছে ত চলিয়াছে বারণ কর শুনিবে না, বাধা দেও মানিবে না, অসুবিধার কথা সহস্রবার বুঝাইতে যাও ভ্রুক্ষেপও করিবে না।

জ্ঞানের কর্ত্তব্য পূজার আয়োজন, আর প্রেমের কর্ত্তব্য পূজার। ভাবটা একবার তুলনা করিয়া দেখ, আয়োজন আর কি ছাই! পাগলের কোনই উদ্যোগ-আয়োজন নাই। পাগল দেখ বিরাম বিহীন ছুটিতেছে তাহার দেবতার উদ্দেশ্যে, দেখ দেখ, অন্ধের দৌড় দেখ। অন্ধ আশে পাশে পশ্চাতে কোন দিকেই চাহিতেছে না,চাহিয়া সে কি করিবে? সে যে কিছুই দেখিতে পাইবে না তাই সে বিরামবিহীন ছুটিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছিতে পারিবে, ততক্ষণ আর থামিবে না। দেখ দেখ তাহার অবস্থাটা একবার দেখ, আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যাইতেছে, তবু কাহারও সাহায্য চাহিবে না। চাহিবে কাহার কাছে? তাহার বাঞ্ছিত ছাড়া আর যে কেউ কোথাও আছে বা থাকিতে পারে, এ ধারণাই যে তাহার নাই তাই সে পড়িয়া গিয়া নিজেই উঠিতেছে উঠিয়া আবার তেমনি ছুটিতেছে নিজেকেও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পদে কত কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে, লক্ষ্যই নাই অবিরত ছুটিতেছে। এমনই করিয়া তাহার দেবতার চরণতলে যখন সে আছড়াইয়া পড়িবে তখন সে আর কোথাও যাইবে না কিছুই চাহিবেনা। তখন তাহার কর্ত্তব্য পালন শেষ হইবে।

বিশ্বহিতসাধন একমাত্র কর্ত্তব্য হইলেও জ্ঞানের কর্ত্তব্য পালন ও প্রেমের কর্ত্তব্য পালনে এইরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য দেখিয়া আমরা এখন কি বুঝিব? বিশ্বহিতসাধনরূপ মানবকর্ত্তব্য পালনে কে সমর্থ? মানবের মস্তিষ্কে অবস্থিত প্রদীপ্তচক্ষু জ্ঞান? না, মানবহৃদয়ের অন্ধ প্রেম?

শুধিতেছে ধার

আর যে সহিতে নারে
বিরহ তাহার।
প্রাণ মোর কাঁদিতেছে
করে হাহাকার॥

মানে না আঁখিটী মোর
ঢালে অশ্রুধার।
বুঝিবা নীরবে তার
শুধিতেছে ধার॥

শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার।

রামায়ণের কথা ও অশ্রুপূর্ব্বা বিবাহ—মহারাজ বাহাদুর সার ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কে, সি, আই, ইর পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত। ২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত অরবিন্দকৃষ্ণ দেবের নিকট পাওয়া যায়, মূল্য ১৲ মাত্র।

গ্রন্থখানি যে দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমষ্টি তাহা গ্রন্থের নামেই বোঝা যায়। প্রথম গ্রন্থখানি রামায়ণের কথা। ইহা পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থকারের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। নানাশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া গ্রন্থকার খুব সাবধানের সহিত রামায়ণসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরও একটী সুবিধা এই যেঁ, কোথা হইতে কোন প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাও প্রত্যেকটারই সূচী দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই মূল গ্রন্থের সহিত উদ্ধৃত অংশ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে লেখা। গ্রন্থকারও ভূমিকার মধ্যে বলিয়াছেন—"রামায়ণের কথা—ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্বপরীক্ষা। আমি কতকগুলি অনুবাদিত গ্রন্থ সাহায্যে রচনা করিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহারা অন্য গ্রন্থ হইতে উত্তরোত্তর আরও অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত তথ্য নিশ্চয় জানা যাইবে। বহু বিশ্বস্ত রাজার নাম ঋগ্বেদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। তাহাদের পৌরাণিক গল্প বাদ দিলে যথার্থই ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। ইহাতে আর এক উপকার হইবে, যাঁহারা এক্ষণে পুরাণাদি গ্রন্থকে বিবেচনা করেন ইহাতে কোন কাজের কথা নাই; তাহা পড়িয়া সময় নষ্ট করা মাত্র, তাঁহারা পড়িলে বুঝিবেন উহাতে ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে; যদিও বল্মিক আবৃত আছে। ইহা ব্যতীত নৈতিক সিদ্ধান্তের বিবৃতি অপর্য্যাপ্ত। জ্ঞানপূর্ণ প্রবাদ বাক্য সম্বন্ধে য়ুরোপ আমাদিগকে কিছু নূতন উপদেশ দিতে পারেন না, তবে সেই নৈতিক সিদ্ধান্ত পুরাণাদির নানাস্থানে ছড়ান রহিয়াছে। কতক দৃষ্টান্ত এই পুস্তকের অন্তর্ভূত করিয়াছি" গ্রন্থকার সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া মূলের প্রকৃত অনুবাদ

দিয়াছেন। কাজেই সাধারণ পাঠকেরও ভয়ের কারণ নাই। আমাদের মনে হয় গ্রন্থখানি একাধারে পাঠকের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের বিশেষ অনুকূল হইবে।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ বা বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এটীও আবার দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বিধবা বিবাহ এই শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেন অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ শব্দ গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া ভূমিকায় একস্থানে বলিয়াছেন—"প্রাচীন কালে গ্রন্থে "পরপূর্ব্বা" ও "অন্যপূর্ব্বা" প্রায় ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ বিরল হইয়াছে। তাহার ফলে উহাদের অর্থ প্রভেদ হইয়াছে। মনুসংহিতা, ৯।৭১, বাগ্‌দান কন্যাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করা বধূকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রকৃতি বোধ অভিধান ইহার অর্থ নির্দ্দেশ করেন, "যে কন্যার স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ হয়; দ্বিরূঢ়া পুনর্ভূ।" প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার বিধবা বিবাহ নিষেধের কাল ও কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের ১৯১০ সালে লিখিত "বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?" পুস্তকের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা। একথা গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। উভয়খণ্ডেই বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। লেখকের মত গ্রহণ করা না করা পাঠকগণের ইচ্ছা। তবে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর এরূপ সংযত তর্ক যুক্তি দেখাইয়া এ বিষয় লইয়া উদ্যম প্রকাশ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা। গ্রন্থকার নিজে আইনজ্ঞ কাজেই বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কোথায় কোন আইনের নজীর আছে তাহা দেখাইতেও বিরত হন নাই। পরিশিষ্টে কয়েকজন বিজ্ঞ বাঙ্গালীর মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা স্ত্রীজাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি কামনায় গ্রন্থকার অনেক কথাই বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের নারী সমাজের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার প্রয়াসী মাত্রেরই এ গ্রন্থে অনেক উপকার আসিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

গ্রন্থখানির ছাপা কাগজ বাঁধান কোনটীই অপ্রশংসনীয় নহে। এখন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইলেই ভাল।

* * * *

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা
ভক্তি
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা
চৈত্র | ১৩৩৫

শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব

(প্রাচীন)

ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি, শচী-অঙ্কাকাশে আসি,
গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
সে শশীর সহচর, ভক্ত-তারকানিকর,
চারিদিকে প্রকাশিত হয় ॥
পাপ ঘোর অন্ধকার, সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার,
বিধূদয়ে প্রস্থান করিল।
জীবের ভাগ্য কুমুদ, হেরি শশী মনোমদ,
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল ॥
পাপ অমানিশি ভোর, হরিষে ভক্ত-চকোর,
তুলিল আনন্দ কোলাহল।
প্রেম-কৌমুদীর সুধা, পিয়ে দূর কৈল ক্ষুধা,
সবাই হইল সুশীতল ॥
সে প্রেম সুধার কণা, পাঞা তৃপ্ত সর্ব্বজনা,
জীবকুল ভেল আনন্দিত।
আপন করম দোষে, না পাইয়া লবলেশে,
প্রেমদাস ধূলায় লুণ্ঠিত ॥

—*—

শ্রীশ্রীঅমিয়নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত।)

(২২)

এই লীলার উপসংহারে শ্রীল শিশির বাবু দুইটী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। উহা পরম উপাদেয় বোধে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"শ্রীভগবান এ অবতারে যখন জীবগণকে শুধু করুণায় উদ্ধার করিলেন, তখন চক্রের স্মরণ কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন জীব এরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করুণায় বশীভূত করা যায় না। শুধু করুণায় জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল না। মাধাই ভয় পাইয়া তবে আপনার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিল।

আর এক কথা এই, শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন দুই ভাইকে ফেলিয়া কেন চলিয়া আসিলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সেখানে অত্যন্ত লোকের ভীড় হয়। দ্বিতীয়তঃ, বল করিয়া বাড়ী পড়িয়া কাহাকেও উদ্ধার করা নিয়ম নয়। সে উদ্ধার ঠিক হয় না। নিয়ম এই যে, কৃপাপ্রার্থী জীব অনুগত হইয়া, কৃপা প্রার্থনা করিবে, তবেই তাহার হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা সজীব থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের চৈতন্য উদয় করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন, আর তাহারা আসিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। জগাই মাধাই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার হইয়া দেবতা হইলেন। পাপী মাধাই আজ নদীয়ার নর নারীর নিকট "মাধাই ব্রহ্মচারী" নামে অভিহিত। লোকে গৌর নিতাইর কার্য্য দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সকলে একবাক্যে বলিল,—

"নিমাই পণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস।
নষ্ট হৈব—যে তাঁরে করিব পরিহাস॥
এ দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর শক্তি ধরে॥

শ্রীনিতাই গৌর দুই ভাইর জয় জয় ধ্বনি, চারিদিকে শোনা যাইতে

লাগিল তাঁহাদের নিন্দুকের সংখ্যাও হ্রাস হইল। প্রাচীন পদে, তখনকার নদীয়াবাসিগণের মনের অবস্থা দেখুন—

"অবতার ভাল গৌরাঙ্গ, অবতার কৈলা ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চাঁদ নাচে সুরজ নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥" (শ্রীবাসুদেবঘোষ)
"গোরা চাদ মুখে করি বোলে।
জগাই মাধাই হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে॥
গোরা চাঁদের পরশ পাঞা।
জগাই মাধাই নাচে ভুজতুলি, ভাবেতে বিভোল হৈঞা॥"
(শ্রীঘনশ্যাম দাস)

আজু কি আনন্দ নদীয়া নগরে,
জগাই মাধাই দোঁহে দেখিবারে,
ধায় চারিদিকে কি নারী পুরুষ,
পরাপর কহে কত না কথা।
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া,
ঐ দেখ দেখ দুহু পানে চাইয়া,
সুরুজের সম তেজ এবে ভেল
সে পাপ শরীর গেল বা কোথা?"
"কেহ কহে কিবা গোরা মুখশশী
পানে চাহি জানি কত সুখে ভাসি,
হাসি সুধা পানে উন মত হৈয়া,
লোটাইয়া পড়ে চরণ তলে।
কেহ কহে দেখ নিতাই চাঁদেরে,
চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে,
দু'খানি চরণ পরশিয়া করে,
করে অভিষেক আঁখের জলে॥
(শ্রীনরহরি সরকার)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

প্রথমে বন্দিব আমি জগাই মাধাই।
পতিত পাবন নামের সাক্ষী দুইভাই॥

জলকেলি

জল-কেলি গোরা চাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল।
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে।
জল ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
ঢুলাঢুলি কোলাকুলি করে জনে জনে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরা গুণ গায়।

জগাই মাধাই উদ্ধার লীলার মধ্যে ঠাকুর বৃন্দাবন দাস, প্রভুগণের এক দিন কার জল-কেলি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

কীর্ত্তনান্তে প্রভু গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া, জল-কেলি করিতেছেন। প্রথমে হাত ধরা-ধরি করিয়া "কয়া কয়া" খেলা লইল। তাহার পর রীতি মত জলযুদ্ধ। পরস্পরে চোখে জল দিতেছেন। নিমাই আর গদাধরের জল যুদ্ধ হইতেছে। নিমাই জল দিয়া গদাইর আঁখি লাল করিয়া দিয়াছেন অতি ভাল মানুষ গদাই সহিয়া আছেন। নিমাইর চোখে জোরে জল দিতে পারিতেছেন না পাছে ব্যথা হয়। ওদিকে নিতাই ও অদ্বৈতে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। তখন সকলে জলযুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া তাহাদের এই প্রেম কোন্দল দেখিতে লাগিলেন। সে কোন্দল বড়ই মধুর—লোকে তাহা বড়ই আনন্দের সহিত উপভোগ করিত।

নিত্যানন্দের বাপের বয়সী অদ্বৈতের চক্ষে নিতাই নির্ঘাতে জল ফেলিয়া মারিল। তিনি আর চক্ষু মিলিতে পারেন না, একে বয়স পঁচাত্তর, তাহার উপর উপবাসে শুষ্ক শরীর, বলবান নিতায়ের সহিত তিনি পারিবেন কেন?

শ্রীঅদ্বৈত তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া নিতাইকে গালি দিতেছেন, বলিতেছেন "এ মাতাল কোথা হইতে আসিল, আমার একেবারে চক্ষু দুইটা কানা করিয়া দিল। আর শ্রীবাস পণ্ডিতের ত মূলেই জাতি নাই তাই এ

মাতালটাকে তাহার গৃহে স্থান দিয়াছে আর নিমাই চোরার ত কথাই নাই, সে ত ঐ মাতালের সঙ্গ ছাড়েই না।

প্রভু হাসিয়া মধ্যস্থ করিয়া দিলেন, একবার হার হইলে হার নহে, তিন বার হারাইতে পারিলেই তবেই ত হার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। শ্রীনিত্যানন্দে ও শ্রীঅদ্বৈতে আবার জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কাহাকেও হারাইতে পারেন না। অবশেষে নিতাই জয়ী হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের চক্ষে জলের আঘাত বড়ই লাগিয়াছে তিনি চোখ মেলিতে পারিতেছেন না। ক্রোধে বলিতেছেন "মাতাল—নিশ্চয়ই মাতাল, সন্ন্যাসী কখনও ব্রাহ্মণ বধ করিতে পারে না। জাত জন্মও জানে না, বাপ মায়ের খবরও কেহ রাখে না। পশ্চিমে বৃন্দাবনে লোকের ঘরে ঘরে ভাত খেয়ে বেড়িয়েছে এই মাত্র পরিচয় জানা আছে। এখানেও ত খাওয়া পরার বিচার দেখি না—লোকে বলে কিনা অবধূত।

শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ নিন্দা ছলে স্তুতি শুনিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ আপনগণ সহ হাসিতে লাগিলেন। নিতাইর হাস্য দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ সকলকে সংহার করিব। ভক্তগণ শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন আবার নিতাই ও অদ্বৈতে কোলাকুলি হইল। তাই শ্রীবৃন্দাবন দাস অদ্বৈত প্রভুর ক্রোধকে "আনন্দময়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি যতই ক্রুদ্ধ হউন না কেন তাহাতে অনাবিল আনন্দ স্রোতই প্রবাহিত হইত।

নিমাইর গঙ্গাসলিলে নিমজ্জন ও নিতাই কর্ত্তৃক উত্তোলন, নাটক অভিনয়, শ্রীঅদ্বৈতের দণ্ড, গৌরীদাসকে বৈঠা দান ও মুরারির অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন।

"ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী,
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়ে শ্যাম, মধুপুরে যাবে গো,
এমন কথা কভু শুনি নাই॥
হৃদয় মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো,
রতন পালঙ্ক বিছা আছে॥
অনুরাগের তুলি, তাহাতে বিছায়ে গো,
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥

তোমরা বল যে শ্যাম, মধুপুরে যাবে গো,
কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব,
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিতা চম্পকলতা,
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে, হরষ হইল গো,
ঘুচে গেল মাথুরের ভয় ॥"

নদীয়ায় এখন সঙ্কীর্ত্তনের বড় ঘটা। প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর প্রেম কিরূপ তাহা আপনি বিরহিণী রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া জীবকে সেই দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। আমরা উপযুক্ত অবসরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

নিতাইর দাস্য ভাব। তিনি সদা নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তনের সময় তাঁহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতেন। শুধু যে পতন হইতেই রক্ষা করিতেন তাহা নহে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন, এখন সেই কথাই বলিতেছি।

একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, আজি আমার নৃত্যকালে সুখ হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধে প্রেম হারাইলাম? আমার কি কোন কুলোকের সঙ্গ হইয়াছিল? তোমাদের নিকট যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে একটু প্রেম দাও, প্রেম বিহনে আমার প্রাণ যায়।

প্রভুর বাক্যে, ভক্তগণ দুঃখিত হইয়াছেন, কেবল শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ভাসমান হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীঅদ্বৈতের নিকট প্রেম ভিক্ষা করিলেন কিন্তু তিনি তখন প্রভুদত্ত প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে-ছেন এবং প্রভুর কথায় কি বলিতে এমন কিছু বলিয়া বসিলেন যাহাতে নিমাই শ্রীবাস আঙ্গিনার দ্বার খুলিয়া বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে গিয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। কেবলমাত্র নিতাই ও হরিদাস ইহা লক্ষ্য করিলেন। নিতাইর নয়ন গৌরের মুখ পদ্ম দর্শন ব্যতীত আর কোন দিকে যাইত না। তিনি সদাই গৌর-দর্শন সুখে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন।

নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে নিতাই ও তাহার অনতিবিলম্বে হরিদাস ঝাঁপ দিলেন। তাঁহারা একজন মস্তক ও অপরে চরণ ধরিয়া তাঁহাকে তীরে আনিলেন। তাঁহার চেতনা ছিল না। তিনি চেতন পাইয়া বলিলেন "কেন আমাকে উঠাইলে? আমার প্রেম শূন্য দেহ রাখিয়া কি ফল?" প্রভুর বাক্যে নিতাইর নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিতাইর দুঃখ দেখিয়া নিমাই নীরব হইয়া মাথা হেঁট করিলেন। তখন নিতাই ভরসা পাইয়া বলিলেন "প্রভু" তোমার সেবক গরব করিয়া তোমাকে যদি দুটা কথা বলে, তাহাতে কি তোমার তাহাকে প্রাণে মারা উচিত? তুমি তাহাকে অন্য দণ্ড দাও। নিমাই ইহাতে শান্ত হইয়া পরে শ্রীঅদ্বৈতকে প্রসাদ করিয়াছিলেন।

প্রভু গঙ্গায় নিমজ্জিত হইতে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—

"প্রেম শূন্য শরীর থুইয়া কি ফল?" কৃষ্ণ প্রেমহীন জীবন থাকা আর না থাকা দুইই সমান প্রভু এই লীলায় ইহাই শিক্ষা দিলেন।

অপর এক দিবস একজন মান্য-ব্রাহ্মণ-নারী তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীভগবান, আমাকে উদ্ধার কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভক্ত ভাব, তিনি একথা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি গঙ্গায় গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ভাবিলেন যখন মান্যা ব্রাহ্মণ নারী আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিল, এবং আমার পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন আর আমার প্রাণ রাখিয়া দরকার নাই। তিনি বিদ্যুৎ গতিতে ছুটীয়া গিয়া গঙ্গায় ঝম্প দিলেন। ঐদিবস তখন নিতাই ঘটনা স্থলে ছিলেন না। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

জলে মগ্ন হইল প্রভু না পাই দেখিতে।
সর্ব্ব নিজ জন ঝাঁপ দিলেন পশ্চাতে॥
পুত্র পুত্র বলি ধায় আই শচীমাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥
উন্মত্তা পাগলিনী শচী কাঁদে উভরায়।
হা-কান্দ কান্দনে কান্দে ভূমেতে লুটায়।
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৌত রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়।

জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে।

তখন চেতনা পাইয়া নিমাই নিতাইকে অভিমান ভরে বলিতেছেন শ্রীপাদ! তোমরা আমাকে কেন বাঁচাইলে, আমি কীটানুকীট। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কন্যা যখন আমাকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বোধন করিয়া আমার পদধূলি লইয়াছেন, তখন আমি আর এ কলুষিত দেহ রাখিব না। ভক্তগণ প্রভুর এই অপূর্ব্ব দাস্যভাব দেখিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন।

একদা নিমাই, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর খুদ কাড়িয়া খাইয়াছিলেন। প্রভুর পরম ভক্ত শুক্লাম্বরের মনে ইহাতে নিতান্ত ক্ষোভ ছিল। ইহাতে শ্রীনিমাই তাঁহার ক্ষোভদূর করিবার নিমিত্ত এক দিবস নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে ভোজন করেন। এই দিবস বিজয় আখরিয়া নিমাইর চিন্ময় বাহু দর্শন করিয়া বাহ্য হারাইয়া ছিলেন।

ইহার পর একদিবস নিমাই ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো একদিন অঙ্ক বাঁধিয়া সাজিয়া গুজিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করি। প্রভুর মাসির বাড়ী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বুদ্ধিমন্ত খাঁন ও সদাশিব কবিরাজ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, "আমি হবো রাধা, গদাধর হইবে ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ এবং শ্রীঅদ্বৈত হইবেন শ্রীকৃষ্ণ। আর যাহাকে যাহা করিতে কি বলিতে হইবে তাহা আপনি স্ফূরিত হইবে।"

চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে এই অভিনয় লীলা বর্ণিত আছে। দেবতারা স্বয়ং আসিয়া ভক্তদের শরীরে অধিষ্ঠান হইয়া এই লীলা করিয়াছিলেন। নিমাই আপনি রাধা এবং শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই লীলা যতটুকু এই মর জগতে দেখান যায় তাহা দেখান হইলে দেবতাগণ ভক্তদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আর তখন—

"নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
নৃত্য করে সবা মাঝে পরম আনন্দ।
যৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার।
অগ্নিতাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার।
অগ্নি ছড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ।
এই মত যোগমায়া ছাড়ি নিত্যানন্দ।

তাহার পর কিছুদিন অতীত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার শান্তিপুরের বাটীতে বসিয়া জ্ঞান পথের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিতেছেন। ইহাতে প্রভুর প্রচারিত ভক্তি পথকে হেয় করা হইতেছে। শ্রীঅদ্বৈতের উদ্দেশ্য লইয়া প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে অনেক বিচার আছে। শ্রীঅদ্বৈত জানেন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ যে শুধুই শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তি করেন তাহা নহে, তিনি বল পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধূলিও গ্রহণ করেন। অদ্বৈতের শ্রীমুখের বাক্য,—

"বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি।"

শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন, আমি জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া, প্রভুর ক্রোধের উদ্রেক করিয়া, তাঁহার দণ্ড গ্রহণ করিব। তখন আর তিনি আমাকে ভক্তি করিবেন না। আর তাঁহার দণ্ড পাইলেই আমি কৃতার্থ হইব। তিনি শিষ্যগণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইয়া ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

নিমাই এই সংবাদ পাইয়া, একদা শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "চল, শান্তিপুরে আচার্য্যের বাড়ী যাই।" নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তুত। পরদিবস প্রত্যুষে মাতাকে বলিয়া, উভয়ে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন।

পথে গঙ্গার ধারে ললিতপুর (নলেপুর) গ্রাম। গ্রামপ্রান্তে একটী কুটীর দেখিয়া প্রভু নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কাহার ঘর? নিতাই নাম প্রচারার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, তাঁহার জানা ছিল, বলিলেন, "ইহা একটী গৃহী সন্ন্যাসীর বাটী।" নিমাই বলিলেন "চল যাই, গৃহী সন্ন্যাসী কেমন দেখিয়া আসি।"

তখন উভয়ে সন্ন্যাসীর বাটী গেলেন। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী, তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী—"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সেই পরম তেজস্বী ও পরম সুন্দর নিমাই চাঁদ উঠিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমি এই সকল বিফল আশীর্ব্বাদ লইয়া কি করিব। যাহাতে আমি কৃষ্ণদাস হইতে পারি আপনি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন

তখনকার সেই কৃষ্ণভক্তি শূন্য জগতে থাকিয়া সন্ন্যাসী জানেন না যে, কৃষ্ণদাস হওয়া আবার কিরূপ আশীর্ব্বাদ। তিনি নিমাইর ভুবনমোহনরূপে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রাণের সহিতই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এখন নিমাইর তাহাতে আপত্তি শুনিয়া তিনি প্রাণে ব্যথা পাইলেন। তখন নিতাই ব্যাপার বুঝিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর, আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন দুঃখ করিতেছেন। আমি দেখিয়াই আপনার মহিমা বুঝিয়াছি। নিতাইর বাক্যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ঠাণ্ডা হইয়া বলিতেছেন, "যদি ভাগ্যক্রমে শুভাগমন হইয়াছে তবে আজ এখানে থাকা হউক।" নিতাই বলিলেন, আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, আমরা বড়ই ব্যস্ত আছি। যদি ইচ্ছা হয়, কিছু জলযোগ করাইতে পারেন।" নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন।

তখন কিছু আম কাঠাল ও দুগ্ধাদি দিয়া, তাঁহাদিগকে জল খাইতে দেওয়া হইল। ফলাহার শেষ হইলে, সন্ন্যাসী নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু "আনন্দ" আনিব কি? "আনন্দ" মানে মদ। নিতাই বিপদে পড়িলেন। বুঝিলেন সন্ন্যাসী বামাচারী। কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। এমন সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "অতিথিকে ব্যস্ত করা ভাল নয়, উহাদিগকে স্বচ্ছন্দে খাইতে দাও।"

নিমাই তখন নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ" কাহাকে বলে? নিতাই উহার অর্থ বলিলেন। নিমাই শুনিয়া "শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া আচমন করিয়া সন্ন্যাসী আসিবার পূর্ব্বেই ছুটীয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন *। নিতাইও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভয়েই সমান পটু। তখন দুই ভাই, স্রোতের অনুকূলে শান্তিপুরের পথে ভাসিয়া চলিলেন। দীর্ঘ পথ, একবারও ডাঙ্গায় উঠিলেন না। নিমাইর সহিত নিতাই যে কেন শান্তিপুর যাইতেছেন তাহা জানেন না। মধ্য পথে আসিয়া নিমাইর দেহে শ্রীভগবানের আবেশ হইল তিনি বলিলেন, "নাড়া, আবার জীবকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, আজ আমিও তাহাকে ভাল করিয়া জ্ঞান শিক্ষা দিব।" নিতাই তখন নিমাইর উদ্দেশ্য বুঝিলেন,

* মদ্যপের গৃহে গমন করা অন্যায়, গেলে গঙ্গাস্নান করা কর্ত্তব্য, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত কি নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন? (লেখক)

কি হয় জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন, কিছুই বলিলেন না, নিমাইর সহিত ভাসিয়া চলিলেন।

অদ্বৈত ভবনে পৌঁছিয়া, নিমাইর আবার ভগবান ভাব হইল। তিনি শ্রীঅদ্বৈতের চুল ধরিয়া কিলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। তিনি প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভুদ্বয়ের আগমনে অদ্বৈতভবনে উৎসব হইল। অদ্বৈত গৃহিণী সীতা দেবী পরম যত্নে প্রভুদ্বয়কে ভুঞ্জাইলেন। এরূপক্ষেত্রে খাইতেবসিলে নিতাই ও অদ্বৈতে প্রায়ই দ্বন্দ হইত, এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের অন্যথা হইল না। নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া অদ্বৈতের গায়ে দিলেন। অদ্বৈত প্রভু পরম সাত্ত্বিক, তিনি নিতাইর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, পারিধেয় বস্ত্রখানা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিছুকাল উভয়ে গালাগালি হইল, পরক্ষণে আবার উভয়ে মহানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। সে এক মধুর দৃশ্য!

অদ্বৈত প্রভুর প্রেমবন্দী হইয়া, দুই ভাই কয়েক দিন শান্তিপুরে রহিলেন। তাহার পর তাঁহারা নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। পথে হরিনদী গ্রাম। এইস্থানে প্রভুর শরীরে, আবার শ্রীভগবান প্রকাশ পাইলেন। তিনি ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়াই নৌকায় উঠিয়া, নিজ হাতে নৌকা বাহিয়া, নদী পার হইলেন।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা কালনা গ্রাম। সেখানে গৌরীদাস পণ্ডিত বাস করেন। ইঁহার পিতার নাম কংশারি মিশ্র, মাতার নাম কমলা দেবী। ইনি পরম বৈষ্ণব, শালিগ্রামে ইহার পূর্ব্ব বাস ভবন ছিল, গঙ্গাতীরে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়া তিনি শালিগ্রামের বাস উঠাইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

নিমাই সেই নৌকার বৈঠাখানি কাঁধে করিয়া, গৌরীদাসের গৃহে আসিলেন। গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখিতেছেন এক নবীন ব্রাহ্মণ কুমার তাঁহার গৃহে আসিতেছেন। আর আগন্তুকের রূপে চারিদিক আলো হইতেছে। গৌরীদাস একবার নিমাই ও নিতাইকে দেখিতেছেন, আবার নিতায়ের কাঁধের বৈঠা খানির পানে চাহিতেছেন। গৌরীদাস

চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন। নিমাই প্রথমে কথা বলিলেন। বলিলেন—

"— শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়।

এই স্থানে এই গৌরীদাসের আর একটু পরিচয় দিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি পরম বৈষ্ণব। ইহারা ছয় ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাঁহাদের নাম—"দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য।

কেবল গৌরীদাস কেন, ছয় ভ্রাতাই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তবে গৌরীদাসের একটু বিশেষত্ব ছিল—তাঁহার কৃষ্ণানুরাগের তুলনা মিলেনা। তিনি পূর্ব্বলীলার সেই সুবল সখা; তাঁহাতে শ্রীসুবলের আবেশ হইত। বর্ত্তমান লীলাতেও, নিতাইর সহিত তাঁহার বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহা আমরা স্ফুট হইতে স্ফুটতর রূপে দেখিতে পাইব, দয়াল নিতাই চাঁদের তিনি বিশেষ কৃপা পাত্র হন।

নিমাই গৌরীদাসকে বৈঠা খানি দিলেন, দিয়া বলিলেন "এখন এই বৈঠা খানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবগণকে ভবনদী পার কর।" তিনি দুই হাতে উহা ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কে? তুমি কি আমাদের সেই ভবপারের কাণ্ডারী?" প্রভু বলিলেন, "আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত।" গৌরীদাস পণ্ডিত, নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনিয়া ছিলেন, এখন বুঝিলেন তিনি কি বস্তু; বুঝিয়া তাঁহার পায়ে পড়িতে গেলেন, ভক্ত প্রিয় নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন। আর তিনি তাঁহার বক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিমাইর আলিঙ্গনে পণ্ডিত শক্তিমান হইলেন। তখন—

"গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোচ্ছাস ভক্তি।
কৃষ্ণ দিতে প্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি॥"

শ্রীনিমাই এই ভবনদী পারের জন্য গৌরীদাসকে আর একটী বস্তু দিয়াছিলেন—তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানি গীতা গ্রন্থ। এই শ্রীগীতাও বৈঠা অদ্যাপি অম্বিকার গৌরী দাস মন্দিরে আছে। ঠাকুর ঘনশ্যাম যথার্থই বলিয়াছেন—

"প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষ গীতা খানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কি কহিতে জানি।"

প্রিয় পাঠক! প্রভু কর্তৃক এই বৈঠা দানের কথা ভাবুন। গৌরীদাসের শিষ্য হৃদয় চৈতন্য, তাঁহার শিষ্য শ্যামানন্দ। এই শ্যামানন্দ সমগ্র উৎকল ভূমি নিতাই গৌরাঙ্গের প্রেমে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর নিমাই ও নিতাই, নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

মুরারি, প্রভুদ্বয়ের বড়ই প্রিয়, তিনি কয়েক দিবস বিচ্ছেদের পর তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরম আনন্দে প্রথমে নিমাইকে, পরে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। প্রভু ইহাতে হাসিয়া বলিলেন—মুরারি! বিপরীত ব্যবহার করিলে কেন? মুরারি বলিলেন—"তুমি যেমন চিত্তে লওয়াইলে।" ভাল পরে জানিতে পারিবে বলিয়া প্রভু অপরের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ দিন রাত্রে মুরারি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। "এ কর্মময় সংসার প্রান্তে শান্তির শ্বেত প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, ভক্তি নির্ঝরিণী শান্তি দায়িনী সেই জাহ্নবা বক্ষে এক শ্বেত শতদল ভাসিয়া উঠিল, সে শুভ্র শতদলোপরি অত্যুন্নত দেহ মহামল্ল নিত্যানন্দ! নিত্যানন্দ যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; মস্তকে নাগরাজের সহস্র ফণা বিস্তৃত থাকিয়া ছায়াদান করিতেছে—হাতে প্রকাণ্ড হল, মুষল শোভা পাইতেছে। দেখিতে দেখিতে মুরারি দেখিতে পাইলেন যে, আর নিত্যানন্দের সে মহিমান্বিত মূর্ত্তি নাই, সে মূর্ত্তি চকিতে যেন বলদেবরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। আরও দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে শ্যাম কান্তি কনিষ্ঠ শ্যাম সুন্দর। হাতে বিমোহন বেনু, মাথায় চিচিত্র চারু চূড়া। অনুভূত হইল, এই কৃষ্ণ চন্দ্রই তাঁহার গৌর সুন্দর। এই আশ্চর্য্য ভাব অবলোকন করিতে করিতে, স্বপ্নের সহিত মুরারির নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখেন যে প্রভাত হইয়াছে। মুরারির মনে, পূর্ব্বদিনের প্রভুর কথা জাগিল, তিনি অমনি প্রভুর বাড়ী আসিলেন। আজ আর অগ্রে তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না।

আজ মুরারি অন্য মনস্ক, মনে আনন্দ ও অন্যান্য ভাবের একত্র সমাবেশ। মুরারি অল্প অল্প হাসিতেছেন, সেই অবস্থায় অগ্রে আসিয়া নিত্যানন্দকে

প্রণাম করিলেন। কেন? মুরারির আজ আবার প্রণাম প্রণালীর পরিবর্ত্তন কেন? এই প্রশ্ন হইলে তিনি উচ্চারণ করিলেন—

"পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল কর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥" (চৈঃ ভাঃ)

ক্রমশঃ—

"গৌর"

এস হে নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র ন'দেতে ফিরিয়া একটীবার।
অভাবে তোমার বাংলা আঁধার হিন্দু ভুলেছে হিন্দুত্ব তার॥
শুষ্ক এবে সে মধু হরিনাম ভরে'ছিল যায় সারাটা দেশ।
পাপেতে পূর্ণ মনুজের মন নাহি আর ধর্ম্ম-ভাবের লেশ॥
তাহাদের মন পূর্ণ অধিকার করিয়াছে আজি দানবী ভাবে।
শুধু অনাচারী দনুজ মতে তাহারা তাদের জীবন জাপে॥
মাতৃ-পিতৃ ভক্তি ভুলিয়া তাহারা ফিরিছে সদাই অধর্ম্ম পথে।
ছার সে ধন ও সম্পদ লাগি ভায়ের বিবাদ ভায়ের সাথে॥
এস হে গৌর যুগ অবতার মাতাও তোমার ভারতে এবে।
সাধু উপদেশ করিয়া দান চালাও তাদেরে মহান ভাবে॥
শিখাও তাদেরে পিতৃ-মাতৃ ভক্তি সহোদর সহ সরল প্রীতি।
প্রদান তাদেরে ঈশ্বরে ভক্তি মধুর যুগল নামেতে মতি॥

শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ চৌধুরী।

তীর্থ চিন্তা

(পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা লিখিত।)

তীর্থ এখন বন্দরে পরিণত।—পরশুরাম তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, বলরাম তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এবং দেবর্ষি নারদ, মহামুনি ব্যাস, মহর্ষি বশিষ্ট প্রভৃতি সকলেই তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তখন তীর্থ সকল যে ভাবে আস্থত ছিল, যে ভাবে তীর্থে যাইয়া জ্ঞান ভক্তি লাভ করা যাইত এখন তাহা নাই। তখন তীর্থস্থানে মানুষ কেবল ধর্ম্ম সাধনের জন্য গমন করিত। যখন সংসার ধর্ম্ম শেষ করিয়া ইহসুখে বীতস্পৃহ হইত, যখন আশীবৎসর বয়ক্রম হইত, তখন পুণ্যক্ষেত্রে দেহাবসান করিতে গমন করিত। তখন সকল লোকের তীর্থে বিশ্বাস ও ভয় ছিল এবং তীর্থকে মুক্তিস্থান জ্ঞান করিত। পাছে তীর্থে বসিয়া একটা মিথ্যা কথা বলিতে হয়, এই ভয়ে তীর্থে তিনদিনের বেশী কেহ বাস করিত না। ঘরে বসিয়া সংসার তাড়নে নানারূপ পাপ করিলে তীর্থে যাইয়া তাহার মুক্তি আছে, কিন্তু তীর্থে বসিয়া পাপ করিলে সে পাপের আর ক্ষমা নাই, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তীর্থবাসিগণ তাই দেবতাস্থানীয় ছিলেন; তাই তীর্থ স্থান জ্ঞান ভক্তি লাভের প্রধান সহায় ছিল।

কিন্তু কালে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত, আত্মকর্ম্মরত, কলহশূন্য মহাপুরুষগণের মধ্যে সমাজচ্যুত নিন্দিতকর্ম্মরত দুরাচার দল আত্মরক্ষার জন্য প্রথম আসিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পবিত্র ক্ষেত্রে দুর্জ্জন আসিয়া তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল, দেখিয়াও কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না। রাজা তখন সদসৎ বিচারে অলস ছিলেন।; জমীদার টাকা পাইলেই জমী বন্দোবস্ত করিয়া প্রজারপত্তন আরম্ভ করিলেন—তীর্থ তাঁহার লাভের সম্পত্তি হইল। এইরূপে যত কুলটা স্ত্রীলোক সমাজে গ্লানি সহ্য করিতেছিল, তাহারা নিষ্কণ্টকে ইন্দ্রিয় ভোগের নিমিত্ত আপন আপন উপপতিকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ বাসিনী হইল। মৃত পতির উপার্জ্জিত অর্থে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উপপতি লইয়া বাস

করিতে লাগিল। উপপতির নাম সন্ন্যাসী বা বৈরাগী ঠাকুর রাখিয়া আপনি তাহার ভৈরবী বা সেবাদাসী হইল। লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সাধু সাধ্বী সাজিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে সাধু সজ্জন অপেক্ষা অসৎ অসতীর সংখ্যা তীর্থে অধিক হইল দেখিয়া জন সাধারণের তীর্থ নামে বিপরীত ধারণা হইল। অনেকে তীর্থকে মুক্তিস্থান না বলিয়া অসৎ ও কুলটার আশ্রয় স্থান বলিয়া উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। দুর্জ্জনেরা দুর্ব্বাসনা পূর্ণ করিতে তীর্থকেই সুযোগ্য স্থান বোধ করিয়া দলে দলে তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।

তীর্থ স্থান শ্মশানের বিভীষিকায় বিভীষিকাময় হইল। তাহার প্রতি-বিধানে কেহ অগ্রসর হইল না। সুপরিস্কৃত কর্ষিত ক্ষেত্র কণ্টকারীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল কোনও কৃষক তাহাতে লাঙ্গল দিল না।

যাহারা বৈষ্ণব মণ্ডলের শিরোভূষণ,সেই সকল ভাগবত পুরুষেরা ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া, এক প্রান্তে যাইয়া, নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে কাশী প্রভৃতি তীর্থের জ্ঞানময় নির্ব্বিকার গুরুগণ গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া জাগতিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। সাধনাসনে বিভীষিকার উৎপাৎ দেখিয়া আত্মরক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন।

তীর্থ যোগের স্থান না হইয়া ভোগের স্থান হইল। ভোগের দেশে দোকান বসিল। ভোগ্য বস্তুর আমদানী আরম্ভ হইল। সেই সকল সস্তাদরে ক্রয় করিতে সহরের খরিদ্দার তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইল। তীর্থ বন্দরে পরিণত হইল। অর্থ উপার্জ্জনের স্থান হইল। যেরূপে যে পারিল, অর্থাগমের একটা সুবিধা করিয়া লইল।

সাধুর আশ্রম বা আখেড়া হোটেলে পরিণত হইল। গোঁসাইবাড়ী ও ঠাকুর মন্দির প্রসাদ ক্রয়ের দোকান হইল। নানা প্রকারে ভঙ্গী করিয়া ভণ্ডের দল মহাপুরুষ সাজিয়া বসিল। নির্ব্বোধ যাত্রী তাহাদিগের কৌশলে বিমূঢ় হইয়া তাহাদিগকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিতে লাগিল ও কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ তাহাদিগের সেবায় প্রদান করিতে লাগিল। এই সব ভণ্ডের অনেক আড়কাঠি জুটিতে লাগিল। যাত্রীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে লাগিল, শেষে তাহা অংশ করিয়া লইতে লাগিল। সাধারণ গণ্ডগ্রামে যে সকল ছল চাতুরীর নাম গন্ধও নাই পবিত্রকারী তীর্থে সে সকল নানা প্রকারে নানা আকারে উৎপন্ন হইতে লাগিল।

তীর্থ ব্যবসার স্থান হইল। ধর্ম্মকথার ব্যবসা, শাস্ত্র পাঠের ব্যবসা, সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবসা, কথকতার ব্যবসা এবং ধর্ম্মবক্তৃতার ব্যবসা আরম্ভ হইল। ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা প্রথমতঃ তীর্থস্থান হইতেই আরম্ভ হইল। পরে নগরে ও গ্রামে বরষার প্রবাহের মত প্রবাহিত হইল।

সরলতা ও সত্যবাদিতা, যাহা সাধনার প্রধান অঙ্গ, তাহা উন্মাদের লক্ষণ হইল। যদি কেহ সত্য কথা বলিল, সরল ভাবে আত্মপর সংবাদ প্রকাশ করিল, ভণ্ডের দল তাহাকে উন্মাদ বলিয়া প্রমাণ করিল; অথবা তাহাকে লাঞ্ছিত করিতে, মিথ্যা বাক্যে তাহার কলঙ্ক রটাইতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুর দর্শনে ভেটের অত্যাচার। পৃথিবীতে যত জাতি আছে, সকলেরই তীর্থ ও দেবতা আছে। প্রতিমা পূজা কেবল হিন্দু জাতির মধ্যে বিদ্যমান। অন্যান্য জাতির ভজন মন্দিরে প্রতিমা নাই। কিন্তু উপাসনা আছে। সেই তীর্থ ও মন্দির দর্শন করিতে দলে দলে যাত্রী গমন করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের উপাসনা মন্দির বা ঠাকুর গৃহ দর্শন করিতে যে ভাবে জরিমানা দিতে হয় অথবা সেবাইতদের পুত্র পরিবারের বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহের চাঁদা দিতে হয়, সে ভাবে আর কোথাও কোন জাতিকে কিছু দিতে হয় না। আজ জেরুজেলেমের গির্জ্জায় জর্ম্মান সম্রাট কৈশর অথবা ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যেস্থানে বসিয়া উপাসনা করেন, অথবা আর্চ বিশপ যেস্থানে বসিয়া প্রার্থনা করেন, সেইস্থানে অতিশয় দীন দুঃখী একজন সাধারণ খৃষ্টান বিনা ভেটে প্রবেশ করিতে পারে। আজ মক্কার মন্দিরে যেস্থানে বসিয়া, তুর্কীর সুলতান নামাজ করিয়া থাকেন, একজন নগণ্য ফকীর সে স্থানে প্রবেশ করিতে কোনও ভেটের উৎপাত সহ্য করে না। দেব মন্দির বা উপাসনা মন্দির তুলিয়া অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসা হিন্দুদেশের মত অন্য কোনও দেশে নাই। অথবা আমাদের মত ব্যবসা করিবার নিমিত্ত, দেবমন্দির গঠন বা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা অন্য কোনও দেশের লোকে করে না।

আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গর্ব্ব করি, আমরা সুনির্ম্মল ধর্ম্মমতে দীক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, আমাদের ধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্ম, বৈরাগ্যের ধর্ম্ম, জ্ঞান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম বলিয়া আমরা বড়াই করি, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্য কলাপ বিচার করিলে, আমাদের বিষয় লালসা ও ভোগাশক্তিকে সাক্ষ্য মান্য করিলে আমাদের ধর্ম্ম ঠকের ধর্ম্ম এবং আমাদের তীর্থ স্থান ব্যবসার বন্দর, ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

এখন হিন্দু সমাজের শাসক নাই, অভিভাবক নাই, গুরু নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে। এবং লোক ডাকিয়া তাহাই প্রচার করে। উচ্ছৃঙ্খলতায় হিন্দুর সংসার পরিপূর্ণ। সরল বিশ্বাসী, ধর্ম্মভীরু, সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগকে ভুলাইবার অসংখ্য উপায় আবিস্কৃত হইয়াছে। পরকীয়া সাধনের নামে পতিব্রতা কুললক্ষ্মীকে কুলটায় পরিণত করিতে নানারূপ মধুর আলাপের সৃষ্টি হইয়াছে।

হিন্দু জাতির তীর্থ ও দেবতা প্রাণাধিক সামগ্রী। এ জাতি যতদিন নির্ম্মূল না হইবে ততদিন ইহার তীর্থ ও দেবার্চ্চনা বিদ্যমান থাকিবে। সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া হিন্দু নরনারী তীর্থপর্য্যটনে গমন করিবে, এবং তীর্থস্থানের ও তীর্থবাসী সাধুর সংস্কার সাধিত না হইলে দুর্জ্জন অর্থলোলুপ তীর্থপাণ্ডা ও ভণ্ডের হস্তে বিড়ম্বিত হইতে থাকিবে। তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না।

তীর্থ ও সাধু সংস্কার কর্ত্তৃত্ব জনসাধারণের হাতে।—সাধারণ কথায় বলা হয় "জন্তু ও পরকে আহার না দিলেই তাহারা চলিয়া যায়।" আমরা সাধুসেবা করিবার সময় যদি একটু ধীর ভাবে সাধুর যোগ্যতা বিচার করিয়া সেবা করি, তাহা হইলে অনেক সাধু পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আপন আপন জাতীয় ব্যবসায় নিযুক্ত হয়। সাধুর সাধুত্ব বিচার করিতে সকলেই অধিকারী নহে এবং সকলেই বিচারের অবসরও প্রাপ্ত হয় না, এ কথা প্রতিবাদ যোগ্য না হইলেও সাধুদের রক্ষকই যে তাহাদের সংস্কারক হইতে একমাত্র অধিকারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্রতা না থাকিলে কেহ সাধু পদ বাচ্য হয় না। এবং যাহার গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সরলতাময় নহে সে সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র হয় না। অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা মাত্র এই দুই তিনটী বিষয় যদি লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকি তাহা হইলে আমরা অনেক বিড়ম্বনার হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি।

যে রমণীসঙ্গকে শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই একবাক্যে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, সেই রমণীসঙ্গী সাধুকে আমরা সাধু বলিয়া কি জন্য সেবা করি? যখনি কোন সাধুর সঙ্গে সেবাদাসী বা ভৈরবী দর্শন করিব, তখনি তাঁহার বিশেষ কোন অন্য গুণের পরিচয় না পাইলে, আমরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইব। যে আশ্রমে সাধু পরমাসুন্দরী

যুবতী সেবাদাসী বা ভৈরবীর সঙ্গে দুগ্ধফেননিভ পালঙ্ক শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন, তাহাকে বিলাস মন্দির না বলিয়া আশ্রমের সম্মান কেন প্রদান করিব? এরূপ সাধুকে আমার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ কেন প্রদান করিব? এবং এরূপ সাধু সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে কেনই বা না উপদেশ দিব?

স্বর্ণকারের দোকানে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইলে সে কষ্টি পাথর বাহির করিয়া তাহা পরীক্ষা করে পরে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করে। আমাদের ঘরেও সাধু পরীক্ষার কষ্টি পাথর আছে। আমরা রূপ সনাতন, দাস রঘুনাথের ন্যায় বৈরাগীর দেশে বাস করি। আমাদের সম্মুখে যিনি বৈরাগী সাজিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, আমরা তাঁহাকে সেই পুরাতন আদর্শে বিচার করিব। তাঁহাদের পরিচ্ছদ দীন হীন কাঙ্গালের মত ছিল। তাঁহারা যোষিৎসঙ্গকে—দুর্গন্ধময় প্রাণনাশক ঘৃণিত বিষ বলিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা নিঃসঙ্গ হইয়া শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের তত্ত্বকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আর নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া জগৎ-কল্যাণকর গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা এখন সেই আদর্শে বৈষ্ণব সাধক দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তাই বৈরাগীর সংসার-বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের আদর্শে গঠিত কিনা, তাহার উদ্দেশ্য মহৎ কি না তাহা সম্যক্ প্রকারে আলোচনা করিব। সে আলোচনায় যদি তিনি অযোগ্য হন, তবে তাঁহাকে গোয়ালন্দের ঘাটে চাকুরী অন্বেষণে অনুরোধ করিতে পারি কি না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

যিনি বৈরাগী হইয়া রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে অর্থ সংগ্রহ করেন, সেবাদাসীকুলে পরিসেবিত হন, অথবা হোটেলের ব্যবসা করেন, তাঁহাকে রূপ সনাতনের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিলে, তাঁহার সংশ্রব পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে শাক্ত সাধকেরও দৃষ্টান্ত আছে। সকলেই ত্যাগীর শিরোমণি। যিনি স্বামিজী হইবেন তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামী ভাস্করানন্দস্বামী বা বিশুদ্ধানন্দস্বামী হইবেন। তাঁহাদের আশ্রমে ত ভৈরবীর দঙ্গল ছিল না? সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের স্বামীগণের আশ্রমে ভৈরবী দেখিলে সম্মান করিতে কেন অগ্রসর হইব?

একস্থানে একই সময়ে দুইটী বস্তু অবস্থান করিতে পারে না, ইহা

বৈজ্ঞানিক সত্য। যে মনে দালান কোঠা গড়িবার বাসনা, লোক প্রতিষ্ঠার বাসনা, সেবাদাসী বা ভৈরবীর বাসনা, উত্তম পান, ভোজন, শয়নের বাসনা, সে মনে বৈরাগ্যজনক ভাবভক্তির অবস্থিতি কখনও সম্ভব হয় না। যদি কখনও কোন বিষয়-পিপাসুকে ধর্ম্মকথার মধ্যে ভাবোন্মত্ত হইতে দর্শন করি, তাহা বালির সরবতের মত বিবেচনা করি। বালির সরবত যখন ঢালা-ঢালী করা যায় তখন জলের সঙ্গে বালি মিশ্রিত হয়, কিন্তু দুই মিনিট রাখিয়া দিলে বালি পাত্রের তলায় পড়িয়া যায়, জল অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়া উপরে অবস্থান করে। ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যখন সাধুসজ্জনের সভায় ধর্ম্মভাবে বিভোর হয়, তখন তাহা কেবল সাময়িক আবেগের ঢালাঢালির ফল। যখন সেস্থান পরিত্যাগ করে, তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি উদরের সর্ব্বনিম্ন তলায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, এবং বিষয়বুদ্ধিরূপ জল অধিকতর নির্ম্মল হইয়া উপরে উত্থিত হয়। ধর্ম্ম ও সম্পদের সাধনা একসঙ্গে করা যায় না। তাই বলিতে ছিলাম, যে দৈহিক সুখ সাচ্ছন্দের জন্য ব্যাকুল সে ধর্ম্মসাধনার সাধক নহে। তাহার সঙ্গ করিলে সাধুসঙ্গ হয় না, অথবা তাহার সেবায় সাধুসেবা হয় না এইরূপই আমার বিশ্বাস। ক্রমশঃ

দীনশরণ।

দীন আমি, অতি হীন আমি, কথা এটা ত মিথ্যা নয়।
কত দুঃখে ভরা আমার হৃদয়, তাও জানি সমুদয়।
সংসারে এসে কত দুঃখ তাপ সহিতেছি নিশিদিন,
পথ ভোলা আমি পান্থ এ ভবে ঘুরিয়া বিরামহীন।
শুধু ঘুরে মরি ভব সংসারে, পাহনা পথের দেখা,
পথহারা আমি ভ্রান্ত পথিক বিপথে পড়িয়া একা।
এ যে গো সকলি সত্য, আহা মিথ্যা ত কিছু নয়।
আমিও এ কথা আপনার মনে মেনে লই অতিশয়।

শুধু তাই নয়,—আমার দুঃখের আরও ত অনেক আছে।
সংসারে আমি শুধু অপমান পেয়েছি সবার কাছে।
কত অপমান আর লাঞ্ছনা হায় আমি এই ল'য়ে,
চলিয়াছি এই ভবসংসারে সব চেয়ে নীচ হ'য়ে।
জানি জানি তাহা, সর্ব্বদা জানি,—আমি কত দীনহীন,
মরমের মাঝে রেখেছি গাঁথিয়া ভুলি নাই কোনদিন।
মানি তাহা,—এই ভবে যে আমার কোনই মূল্য নাই।
বায়ু-বিতাড়িত শুষ্ক পত্র সম আমি উড়ে যাই।
ধূলিকণা যথা পথে ঘাটে সদা অনাদরে প'ড়ে রয়,
আমিও তেমনি তুচ্ছ ঘৃণ্য জানি তা সুনিশ্চয়।
আমার দীনতা, আমার হীনতা, লাঞ্ছনা অপমান,
এই ল'য়ে আমি সংসার মাঝে হ'য়ে থাকি ম্রিয়মান্।
সত্যই আমি সংসার ঘাটে আসিয়া লেগেছি যেন,
জঞ্জাল এক,—স্রোতে ভাসমান শৈলবাল ঠিক হেন।
দুই পায়ে ক'রে দূরে ঠেলে দিতে আমারে সবাই চায়।
এমনি ঘৃণ্য এমনি তুচ্ছ, সংসারে আমি হায়,
এত দীনহীন ঘৃণ্য হয়েও দুঃখ আমার নাই।
দীনতার মাঝে, দুঃখের মাঝে এক সান্ত্বনা পাই,
সেই সান্ত্বনা আর কিছু নয়—শুধু তব শ্রীচরণ।
কারণ তাহার,—দীন আমি, আর, তুমি যে **দীনশরণ।**

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আধুনিক সাহিত্যে ভগবদ্ভক্তির উপকরণ

আমি দাশরথির "পাঁচালী" হইতে ভক্তির উপকরণ সংগ্রহ করিতে যাইয়া বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছি। আধুনিক সাহিত্যেও যে ভক্তিপ্রসঙ্গ একবারে বিরল এ কথা বলিবার যো নাই। বস্তুতঃ অনুসন্ধিৎসু হইলে, আধুনিক লেখকগণের প্রবন্ধাদিতেও যথেষ্ট ভক্তির উপকরণ পরিদৃষ্ট হয়। আমি অদ্য পাঠকগণকে এইরূপ কয়েকটী প্রবন্ধের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমার কথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। কোন কোন প্রবন্ধের লেখক আমার অজ্ঞাত। তথাপি তাঁহাদের প্রবন্ধ-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া আমি পাঠক ও পাঠিকাবর্গের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ সকল হইতে কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভরসা করি ইহাতে উক্ত প্রবন্ধ লেখকগণের কীর্ত্তি ও গৌরব অধিকতর পরিস্ফুট ও সমুজ্জ্বল হইবে।

নিম্নে প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে সহৃদয় পাঠক ও সহৃদয়া পাঠিকাগণ সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্ত্বা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন—

"বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে হরি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। বিশ্বাস চক্ষু তাহা দর্শন করে। এই চরাচরে যাহাতে শ্রীভগবান নাই, বীজরূপে ভগবানের সত্ত্বা যে বস্তুতে নাই তাহা জগতে থাকিতে পারে না। বাস্তবিক কল্পনাবলেও ঈশ্বরের শক্তি বিবর্জ্জিত কোন বস্তুর সত্ত্বা মনে ধারণা করা যায় না। যাহাতে ভগবান নাই এমন কোন বস্তুই নাই। পূতিগন্ধ পরিপূরিত ঘৃণাকারজনক স্থানাবস্থিত ক্রিমি হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর, জ্ঞান সম্পদ সম্পন্ন মহর্ষি পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক শ্রীভগবানের বিদ্যমানতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে। সাগর তীরস্থিত বেলাভূমির

অসংখ্য বালুকাকণা হইতে চির তুহিন সমাচ্ছন্ন অভ্রভেদী হিমাদ্রি পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই সেই মহামহিমময় মহেশ্বরের আস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিদৃশ্যমান হইতেছে। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত চেতনাচেতন কোন বস্তু ক্ষণকালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি আছেন বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্য নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, অগণ্য হীরকখণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়া রজনী শোভা ছড়াইতেছে; বিশাল সাগরোর্ম্মি সৈকত ভূমিতে নৃত্য করিতেছে; নির্ঝরিণী শৈলবক্ষ বিদারণ করিয়া কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে; এবং দেব ও দানব, তির্য্যক ও ঔরগ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে বিনিযুক্ত রহিয়াছে। বীজরূপে ভগবান শ্রীহরি সকলেরই মূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং সকলকেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি এক হইলেও অসংখ্য, নিরাকার হইলেও বহু আকার সম্পন্ন এবং নিষ্ক্রিয় হইলেও বহুতর ক্রীয়াশীল। (লেখক অজ্ঞাত)

অতি ক্ষিপ্র হস্তে অঙ্কিত নিম্নে প্রদর্শিত দুইটী চিত্রে এইবার ভগবান নন্দনন্দন এবং দেবাদিদেব মহাদেবের স্বরূপচিত্র দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হউন—

"যে সচ্চিদানন্দ শ্রীগোবিন্দের বদনারবিন্দ হইতে গীতারূপ মকরন্দ স্যন্দিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ংই নিজ শ্রীমুখবর্ণিত নির্লিপ্ততার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। ভোগ মধ্যে অলৌকিক সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেই জ্বলন্তভাবে পরিদৃশ্যমান। জন্মকাল হইতে লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থায় ভগবান নন্দনন্দন অত্যদ্ভুত নির্লিপ্ততার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চিন্তাশীলতার সহিত যিনিই শ্রীকৃষ্ণলীলা অনুধাবন করিবেন তিনিই এই তত্ত্বের গূঢ়রহস্য উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এইরূপ আর এক পরম দেবতার মহচ্চরিত্র দেবতাদিগেরও আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যেরূপ ভোগে সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান ভূতভাবন মহাদেবের চরিত্রে

সেইরূপ সন্ন্যাসে ভোগ, নির্লিপ্ততায় লিপ্ততা এবং অনাসক্তিতে আসক্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয় দৃষ্টান্তই অনুরূপ। ভোগের পথ দিয়া অনাসক্তি এবং অনাসক্তির পথ দিয়া ভোগ, ফলতঃ দুইই একই কথা।

মহাদেবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী, সৌভাগ্যবান, দেবগণের মধ্যে আর কে আছেন? তথাপি মহাদেব ভিক্ষোপজীবি, ভস্ম প্রলিপ্ত কলেবর বিল্বতরু-তল নিবাসী, ব্যাঘ্রাম্বর পরিহিত এবং বৃষভারূঢ়। আর নির্লিপ্ততার পরিচয় তাঁহার যোগচর্য্যায়ঃ সেই বিভুতি বিলেপিতকায়, মহাপুরুষের বাম অঙ্কে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, সর্ব্বশোভাময়ী, স্থিরযৌবনা, জগন্মাতা আসীনা। বিশ্বেশ্বরের বাম হস্ত সেই প্রেমময়ী বিশ্বজননীর কণ্ঠে বেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায়, সেই অনাদি পুরুষ বাহ্যজ্ঞানবিরহিত যোগমগ্ন! সমাধিস্থ! সন্ন্যাসে ভোগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত!!" (৺দামোদর মুখোপাধ্যায়।)

জগন্মাতাকে স্মরণ করিয়া জগন্মাতার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাই —ভক্তের সহিত একবাক্যে শরৎসুন্দরী মাকে আবাহন করি:—"এস মা আনন্দময়ী! আমার হৃদয়ে আসিয়া বস। ঐ দেখ মা! শরতের আকাশ নির্ম্মল নিলাবভাবিকাশ করিতেছে, তোমার নীলনয়নের মনোহর দ্যুতি উহার অনন্ত নীলিমায় যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ মা! শরতের উষা যেন নির্ম্মোকমুক্ত সর্প বিস্তারের অনুকরণ করিয়া ভাস্করের কোটি তনুরুচিকে অনন্ত আকাশের কোলে ছুটাইতেছে। ঐ দেখ মা! অপ-সারিতসলিলা—সারদাবর্ষণ শীর্ণা নদীর গর্ভে পেলবকর্দ্দম বিস্তারের উপর, কাশকুসুমের শুভ্র বিকাশ শোভা পাইতেছে—যেন বর্ষাদেবী বার্দ্ধক্যের পলিত কেশ বিকীর্ণ করিয়া অরুণ কিরণের তাপ সহিতেছেন। আবার ঐ দেখ মা! পল্বল তড়াগে বাপীবক্ষে, নীলজলের উপর কুমুদ কহ্লারের রূপশোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে; যেন জলদেবী তাম্বুলরাগ রঞ্জিত সোহাগের

অধর ফুলাইয়া মেঘমুক্ত তপনদেবের সহিত ব্যঙ্গ করিতেছেন। ঐ দেখ মা! শরতের চন্দ্র নীল আকাশের কোণে ভাসিয়া, বিগলিত রজতধারা-স্রাবে মেদিনীবক্ষকে, জলস্থলকে শুভ্রাবরণে আবৃত করিতেছেন। আবার শরতের সূর্য্য যেন ইন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উষার মুখে অলক্তক ছিটাইতেছেন—ধরাবক্ষে বিগলিত হেমদ্যুতি বিছাইয়া দিতেছেন। যেন তাহাতেও সাধ মিটিতেছে না, তাই যাইবার সময়ে প্রদোষসুন্দরীর যুগল কপোলে সপ্তবর্ণের কোটি ইন্দ্র ধনু আঁকিয়া দিয়া যাইতেছেন। এমন নির্ম্মলরূপের খেলা, আর কোন ঋতুতে ত ঘটে না? এমন আলো ও ছায়ার আদান প্রদান, এমন নানাবর্ণের সম্প্রসারণ ও সংহরণ আর ত কোন কালে হয় না? এই সময়ে এস মা, রূপময়ি! লাবণ্যময়ি! কারুণ্যময়ি মা আমার, হৃদয় আকাশ জোড়া করিয়া আসিয়া বস মা!"

(৺পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।)

ঐ বুঝি মা আমার আসিলেন, তাই প্রাণ ভরিয়া মায়ের রূপ দর্শন করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি। এই যে মা আমার—

"সিংহবাহিনী, মহাবল মহিষাসুরমর্দ্দিনী, দশকরে দশ আয়ুধ-ধারিণী, গৌরবর্ণা, ত্রিনেত্রা, প্রসন্নবদনা, দিব্যবস্ত্র পরিহিতা, দিব্য-অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং রত্নকল্লোজ্জ্বল মুকুট সুশোভনা—মহামূর্ত্তি। দুই পার্শ্বে কমলে—কমলাসনা ধনদা এবং জ্ঞানদা। দক্ষিণে যোগাসনে লম্বোদর গণপতি এবং বামে শিখিপৃষ্ঠ সমারূঢ় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ, সুরসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। এই মহামূর্ত্তি সম্মুখে ঘটসন্নিধানে বিল্বপত্র রাশি, জবারাশি, কমলরাশি, এবং অন্যান্য কুসুমরাশি; উভয় পার্শ্বে নৈবেদ্যের নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রী ও তৈজসাদি স্তূপীকৃত। নবপত্রিকার স্নান হইয়াছে, আনুসঙ্গিক বাদ্যোদ্যম নীরব হইয়াছে, পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন, তন্ত্রধারক মন্ত্র বলিতেছেন —আমি মাকে প্রণাম করিয়া বলি—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

দুর্গোৎসব শেষ হইল। গৃহদ্বার আঁধার করিয়া মা আমার চলিয়া গেলেন। কিন্তু বালকের প্রাণ ত বুঝে না; দশভুজা মাকে না দেখিতে পাইয়া শ্যামা মার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাই ভক্তের সঙ্গে আবার এক বাক্য বলি :—

"ঐ শুন শুন ভীমে!—বিহঙ্গ কলকুজন, একবার তোমার গৃধিনী-শ্রবণযুগল পাতিয়া শ্রবণ কর। তাহাদের রবে প্রভাতসমীর স্তব্ধ, গগন কোটিঝঙ্কারে মুখর—তুমি একবার শুন। শঙ্করি! একবার শুন। দ্বিরেফমালা পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া গুন গুন গুঞ্জন রবে কি সোহাগের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে—কোন্ রাজার অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছে। শুন মা! অর্দ্ধোদয় কাল হইতে উষার মৃদুতাহ্লাদ প্রকটক্ষণ পর্য্যন্ত সেফালি সখীসকল কেমন নিঃশব্দে গীত গাহিতে গাহিতে অধোমুখী হইয়া ধরা-বক্ষকে চুম্বন করিতেছে। কাহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য ফুল্লমুখী সেফালীর এত ব্যস্ততা? শুন মা! নীরস কেতকী কুসুমের কাছে যাইয়া ভ্রমর কুল কি মর্ম্মভেদী বিষাদের গান করিতেছে। অত সৌরভে কণামাত্র রস নাই, ইহা যেন ভ্রমরের বিশ্বাস হইতেছে না। তাই সোৎসাহে সে কেতকী পরাগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; আর মরু বালুকা প্রোথিত ক্রমেলকের (উষ্ট্রের) ন্যায় শুষ্ক পরাগস্তূপে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। আসিবে না মা? এমন কাল, এমন অবসর, রূপরসের এমন খেলার সময়ে আসিবে না মা? এস মা শ্যামা! এই রূপসাগরে তোমার কাল চুলের রাশি এলাইয়া—ছড়াইয়া, অরুণ কিরণের সোণার তরঙ্গে শ্যাম দেহ-যষ্টিকে ভাসাইয়া, দোলাইয়া, নাচাইয়া, কোটি কহ্লারের প্রোদ্ভিন্ন রক্তদলের উপর, অলক্তরাগরঞ্জিত ছোট ছোট চরণ দুখানিকে সাবধানে ফেলিতে

ফেলিতে, নীল নয়নের বিলোল কটাক্ষের উপর অসংখ্য খঞ্জন নেত্রকে নাচাইয়া—ভ্রমর মালার লহরী লীলা ছড়াইয়া, কচি কচি অধরোষ্ঠে কোটি কোটি স্থল কমল ফুটাইয়া—সদা, নৃত্যপরা, চপলা, চঞ্চলা, বালা, এস মা !

মা, তুমি আমার কন্যা—আত্মজা। আমার সাত সোহাগের সংসার অঙ্গনে, আমার আসক্তিস্নিগ্ধ হৃদয় প্রাঙ্গণে নাচ মা শ্যামা। আমার কন্যা-রূপে, আত্মজা—শৈলজা, বিরজারূপে নাচ মা ! তোমার তাথৈ তাথৈ নাচে সাত চাঁদ নিঙড়ান রাঙ্গাচরণ দুখানির কনক নূপুর বাজিয়া উঠুক। আর সেই ঝনৎকারে ঝনৎকারে, চারিবেদের কোটি ঝঙ্কার শুনিয়া আমার শ্রবন মন সার্থক হউক। নাচ মা ! আমার সুখময়ী, স্নেহময়ী, ভাবময়ী, জ্ঞানময়ী, প্রাণময়ী, সুধাময়ী, মা আমার নাচ। জন্মজন্মান্তরের দুঃখসন্তপ্ত এই বিস্তীর্ণ বক্ষের উপর—তোমার অমরগণ সেবিত—যোগিগণবাঞ্ছিত, রাজীব চরণ যুগল স্থাপন করিয়া একবার নাচ মা ! এই যে মা আমার—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজাং
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভুষিতাম ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়গ বামা-ধোর্দ্ধ-করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ—পাণিকাং ॥

মাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এইবার মায়ের পদানত হইয়া প্রণাম করি—

কালি ! কালি ! মহাকালি ! কালিকে, পাপহারিণী !
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥”

মাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু মার বিশ্বরূপ দর্শন না করিলে ত প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ হয় না। কিন্তু এ বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী কে ? গীতাভাষ্যকার এ সম্বন্ধে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া-

ছেন—তাঁহার সেই সুরঞ্জিত চিত্রই এইস্থানে দর্শকগণের সম্মুখে ধারণ করিতেছি :—

"যাহার হৃদয়ে বিমলা ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইতেছে, ভক্তির প্রাবল্যে যাঁহার হৃদয়ে সন্দেহকলুষ ও অবিশ্বাস পাপ নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়াছে, ভক্তিপাদপের সুশীতল ছায়ায় সমপ্রবিষ্ট হইয়া যিনি পরমাশান্তি ও অতুলনীয় সন্তোষ সম্ভোগ করিতেছেন, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তিনিই অধিকারী। শতমুখী জাহ্নবীর ন্যায় যাঁহার ভক্তির অনন্তধারা কেবল ভগবানেই সম্মিলিত হইয়াছে, যাঁহার ভক্তি তাঁহার হৃদয়কে দারা ও পুত্র, ধন ও সম্পদ, সম্মান ও গৌরব প্রভৃতি যাবতীয় আসক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, পার্থিব সমস্ত ক্ষণিক আকর্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল ভগবানেই লীন করিয়াছে। যিনি স্বপ্নে ও জাগরণে, কার্য্যে ও বিশ্রামে, সততই ভগবৎচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে অশক্ত, ভগবানই যাঁহার জ্ঞানের ও ধ্যানের একমাত্র বিষয়ীভূত, যিনি বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে কেবল ভগবানকেই দেখিতে পান, যিনি লাবণ্যময়ী প্রেয়সী কামিনীর প্রেমপূর্ণ বদনকমলে কেবল ভগবানকেই দেখেন, স্নেহাস্পদ প্রেমময় নবনীত কোমল পুত্তলি সন্নিভ নয়ন বিনোদন নন্দনকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভগবানের সহিতই প্রেম-সম্মিলন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি শারদ পূর্ণিমার শোভাময়ী রজনীতে বিশ্বভূমি ভগবানেরই প্রেম-প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছে মনে করেন, যিনি বসন্তের নবসমাগমে নবোদ্গতে চুত মুকুলের সৌরভে, অচিরোদ্ভিন্ন কিশলয় দামের শোভায়, সুস্নিগ্ধ দক্ষিণানিলের সুমধুর স্পর্শে এবং পুংস্কোকিলের পঞ্চম তানে ভগবানেরই মধুরতা এবং তাঁহারই বিকাশ অনুভব করেন। সেই ভক্ত চূড়ামণিই শ্রীহরির পরম সমাদরের পাত্র এবং দেবতাগণেরও বরণীয় ব্যক্তি। সেই ভক্তবর্য্য মহাত্মাই শ্রীহরির বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী। তাঁহার বেদাধ্যায়নের প্রয়োজন হয় না, জ্ঞানলাভের জন্য গুরুসমীপে অবনত মস্তকে

দণ্ডায়মান থাকিতে হয় না, শুভক্ষণ, শুভযোগ, বা ঘটনা বিশেষে সর্ব্বস্ব দান করিতে হয় না, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বা বহু ক্লেশ সাধ্য তপশ্চর্য্যা করিতে হয় না; নানা সামগ্রী আহরণ পূর্ব্বক বহ্বায়াসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠানাদি করিতে হয় না, এবং অতীব পীড়াদায়ক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। ভক্তিরূপ যে অলৌকিক আলোকে তাঁহার দিব্য নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর কোন সহায়তা ব্যতীত, সেই পবিত্র জ্যোতিঃ দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত দিব্য নয়নে তিনি শ্রীহরির বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন।"

আমার উদাহরণ প্রদর্শন শেষ হইল। মহানুভব পাঠকগণ আমার গুণদোষ কিছুই লইবেন না। আমি মাত্র ভারবাহী। উদ্দেশ্য ভগবৎ চরণ স্মরণ ও ভগবন্নামানুকীর্ত্তন। এক্ষণে সেই শ্রীভগবানের স্মরণাপন্ন হইয়াই আপাততঃ আপনাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

সহৃদয় গ্রাহকগণকে জানাইতে বাধ্য হইলাম যে, এখনও অনেকের নিকট ভক্তির বার্ষিক ভিক্ষা বাকী আছে। আপনাদের সহানুভূতি না পাইলে পত্রিকা পরিচালনা করা আমাদের মত কাঙ্গালের দুঃসাধ্য। আশা করি নিজ নিজ ভিক্ষা এই মাসের মধ্যেই পাঠাইয়া দিবেন। সকল গ্রাহকগণের নিকটই আমরা ভক্তির দুই একটী করিয়া নূতন গ্রাহক প্রার্থনা করি। আশা করি আমাদের প্রার্থনা বিফল হইবে না।

ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ

"প্রতীক্ষা"

শ্রীঅনাথবন্ধু ভটাচার্য্য।

এত দুখ
গেছে সুখ
থাকিগো কেমনে।
এত ব্যথা
প্রেম গাথা
রাখিয়ে গোপনে॥
আজি কেন
এত ক'রে
বাজাও বাঁশরী।
প্রাণ মোর
তব তরে
উঠিছে শিহরী॥

কাছে কই
নাহি পাই
কোথা বল যাই।
মনে হয়
পাই ভয়
পাছে বা হারাই॥
প্রতীক্ষায়
দিন যায়
সে দিন না আসে।
বল কবে
স্থান পাবে
(অনাথ) চরণের পাশে॥

বৈষ্ণব-সংবাদ

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন গৌর আনাঠাকুর শান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি ছিল। শ্রীধাম শান্তিপুরে মহা সমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে ২৮এ মাঘ হইতে ৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রত্যহই সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্য শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ও শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল দাস এই তিন দলের ভিন্ন ভিন্ন পালাকীর্ত্তন

হইয়াছে। তৎভিন্ন প্রত্যহই পূজা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছে। ৫ঠা ফাল্গুন তারিখে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রী সীতানাথের জন্মলীলা কীর্ত্তন, মালসা ভোগ ও মহামহোৎসব এবং সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মতবোধিনী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে শ্রীধামের বহু প্রভু সন্তান যোগ দান করিয়াছিলেন। প্রভু সীতানাথের সুসন্তান পরম পণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নদীয়াবিনোদ গোস্বামী এবং কলিকাতার বিজ্ঞ কবিরাজ গৌরভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ এম, এ, মহাশয়গণ বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতাদ্বারা সীতানাথের গুণ বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতিরত্ন মহাশয়ের সঙ্গীত হইয়াছিল। পরদিবস ৫টার সময় হইতে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় রাসলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। উৎসবানন্দে এই কয় দিন শান্তিপুর যেন টলমল করিতেছিল। কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন আমরাও বহুভাগ্যবলে উৎসবানন্দ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

ঢাকা, শাঁখারী বাজারে প্রভু সীতানাথের উৎসব মহাসমারোহে হইয়াছে। ৩রা ফাল্গুন অধিবাস হইয়া ৪ঠা ফাল্গুন অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন এবং ঐ সঙ্গেই প্রভুর জন্মলীলাকীর্ত্তন পূজা প্রভৃতি হইয়াছিল। ৫ই প্রাতে নগর কীর্ত্তন ও সন্ধ্যার পর হইতে বিবিধ লীলাকীর্ত্তন। ৬ই নগর কীর্ত্তন ও ধুলট হয়। ঐ দিন ও তৎপরদিন বৈকালে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নদীয়াবিনোদ গোস্বামী প্রভু সীতানাথের গুণ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোস্বামীও প্রভুর গুণ বর্ণনা করেন। ভক্তি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতিরত্ন মহাশয়ের সুমধুর সঙ্গীত হইয়াছিল। এই উৎসব সম্পাদনে প্রভু সীতানাথের বংশধর শ্রীযুক্ত

কৃষ্ণরতন গোস্বামী মহোদয়ের উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নদীয়াবিনোদ গোস্বামী বিশেষ আহ্বানে কুচবিহার রওনা হইয়া যাওয়ায় ৮ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোস্বামী মহোদয় বক্তৃতা করেন ও দীনেশ বাবু কীর্ত্তন করেন। আমরা আশা করি ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক যত্নে প্রতি বৎসরই প্রভু সীতানাথের গুণকীর্ত্তনের আয়োজন করিয়া কৃষ্ণরতন প্রভু ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনে যত্নবান হইবেন।

* * *

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় বিগত ১৯এ ফাল্গুন শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস দেবের স্মরণ মহোৎসবে গিয়া ছিলেন। সেখান হইতে মহোৎসবান্তে বাবলা (শান্তিপুর) দিগনগর প্রভৃতির উৎসব সমাধা করিয়া ১৪ই চৈত্র ফরিদপুর রওনা হইবেন সেখান হইতে ১৭ই চৈত্র হালিসহরে (কুমারহট্টে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসবে যোগদান করিয়া ঐ দিনই ভবানীপুরে শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় উপস্থিত হইবেন। পরদিন প্রাতে নগরকীর্ত্তন ও বৈকালে নামকীর্ত্তন করিবেন। তৎপর ২১এ হইতে ২৩এ চৈত্র পর্য্যন্ত হাওড়া কোঁড়ার বাগানে ভক্তি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত শ্রীপাদ দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের স্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিবেন। এবং ২৫শে বৈকালে বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন উৎসব উপলক্ষে যোগদান করিবেন। বর্ত্তমানে এইরূপই স্থির হইয়াছে।

* * *

বিগত ৯ই ফাল্গুন মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী প্রেমদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কটক শ্রীশ্রীরাসবিহারী মঠ শ্রীরাধারমণ কুঞ্জে ৭ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত পাঠ, কীর্ত্তন, অষ্টপ্রহর প্রভৃতি যথারীতি হইয়াছে। সময়াভাবে উৎসবানন্দে যোগদিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ দাদা মহাশয়ের উৎসাহ উদ্যোগ প্রসংশনীয়। বিগত ১৮ই ফাল্গুন হইতে চল্লিশ দিন অহোরাত্র কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

বৈশাখ
১৩৩৬

প্রার্থনা

দয়া কর দীনবন্ধু অধম তারণ।
নিরুপায় দেখি আজ লইনু শরণ ॥

হে সর্ব্বান্তর্য্যামীন্! তোমার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার খেলা চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একাধিপত্য করিয়া রহিয়াছে, যে যতই বড় হউক মায়ার হাতে নিস্তার পায়না। আমি কোন্ ক্ষুদ্র, আর আমার এমন কি সাধনা আছে যে, তোমার মায়ার প্রভাবকে পরাজয় করিব। মুখে খুব বড় বড় কথা বলি, যখন কেহ কিছু বলে তখন এমনভাবে তাহার সঙ্গে আলাপ করি যে, সে বেশ বুঝিয়া লয় যে, আমি অনেক কিছু করিয়াছি। আর তাহাকে সেই ভাবে বুঝাইয়া আকৃষ্ট করিতে না পারিলে যে আমার ব্যবসা চলে না। এই ভাবে কপটতার উপর কপটতার আবরণ দিয়া ক্রমে ক্রমে আমি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, এখন আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। যৌবনের প্রারম্ভে যে উৎসাহ উদ্দম ছিল, এখন তাহা নাই। ভোগে ডুবিয়া

ত্যাগের শুভ্রালোক যে কি মধুর তাহার ধারণাও করিতে পারিতেছি না, ভাব, ভক্তি, প্রেমলাভ তো দূরের কথা। দিনান্তে একবার বসিয়া যে প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিব তাহারও সামর্থ হারাইয়াছি।

স্বাস্থ্যহীন, ধৈর্য্যহীন, বিবেকহীন—এক কথায় সকলই হারাইয়াছি। কিন্তু যাহা হারাইলে জীবন ধন্য হইত, প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইত সেই অভিমানটীকে হারাইতে পারি নাই।

জাতি, বিদ্যা, মহত্ব এর এক একটি যেন শত হস্তির বল লইয়া আমাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রভু, কার শক্তিতে আমি এই দুর্ব্বার অভিমানের হাত হইতে উদ্ধার পাইব জানি না। তুমিত অজস্রধারে করুণামৃত বর্ষণ করিতেছ, কিন্তু আমি যে অভিমানে উচ্চশীর হইয়া রহিয়াছি; বর্ষণ অজস্রধারে হইলেও আমার তাহাতে কিছু হইতেছে না। দাও প্রভু পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দাও। অভিমান কালসর্পের শতফণা বিলুন্ঠিত হউক তোমার চরণ তলে। আমার আমি তোমাকে দিয়া তোমার হইয়া দিবা নিশি তোমার ভাবে মাতিয়া থাকি আর অকপটে প্রাণ ভরিয়া বলি "তোমার মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।"

দীণ—

প্রাণের কথা

কাহরে তোমারে, ডাকি দয়াময়,
দয়া কর দীন দাসে;
সুখের কামনা, দুঃখের ভাবনা,
মনে যেন নাহি আসে।

সব ভুলে যেন, তোমারি ধেয়ানে,
থাকি আমি নিশিদিন ;
আমার আমিত্ব, ঘুচে যায় যেন,
হয় গো তোমাতে লীন।
কতদিন হায়, গেছে মিছা কাজে,
তোমারে ডাকিনি ভুলে ;
আজি ডাকিতেছি, এখন কাতরে,
এসে মরণের কূলে।
পারের সম্বল, আনি নাই কিছু,
কাঁদিতেছি অনিবার ,
দাও দয়াময়, ও পদ-তরণী,
মোরে করিবারে পার !

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত)

(২৩)

(নদীয়াবাসীর নূতন জীবন)

"ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায় ॥
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরা চাঁদের গায় ॥"

নদীয়ার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। প্রভুর বিচিত্র সঙ্গগুণে নদীয়াবাসীর হৃদয়ে কৃষ্ণ-ভক্তি উথলিয়া পড়িতেছে। প্রেমানন্দে নদীয়া টলমল। উপরের পদে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, অবিচারে দুই হাতে কিশোরীর প্রেম বিলাইতেছেন, তাহাতে বন্যা আসিয়া নদীয়া ভাসিয়া যাইতেছে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছে। এই তরল সুধার ন্যায় ভক্তি, নিতাই সকলকে কলসী কলসী পান করিতে দিতেছেন। প্রেমানন্দ স্রোতে দুকূল ভাঙিয়া গোরাচাঁদের গায়ে ঢেউ লাগিতেছে। আনন্দময়ের সঙ্গগুণে, প্রত্যেকেরই হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। যে দিকেই যাও কেবল অনাবিল আনন্দ-স্রোত। লোকে অকারণে হাসিতেছে আর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। প্রভুর আদেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, মনের সাধে দুই হাতে প্রেমামৃত বিতরণ করিয়াছেন তাহারই ফলে আজি নদীয়ায় এ আনন্দ স্রোত। সে আনন্দের বার্ত্তা পদকর্ত্তা লোচন দাসের পদে পুনরায় শ্রবণ করুন,—

"সুখেরি পাথার নদীয়ায়, গোরাচাঁদের উদয়।ধ্রু
এক দিন নয়, দুইদিন নয়, নিতুই নূতন। (সুখেরি পাথার)
মনে করি, ন'দে ভরি, এ দেহ বিছাই॥
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই॥"

নবীন প্রেমে, ভক্তগণের হৃদয় ও মন সর্ব্বদা নাচিতেছে। তাঁহারা এই প্রেমের চক্ষে দেখিতেছেন, ত্রিভুবন আনন্দে পূর্ণিত হইয়াছে, প্রতি রজনী খোল, করতাল ও হরিধ্বনিতে মুখরিত, লোক ভক্তিতে উন্মাদ। তাঁহাদের দৃষ্টি, গমন-ভঙ্গী সমস্তই মধুর।

(কাজি উদ্ধার।)

"দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়ে হৃদয় শোধিল
যাচি গিয়ে ঘরে ঘরে।" (মনঃশিক্ষা)

চাঁদকাজি গৌড়ের বাদশাহের দৌহিত্র, তিনি বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া নবদ্বীপ শাসন করেন। সেই কাজির নিকট, দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া, নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া আসিল। নিমায়ের অপরাধ—তিনি ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া ভক্তগণের সঙ্গে সারা রাত্র, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, মন্দিরা, মাদল প্রভৃতি লইয়া উচ্চকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন। মন্দ লোকের তাহা সহ্য হইবে কেন? কিন্তু কাজি প্রথমে, এ নালিশে কর্ণপাত করিলেন না, কারণ নিমাই চাঁদের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এমন কি তিনি গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে চাচা বলিয়া ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে, তিনি বাধ্য হইয়া—একদিন সন্ধ্যাকালে, সদলে নগরে আসিয়া দেখিলেন যে, স্থানে স্থানে সংকীর্ত্তন হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গীগণসহ একটী বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের খোল ভাঙ্গিয়া, বিশেষ করিয়া শাসাইয়া বলিলেন, "আবার যদি কেহ কীর্ত্তন করে তাহা হইলে তাহার জাতি মারা যাইবে।" (কাজি যে স্থানে খোল ভাঙ্গিয়া দেন, সে স্থান অদ্যাপি "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।)

ইহাতে নগর মধ্যে কীর্ত্তন করা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। নিমাই চাঁদ শুনিলেন যে, কাজির ভয়ে আর কেহ কীর্ত্তন করিতে পারে না। শুনিয়া

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন, "আজ আমি সমস্ত নবদ্বীপ নগরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব দেখি কে আমার কীর্ত্তন রোধ করে।"

"প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘর দ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥
প্রেম-ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের সে হইব আজি কাল॥
চল চল ভাই সব নগরিয়াগণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহা দীপ লঞা আসিবেক সে॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব দেখি কোন কর্ম্ম করে॥
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥
তত্তক্ষণে চলিলেন নাগরিয়া গণ।
পুলকে পূর্ণিত সবে কিসের ভোজন॥
নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই পণ্ডিত আজ সঙ্কীর্ত্তনে নগরে নগরে নাচিবেন এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? সকলেই সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে হাতে এক এক মশাল লইয়া এবং কটিতে তৈলের ভাণ্ড বাঁধিয়া, প্রভুর দুয়ারে আসিয়া হাজির হইলেন।

স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত খই কড়ি বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। সংকীর্ত্তনমত্ত প্রভু যখন তাঁহাদের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইবেন তাঁহারা তখন সেই সমস্ত দ্রব্য পথে ছড়াইবেন।

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥

এক কথায় নগর তখন আনন্দময় হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনে যাইতেছেন তাঁহাদের হস্তে এক একটী দেউটী (মশাল)। এ দেউটীর সংখ্যা কে করিবে?

অনন্ত অর্ব্বুদ কোটি লোক নদীয়ার।
এ দেউটী সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥
ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥
হইল দেউটীময় নবদ্বীপ পুর।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥"

তখন কে কোন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন নিমাই তাহা ঠিক করিয়া দিলেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কোন্ সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন "প্রভু! আমি স্বতন্ত্র নৃত্য করিতে পারিব না। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। তুমি নৃত্যকালে পড়িয়া যাইতে পার,

আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে আগলাইব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি এক তিল থাকিব না। তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে থাকিব।" বলিতে বলিতে তাঁহার পরিসর বক্ষ বহিয়া, প্রেমাশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ সঙ্গে লইলেন।

চাঁদ কাজি প্রকৃত পক্ষে নদীয়ার রাজা, তাঁহার আজ্ঞা রোধ করিয়া নিমাইচাঁদ নব-নটবর বেশে সাজিয়া ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন রঙ্গে বাহির হইলেন। তখন—

"তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।"

তিনি মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিতেছেন—

"হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ কৈল সবার শ্রবণ॥
হুঙ্কারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥
লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে হরিবলে॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে কিছুই না জানি॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখে সকল আকাশ।
জ্যোতি-রূপ কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ॥ (চৈঃ ভাঃ)

গৌরাঙ্গ সুন্দর, হরি হরি ধ্বনি করিয়া বাহির হইলেন। শ্রীনিতাই তাঁহার সাথে সাথে। ভক্তগণ প্রভুদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন তাঁহাদের অঙ্গে শ্রীফাগু, মাল্য ও চন্দন এবং হস্তে মন্দিরা ও করতাল শোভা

পাইতেছে। হরি হরি ধ্বনি করিয়া সকলে মহানন্দে ভাসিতেছেন, তাঁহাদের দেহে তখন কোটি সিংহের শক্তি। আর সেই অদ্ভুত জনতার মাঝে প্রভুর রূপ,যেন উছলিয়া পড়িতেছে, তাহাতে—

"সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক হরি বলে আলগ হইয়া॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে।
অন্যথা সেরূপ কহিবারে কেবা পারে॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতির মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু বিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥
আজানু লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে॥
দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক কদম্ব॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র অতিক্ষীণ॥

চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর।
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥
যে যে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
দেখ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥
এতেকে যে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন।
সবাই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর সঙ্গে যাহারা কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অদ্বৈত আচার্য্য, তাঁহার দলে হরিদাস নৃত্য করিতেছেন। আর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের সহিত নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে প্রভু—

"গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস।"

প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তগণকে এক এক সম্প্রদায়ের নেতা করিয়া দিলেন। এবং নিত্যানন্দ ও গদাধর "প্রেম-সুধা-সিন্ধু মাঝে" ভাসিতে ভাসিতে প্রভুর দুই পাশে যাইতেছেন। তখনকার—নবদ্বীপের লোকসংখ্যা এখনকার কলিকাতার লোক সংখ্যা অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল। এই অনন্ত লোকের প্রায় সকলেই প্রভুর দল পুষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

"এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে।"

প্রভু এরূপ মোহন বেশে সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন যে, রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে—

নাচে বিশ্বম্ভর,　　সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যার পদধূলি,　　হই কুতুহলী,
সবাই ধরিল শিরে ॥
অপূর্ব্ব বিকার,　　নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া　　শ্রীভুজ তুলিয়া
বলে হরি হরি বাণী ॥
মদন সুন্দর,　　গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাচর চিকুরে,　　মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবান ॥
চন্দন চর্চ্চিত,　　শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে,　　প্রেমে স্থির নহে·
আনন্দে শচীর বালা ॥
কাম শরাসন,　　ভ্রূযুগ পত্তন,
ভালে মলয়জ বিন্দু।
মুকুতা দশন,　　শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণা সিন্ধু ॥
ক্ষণে শত শত　　বিকার অদ্ভুত
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম,　　পুলক বৈবর্ণ,
না জানি কতেক হয় ॥

ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অঙ্গুলী মুরলী বায়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখিয়া নয়ন জুড়ায়॥
অতি মনোহর, যজ্ঞ সূত্রধর,
সদয় হৃদয় শোভে।
যে বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত,
বহিলা পরশ লোভে॥
নিত্যানন্দ চাঁদ, মাধব নন্দন,
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়-গণ করয়ে কীর্ত্তন,
সবা চাহি চাহি হাসে॥
যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন খেলা॥
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ,
কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে॥
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, হরি বহি আর,
না বোলাই কারো মুখে॥

অপূর্ব্ব কৌতুক,　　দেখে সর্ব্বলোক
　　আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার,　　চাহিয়া বদন,
　　বলে ভাই হরিবোল ॥
প্রভুর আনন্দ,　　জানে নিত্যানন্দ,
　　যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে　　দুই বাহু মেলে,
　　যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥
নিত্যানন্দ ধরি,　　বীরাসন করি,
　　ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি,　　দিয়া কুতূহলী,
　　হরি হরি বলি হাসে ॥
অকপটে ক্ষণে,　　কহয়ে আপনে,
　　মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি,　　মুঞি সে কংসারি,
　　বলি ছলিয়া বামন ॥
সেতুবন্ধ করি,　　রাবণ সংহারি,
　　মুঞি সে রাঘব রায়।
করিয়া হুঙ্কার,　　তত্ত্ব আপনার,
　　কহে চারি দিগে চায় ॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব,　　অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
　　সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি,　　প্রভু প্রভু বলি,
　　মানয়ে ভকতি দান ॥

যখন যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দর,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই নগরকীর্ত্তনের যে চারুচিত্র বৃন্দাবনদাসের নিপুন তুলিকা স্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে জগতের কোন সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। স্বয়ং ব্যাসদেব ব্যতীত শ্রীভগবানের লীলা এমন মধুর ভাবে বর্ণনা করিতে কেহই পারেনা। আর যাহাতে আবার প্রিয় পাঠকের চিত্তে, ইহার একটী মোহন ছাপ উঠিতে পারে, তজ্জন্যই এই মনোহর লীলা বিস্তৃত ভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিলাম। আসুন পাঠক! আমরা নদীয়ার পথে, এই সোনার মানুষকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, এই বিশ্ববিমোহন দৃশ্য, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই। কারণ নদীয়ার পথে এ দৃশ্য দেখিবার ভাগ্য আর আমাদের অধিক হইবে না। ক্রমশঃ

মায়া।

কেন—আকুল প্রাণে, পিছন পানে,
চেয়ে ঝরে নয়নধারা।
যেতে যখন হবে তখন
ব্যথায় কেন পাগল পারা ॥
যারে তোমার আপন ব'লে, ক্ষত হৃদয় যাচ্ছে জ্বলে,
আপন হ'লে সেকি কভূ
ছিন্ন হত এমনি ধারা ॥

যাচ্ছ ছেড়ে আপন জনে, প্রবোধিতে নার মনে—
বৃথা অশ্রু বিনিময়ে
অনধিকার দাবী করা।
মরম জ্বালা, হায়! জুড়াইতে কেহ নাই;
মরমী ভাবিয়া 'পরে'
হও কেন আপন হারা ॥
কেবা ভুলাইল সব মরমী, দরদী তব,
চিৎচোর প্রাণগৌর
প্রভু নিতাই পাগল করা ॥

শ্রীনিতাইপদ দাস।

ভারতী-স্মৃতি।*

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥"

যাঁহার কৃপা হইলে পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, বোবাও বাক্‌শক্তি লাভ করে, তাঁহারই কৃপায় এ দীনের হৃদয়োচ্ছ্বাস ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। হে মাধব! আমাকে একটু কৃপা কর। তোমার কৃপায় এই দীনহীন আমি অদ্যকার এই সুপবিত্র ধর্ম্মসভায় আপন প্রাণের ক্ষুদ্র দুটো কথা নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হই।

হে মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছায় পূর্ণ একটী বৎসর অতীত হইল। অনাদি অনন্ত কালসমুদ্রবক্ষের উপর তাহারই অংশস্বরূপ বৎসররূপে

* শ্রীপাট দেনুড়ে শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভুর স্মৃতিসভায় পঠিত।

যে একটী তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সে বৎসর আজ অনন্ত কালে বিলীন হইল। ক্ষুদ্র কাল মহাকালে মিশিল। ক্ষুদ্র বর্ত্তমান অনাদি অতীতে ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া উঠিল,—নূতন একটী তরঙ্গরূপে আবার এ যে বর্ত্তমান! সঙ্গে সঙ্গে মনের মাঝে জাগিয়া উঠিল,—আবার এ যে নূতন ভাবে সেই সে কত অতীত দিনের পুরাণ স্মৃতি!

আজ যে সেই দিন। যেদিনের পুণ্যস্মৃতি আমাদের অন্তরে চিরদিনের মত জাগরূক রহিয়াছে ও থাকিবে,—সেইদিন, ওগো সেইদিন যে আজ আবার আসিয়াছে। প্রতি বর্ষেই আজিকার এই দিনে যে সেইদিন একবার আসে। আর সেদিন থাকে কোথায়? ক্ষুদ্র দেনুড় গ্রামে। এই বিশাল জগতের কোন স্থানই সে অধিকারের দাবী করিতে পারে না —সে গৌরবের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না;—যে অধিকার-গৌরবের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেনুড় গ্রাম! এই দেনুড়ের গৌরবে আজ সারা বাঙ্গলাদেশ গৌরবান্বিত। কেন তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? বাঙ্গলার গৌরব শ্রীধাম নবদ্বীপে যে প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং যাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রেম-ভক্তির অমিয়-মধুর উপদেশবাণী মর্ত্ত্যমানবের তাপিতপ্রাণে শান্তির শীতল ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল,—সেই পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যাঁহার অনুপ্রেরণায় বিশ্বহিতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া প্রেমের অবতার পতিতের ভগবান-রূপে জগতের পূজালাভ করিতেছেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই সন্ন্যাসগুরু শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভু যে এই দেনুড় গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে এ পুণ্যস্থান কি আজ বাঙ্গলার একটী গৌরব নয়?

আনুমানিক ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র দেনুড় গ্রামে এই চিরধন্য দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বংশেই যে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন! তাঁহাকে পাইয়াই ত এই বংশ চিরধন্য এই স্থান চির গৌরবান্বিত

আজ এ বাঙ্গলাদেশের আপামর সাধারণেই জানিয়াছে যে, তাঁহার সংসারাশ্রমের নাম ছিল,—রামভদ্র এবং তিনি মুকুন্দমুরারি ভট্টাচার্য্যে পুত্ররূপে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার সেই আবির্ভাব উপলক্ষ্য করিয়াই সেই স্মৃতির উদ্দেশে আজিকার এই ধর্ম্মসভার অধিবেশন। আর এই ধর্ম্মসভায় তাই এমন সব ভক্ত-ভাবুকের মনোহর সমাবেশ!

শ্রীভগবানের প্রিয় নিকেতন, চিরসাধের লীলাক্ষেত্র বলিয়া এই ভারতবর্ষ জগতের মাঝে যেমন ধন্য,—ততোধিক ধন্য আবার এই নদীমেখলা শস্যশ্যামলা আমাদের বঙ্গভূমি। যেহেতু এই বাঙ্গলারই বুকে আসিয়া উদয় হইয়াছিলেন,—আমাদের সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ। এই সৌভগ্য ত ভারতের আর কোনও প্রদেশের হয় নাই! এ সৌভাগ্যের অধিকারী একমাত্র বাঙ্গলা—এ গৌরব একমাত্র বাঙ্গালারই নিজস্ব। আর কোনও অবতারের লীলাজন্ম না হইলেও, মাত্র এই এক অবতারের গৌরবেই বাঙ্গলা ধন্য। শ্যামা বাঙ্গলার বুকে শ্রীভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া যে লীলা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের লীলা হইতে যেন স্বতন্ত্র—এ যেন এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। আর মনে হয়, এই অভিনবতত্ত্বও যেন তিনি বিশেষভাবে বাঙ্গলাদেশেরই জন্য সাধ করিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরও যে কয়টা অবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার সবগুলিরই আবির্ভাব এবং লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল,—বাঙ্গালার বাহিরে এবং ক্ষত্রীয় বংশে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীভগবান প্রেম-ভক্তির যে লীলা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বাঙ্গালা দেশে এবং আবির্ভাবও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বংশে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ

২

করিয়া যে প্রেম ভক্তির মহামন্ত্র প্রচার করিতে বিশাল বিশ্ব পথের পথিক হইয়াছিলেন, সেই পথে চলিতে সেই মন্ত্রে তাঁহাকে তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিও এই বাঙ্গালা দেশের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালার এক মহা গৌরবস্বরূপ সেই বংশ,—এই দেন্মুড়ের ব্রহ্মচারী বংশ এবং মহাপ্রভুর সেই সন্ন্যাসগুরু,—এই শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভু;—যাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আজিকার এই ধর্ম্মসভার অধিবেশন। তাই প্রতি বৎসরই আজিকার এই দিনে দেন্মুড়ের ব্রহ্মচারী-ভবনে, শ্রীপাদ ভারতী প্রভুর এই বাল্যাশ্রমে তাঁহার আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অদ্যকার এই সভার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়;—মাত্র সেই মহাপুরুষ শ্রীপাদ ভারতী প্রভুর পূত স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। শ্রীপাদ ভারতী প্রভু আমাদের এই স্থানে এই দিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়া ধন্য হইবার অভিলাষে এই আয়োজন করিয়া থাকি। ইহাতে আমরাই ধন্য হই। আমরাই সৌভাগ্যশালী এবং গৌরবান্বিত হইয়া থাকি। নতুবা আমাদের মত অক্ষম, দীন এবং সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য ব্যক্তির এই পূজায় ভারতীপ্রভুর কোনই গৌরব বাড়িবে না। কারণ যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আজ ভক্তি-জগতের অবিসংবাদিত একচ্ছত্রী সম্রাট, তাঁহার গুরু যিনি,—আমাদের মত দীনাতিদীন অক্ষম ব্যক্তির পূজায় অথবা পূজা না করায় তাঁহার গৌরব-মহিমার কি আসে যায়? প্রেম-রাজ্যের সম্রাটের মন্ত্রদাতা যিনি, জগদ্‌গুরুর গুরু যিনি,—তিনি যে আজ বিশ্ববাসীর প্রাণের পূজা লাভ করিবেন,—মুমুক্ষু মানবের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? সত্য সত্যই ভারতী প্রভুর পুণ্যস্মৃতি বুকে করিয়া

আজ প্রেম ও ভক্তিজগৎ ধন্য হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য নূতন করিয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র আয়োজনের কোনও প্রয়োজন নাই,—তাঁহার স্মৃতিপূজার জন্য কোনও ধর্ম্মসভার অধিবেশনেরও আবশ্যকতা নাই। তথাপি আমরা তাহা করি কেন? বলিয়াছি ত,—নিজেরা ধন্য হইবার জন্যই তাহা করিয়া থাকি। আর এক কথা। হউন না কেন,—ভারতী প্রভু আজ বিশ্ববরেণ্য! তবু আমাদের যে তিনি আপন, ওগো, একান্তই যে আপনারজন ছিলেন। সে সৌভাগ্যের গৌরব কি আমরা করিব না?

'জানি,—তিনি বিশ্বের হিতেই আসিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্বহিতই সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিতেও পাইতেছি, আজ তিনি বিশ্ব-বাসীর বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সত্য বটে, তিনি বিশ্ববাসীর আরাধ্য ধন। তবু—ওগো, তবু যে তিনি আমাদেরই আপন জন! আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব? ভুলিতে পারি না—হায়, আমরা যে সে স্মৃতি কোন মতেই ভুলিতে পারি না! তিনি আগে যে আমাদের; তবে ত বিশ্বের! আমরা তাঁর স্মৃতি কেমন করিয়া ভুলিব? বিশ্বের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদিয়াছিল বলিয়া না হয় একদিন তিনি এই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই না হয় তিনি বিশ্বের বরণীয় হইলেন! কিন্তু তার আগে,—যখন বিশ্ব ত কত দূরের কথা,—এই দেমুড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকগুলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানিত না, চিনিত না, তাঁহার সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখিত না; তখন যে তিনি এইখানেই থাকিতেন। লোক-লোচনের অন্তরালে নিভৃত গোপনে তখন যে তিনি এই দেমুড়ের ব্রহ্মচারী ভবনেই "মানুষ" হইতেছিলেন! তখন যে তিনি একটী সুন্দর সুকুমার শিশু এই ভবনেই খেলা করিয়া বেড়াইতেন! হায়, তখন কে জানিত যে, সারা বিশ্বের সার সম্পদ্ এমন ভাবে এই দেমুড়ের ব্রহ্মচারী

ভবনে লুকাইয়া রহিয়াছে! আর কে-ই বা তখন ভাবিয়াছিল যে, এই ভবন অন্ধকার করিয়া সে অমূল্য ধন, সে অতুল্য মাণিক আবার তেমন ভাবে বিশ্বের কাজে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু সেদিনের সেই স্মৃতি কি ভুলিবার? শ্রীপাদ ভারতী প্রভু আজ বিশ্বের গুরুরূপে বিশ্ববাসীর পূজালাভ করুন, আমরা তাহা তত দেখিব না দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে দেখা দেখিবার আরও ত অনেক আছে। আমরা দেখিব,—এখানে আজ আমাদের সেই রামভদ্রকে। আমাদের সেই মুকুন্দ মুরারি ভট্টাচার্য্যের পুত্র স্নেহের দুলাল, নয়নের পুত্তলী সুন্দর সুকুমার শিশু রামভদ্রকে। আমরা ভাবিব, শিশু রামভদ্রের সেই সরল মুখের সুন্দর হাসিটুকু। সেই হাসি পরক্ষণে সেই কান্না, কথায় কথায় সেই অভিমান, এই প্রাঙ্গন ধূলায় সেই গড়াগড়ি। আমরা আলোচনা করিব, রামভদ্রের সেই শৈশব কালের মধুমাখা আধ আধ কথাগুলি। তাঁর বাল্যলীলার যে মধুর স্মৃতি এই স্থানের আকাশে বাতাসে এখনও মিশিয়া রহিয়াছে, তাঁর শৈশবজীবনের যে সব ঘটনা এই ভবনের মৃত্তিকার সহিত একবারে গ্রথিত হইয়াছে, তাঁর শৈশবের যে সব কার্য্যাবলী এই ব্রহ্মচারী ভবনের প্রতি ধূলিকণাটিকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আজ এখানে পূজা করিব, সেই স্মৃতির। কারণ এটা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার। নিজে অযোগ্য হইলেও আপনার ঘরে কেহ পরকে কর্ত্তৃত্ব দিতে চায় না। অতি কাঙ্গাল, অতি দুঃখীও নিজের ঘরে নিজে কর্ত্তা! বিশ্ববন্দিত শ্রীপাদ ভারতী প্রভু আজ বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী লাভ করুন, অযোগ্য আমরা সে পুষ্পাঞ্জলি দানের অধিকারী না হইতে পারি কিন্তু তাঁর এই বাল্যাশ্রম দেলুড়ের ব্রহ্মচারী ভবনে বালক রামভদ্রের সেই বাল্যলীলার স্মৃতি পূজায় একমাত্র অধিকার আমাদেরই আছে। এ অধিকার যে আমাদিগকে বজায় রাখিতেই হইবে! নিজের অধিকৃত বিষয়

সামান্য হইলেও তাই যে লোকের কত আদরের। আর আমরা সামান্য হইয়াও ভগবৎ কৃপায় আজ যে অসামান্য ধনের অধিকারী হইয়াছি, তাহা ত অবহেলায় নষ্ট করিতে পারি না। যেমন পারিব, তেমনই করিয়াই আমাদিগকে এ পুণ্যস্মৃতি বজায় রাখিতেই হইবে। যেহেতু ইহা একমাত্র আমাদেরই অধিকার।

এই দীনাতিদীন আমি যাঁহার অনুগ্রহ এবং স্নেহের প্রভাবে শ্রীপাদ ভারতী প্রভুর বাল্যাশ্রমে আসিয়া সেই মহাপুরুষের বাল্যস্মৃতির পূজোৎসবে যোগদান করিবার অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছি, আমার সেই কৈশোরের শিক্ষাগুরু পরম ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এবারকার মত আমার এই পুণ্যব্রত এইভাবে উদ্যাপন করিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

তীর্থ চিন্তা

(পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবা লিখিত)

(৪)

পুতুল প্রতিমা নহে।—ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সেই পরম পুরুষ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই রূপের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া ভক্ত যখন অর্চ্চনা করেন তখনই তাহাকে প্রতিমা বলে। যেস্থানে অর্থোপার্জ্জনের জন্য মণ্ডপে ঠাকুর বসান হয়, তাহাকেই প্রতিমা বা বিগ্রহ বলে না, তাহাকে পুতুল বলে। নবদ্বীপে ঘরে ঘরে এরূপ

পুতুল স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত বাসর শয্যা, বিবাহ, বিলাসের ঢং করিয়া পুতুলের আড়ং সাজাইয়া রাখিয়াছে। যখন যোগের সময় হয় তখন নির্ব্বোধ গ্রাম্য যাত্রীর নিকট হইতে এই সকল দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে। নবদ্বীপে যাইয়া এক মহাপ্রভু দর্শন করিলেই যথেষ্ট হয়। সেইরূপে মন প্রাণ অর্পন করিয়া গৃহে গমন করিলেই যাত্রীকুলের অনেক কল্যাণ হয়।

কিন্তু নানারূপের নানারূপ গৌরাঙ্গ দর্শনে দর্শকের চক্ষু বরং ক্ষুব্ধ হইয়া যায়। এখন নবদ্বীপে চারি প্রকারের গৌরাঙ্গ হইয়াছে। সোনার গৌরাঙ্গ, পিতলের গৌরাঙ্গ, কাঠের গৌরাঙ্গ, মাটীর গৌরাঙ্গ। কিন্তু আসল গৌরাঙ্গ রক্তমাংসের গৌরাঙ্গ ছিলেন। এই সকল গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁহার কতদূর সম্বন্ধ, তাহা ধারণার অতীত। তাহ বলিতে চাই নানারূপ গৌরাঙ্গের তাড়নায় আসল গৌরাঙ্গ এখন অদর্শনীয় হইয়াছেন।

প্রতিমা পূজার উপকার কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু সেই প্রতিমা যখন পূজার জন্য অনুষ্ঠিত হয়; তখন তাহা দ্বারা সাধক ও দর্শকের কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু যে স্থানে তুচ্ছ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য প্রতিমা পূজার উদ্যোগ আয়োজন, যে স্থানে চড়ক পূজার মেলার "কাটা মুণ্ডু কথা কয়" দেখাইবার জন্য বাজীকরের ঘণ্টা বাজন, যেস্থানে গৃহস্বামী ঠাকুর দরজায় ভেট আদায় করিতে দণ্ডায় মান, সে স্থানে সে পূজায় পূজক ও দর্শক কাহারো কোন ফল নাই।

আশ্রম না বৈঠকখানা—এখন আশ্রম শব্দের অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে আশ্রম বলিতে লোকে যেরূপ বুঝিত, বর্ত্তমান সময়ের আশ্রম দেখিয়া সেরূপ বোঝা অসম্ভব। পূর্ব্বে রূপ গোস্বামী রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রম ছিল।

রাধাকুণ্ড তীরে আজ পর্য্যন্ত রঘুনাথ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের আশ্রমের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধনার পর্ব্বত, ভাবের সমুদ্র, কতটুক ক্ষুদ্রস্থানে কতটুক ক্ষুদ্র কুটীরে ভজন সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

তাঁহারা রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ধন সম্পদের চূড়ান্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া, তাহার অসারত্ব অনুভব করিয়া, আসিয়াছিলেন। জন সঙ্ঘের অনর্থ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে কৌপিন পরিধান করিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যাসী হইয়া আর তাঁহাদের রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের প্রবৃত্তি ছিল না। লোক সংগ্রহ করিতেও আর তাহাদের ছল কৌশল ছিল না। যখন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ছিলেন, তখন যে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে প্রভু প্রভু করিয়া নানারূপ স্তুতি করিত, তাহাদের মুখের একটু প্রতিষ্ঠা শুনিতে আর তাঁহাদের কর্ণ নৃত্য করিয়া উঠিত না। তাই তাঁহারা লোক দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করিতে যত্নবান ছিলেন, নির্জ্জন স্থানে ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ রহিত হইয়া, ভগবানের ধ্যান ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিষয়ী লোক তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে দীনতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতেন। জনতা বা লোক কোলাহল ভক্তিনাশক বলিয়া প্রচার করিতেন। (সজ্জনতোষিণী রূপ গোস্বামী)। লোক প্রতিষ্ঠাকে কাকবিষ্ঠা বলিয়া ঘৃণা করিতেন এবং সাধন করিতে বসিয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাধকের কর্ত্তব্য জগতকে আপন আপন আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলনে।

কিন্তু আমার মত সন্ন্যাসীর পক্ষে তাঁহাদের আচরণ অসাধ্য। আমি যে পর্ণকুটীরে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি প্রভূত ধন সম্পত্তির সুখসম্ভোগের মর্ম্ম যে অজ্ঞাত ছিলাম। লোকে যে আমার

পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে আমাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন করিত। সুতরাং প্রভু হইলে কি আনন্দ আমি যে তাহা অজ্ঞাত আছি। তাই গৃহস্থ হইয়া যাহা ভোগ করিতে পারি নাই সন্ন্যাসী হইয়া তাহার সংগ্রহে মনোনিবেশ করি। তাই দৃষ্টি ভগবানের প্রতি উত্থিত না করিয়া মন অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য দ্বারে দ্বারে পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যে বিবাহ করিতে পারিল না বলিয়া বৈরাগী হয়, সে সেবাদাসী সংগ্রহ না করিয়া থাকিতে পারে না।

যাহারা আমার মত সন্ন্যাসী তাহারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মত ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করা অযোগ্য ও অপমানসূচক মনে করে। আমার মত সন্ন্যাসী মনে করে, যদি সন্ন্যাসী হইয়াও দীনহীন কাঙ্গালের মত দিন যাপন করিতে হয় তবে আর সন্ন্যাসী হইয়া লাভ কি! প্রাচীন কালের সাধকগণ পর্ব্বতের গুহায় অথবা পর্ণ-কুটীরে বসিয়া সাধনা করিতেন। মধ্যযুগের মহাপুরুষবৃন্দ ভিখারীর বেশে সামান্য ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া ভজন-সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের ভজন-সাধনের আয়তন বৃহৎ ও সমধিক মূল্যবান, তাই তাহা সামান্য কুটীরে সম্ভব হয় না। তাহার জন্য রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের প্রয়োজন, মূল্যবান তৈজস পত্রে সে হর্ম্ম্য সজ্জিত করার প্রয়োজন, বিলাসযোগ্য বিছানাযুক্ত পালঙ্ক দ্বারা তাহার পরিশোভন প্রয়োজন, এবং শিষ্য শিষ্যানীর দঙ্গলে তাহা কোলাহলময় করা প্রয়োজন। এ সকল অসম্ভব হইলে দুঃখে কষ্টে ঘর গৃহস্থালী করাই কর্ত্তব্য।

কলির প্রভাবে যোগের অপেক্ষা ভোগের পিপাসা প্রবল হইয়াছে। মানুষ সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ করে, সংসারের কর্ত্তব্য-সাধনে ভীত ও বিরক্ত হয় সেই "দায় এড়াইতে" সন্ন্যাসী হয়।

এখন জ্ঞান বৈরাগ্যে জগতের নশ্বরত্ব অনুভব করিয়া, অবিনশ্বর পদার্থের

অনুসন্ধানে মানুষ সন্ন্যাসী হয় না। সংসারে যে সকল ভোগ্য লাভে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, সেই সকল ভোগ্যবস্তু সন্ন্যাসী হইলে অনায়াসে লাভ করিবে ভাবিয়াও কেহ কেহ সন্ন্যাসী হয়। গৃহস্থ হইয়া গৃহস্থের দ্বারে গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ভিক্ষার্থী হইলে, মুজুরী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আদেশ করে। কিন্তু সাধুর পরিচ্ছদে চাঁদার খাতা হস্তে করিয়া বহির্গত হইলে লোকে উদ্যোগী হইয়া অর্থ সাহায্য করে। এবং সে অর্থদানকে পরম ধর্ম্ম মনে করে। কারণ, "সাধু ভজন সাধনের জন্য আশ্রম করিতেছেন, সে আশ্রমে সাধু-সজ্জনের সমাগম হইবে, সাধু তত্ত্বের আলোচনা হইবে, ভগবানের নাম ও মহিমার শ্রবণ কীর্ত্তন হইবে, ইত্যাদি বিশ্বাসে মানুষ অন্বিত হয় এবং এরূপ সাহায্যে ধর্ম্মের সাহায্য করিলাম বলিয়া আনন্দিত হয়। সাধু যে বিলাস-কাননে বিলাস-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাঁদা তুলিতেছেন, এ ধারণা কাহারও অন্তরে তখন স্থান পায় না।

সাধু বিলাস মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, শিষ্য ও শিষ্যানীগণ সঙ্গে, শেষে তাহার মধ্যে লীলা আরম্ভ করেন। সে লীলায় যে সকল অনর্থের উৎপত্তি হয় তাহা বর্ত্তমান যুগে অনেক আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং হইয়াছে। গুরু যেমন হয়, তাহার শিষ্যও তেমনি হয়। গুরু যখন ভোগের জন্য উন্মত্ত, শিষ্য ও শিষ্যানীগণ সে ভোগের পথ পরিষ্কার করিয়া গুরু-সেবায় অনুরাগী হয়। তাই বলিতেছিলাম এখন আশ্রম শব্দের অর্থ, "অমৃত শব্দের অর্থ গরল যেমন" সেইরূপ হইয়াছে।

একবার কোন তীর্থে যাইয়া এক স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী সরস্বতী এই সবই তাঁহার একার উপাধি। স্বামীজীর সাধন-ভজনের অবসর নাই। কোন বড় লোক ভক্ত, তাঁহার আশ্রম নির্ম্মাণে এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্ত্রী,

সম্বন্ধী, সম্বন্ধিনী, কন্যা, ভগ্নী, সকলে আসিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাদেরই সেবা পরিচর্য্যায় উন্মত্ত। ছেলেগুলিকে কোলে করিয়া শান্ত করিতেছেন। বড়মানুষের পত্নীর সম্মুখে ছেলে কোলে করিয়া, তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন। আপন হাতে কপি আলু মটর শুঁটীর ধামা লইয়া বাবুর শালীর সম্মুখে রাখিতেছেন। আর এক একবার "এত আপনাদেরই ঘর, আপনাদেরই আশ্রম, আমি ত নিমিত্ত মাত্র" ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত স্ত্রীলোকের নিকটেই জোড়হাত করিতেছেন।

বৈকালে স্বামীজি স্ত্রীলোকের দঙ্গল সঙ্গে করিয়া বাজারে বহির্গত হইলেন। চুড়ির দোকানে যাইয়া আপন হাতে বাবুর সপ্তদশ বর্ষীয়া এক কন্যার হাতে চুড়ি পরাইতে লাগিলেন। একটি রসিক দর্শক বলিল, "এত কাল পরে স্বামীজী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন।"

যাহা হউক তীর্থের তীর্থত্ব যে সাধুকে লইয়া আজ সেই সকল সাধুদের এই প্রকার দুর্গতি অথবা এই সকল দুর্জ্জন সাধুর পরিচ্ছদে তীর্থকে কলঙ্কিত করিতেছে।

জানি না আর কত কালে ভগবানের ইচ্ছায় বিলাসমন্দির আবার ভজন-কুটীরে পরিবর্ত্তিত হইবে। আর কত দিনে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মানুষ ত্যাগের চূড়ান্ত সাক্ষী জগতের সমক্ষে স্থাপন করিবে! এবং পরম শান্তিময় ভগবানের শ্রীচরণ কমলে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসীগণ জাগতিক সুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে।

এবারের মত আমার তীর্থচিন্তা এইখানেই শেষ করিলাম, জানিনা আমার বক্তব্য শুনিয়া পাঠকগণ সুখ পাইয়াছেন কিনা। যদি পাঠকগণের আগ্রহ বুঝি তবে পুনরায় দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ করিব।

"জয় গৌর নিত্যানন্দ"

শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম "জীবেদয়া" এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীধাম নবদ্বীপে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণ দাস দেবের নামে সন ১৩১৮ সালে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেবাশ্রমে বর্ত্তমান সময় চারিটী বিভাগ আছে। (১) অনাথ আশ্রম। (২) আতুরাশ্রম। (৩) রোগী-নিবাস। (৪) দাতব্য ঔষধালয়। এতদ্ব্যতীত বাহিরের রোগীসেবা যথা-সাধ্যভাবে অসহায় ও পরিত্যক্ত মৃতদেহের যথাবিহিত সৎকার, বিদেশী যাত্রীগণের অভাব অভিযোগ যথাসাধ্য ভাবে দূরীকরণ, কেহ পথ কিম্বা সঙ্গী হারাইলে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেওয়া, দরিদ্র রোগীদিগকে আশ্রমস্থ এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিভাগ হইতে বিনামুল্যে ঔষধাদি দেওয়া দরিদ্র মেধাবীছাত্রগণের আহার বাসস্থান ও পুস্তকাদির ব্যবস্থা করা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন মহাশয় এই সেবাশ্রম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "**এই সেবাশ্রম ছাড়া সর্ব্বপ্রকারে মানুষের সেবা করার দ্বিতীয় স্থান আর নবদ্বীপে নাই।**"

"ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম। মানুষ হইয়া মানুষকে ভালবাস, মানুষের সেবা কর। মানুষের মধ্যেই শ্রীভগবান্ ইহাই নরলীলা—ইহাই প্রেমধর্ম্ম। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়া যে যুগধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহার প্রথম কথা ও প্রধান কথা 'জীবে দয়া।"

পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকা অযত্নে ও অনাহারে কাঁদিয়া মরিয়া, যাইতেছে তাহাদের অন্ন দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের মানুষ কর, ধার্ম্মিক মানুষ কর। মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা, মানুষই শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ। নিরাশ্রয় রুগ্ন বৃদ্ধ বৃদ্ধা রোগে ভুগিতেছে, কষ্ট পাইতেছে তাহাদের রক্ষা কর, সেবা কর, ইহাই ভগবানের সেবা। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ নিজে আচরণ করিয়া এই ধর্ম্ম শিখাইয়াছেন।

প্রবল মানুষ অসুর হইয়া দুর্ব্বলকে বঞ্চনা করিতেছে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে তোমরা দুর্ব্বলকে রক্ষা কর প্রবলের তোষামদ করিও না। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন, বঞ্চনাকারী ব্যবসায়ী ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া লোক ঠকাইতেছে প্রতারিত হইবেন না। সেবাশ্রমে আসুন ধর্ম্ম কথা শুনুন প্রকৃত ধর্ম্ম কি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ প্রেম, সেবা প্রভৃতি কি, শিক্ষা করুন আর সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন। "জীবে দয়া" না করিলে সবই বিফল। ধর্ম্মের ইহাই সার কথা। রাধারমণ সেবাশ্রম "জীবে দয়া" পরম ধর্ম্মের বিগ্রহ স্বরূপ। সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন, ধন্য হইবেন, নবদ্বীপ আসা সার্থক হইবে।"

আমরাও পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে একসুরে বলি, "মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা" যিনি যে ভাবে পারেন সেবাশ্রমের জন্য সাহায্য করুন। সাহায্যকারী সেবাশ্রমের মোহর যুক্ত সম্পাদকের সাক্ষর সম্বলিত রসিদ দেখিয়া লইবেন। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য। কেহ ডাকে সাহায্য পাঠাইলে শ্রীযুক্ত বিহারীদাস বাবাজী, শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ নবদ্বীপ নদীয়া, এই ঠিকানায় অথবা শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক রাধারমণ সেবাশ্রম, বড়াকঘাট, নবদ্বীপ, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কলিকাতার মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দে—সেন লাহা এণ্ড কোং ৫৩।এ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায়ও পাঠাইতে পারেন। যেখানেই যেভাবে সাহায্য করিবেন সম্পাদকের সাক্ষরযুক্ত রসিদ না পাইলে বুঝিবেন উহা সেবাশ্রমে পৌছিবে না। অন্যান্য বিষয় পুলিন বাবুর নিকট জানিতে পারিবেন।

নিবেদক বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

পানিহাটী

সময়

বেহাগ।

সময় কৈ গে…ল…।

যায়নি সময়, সময়ে আসিবে সময়,
সে সময়ের সময় কৈ গেল ॥
দেখিলে সময় অবসর সময়ে,—
রাখিলে সময় সময় সময়ে ;—
দেখিবে সময়-আসিবে সময়ে,—
সে সময়ের সময় কৈ গে…ল ॥
আসে না সময় কখন অসময়ে,—
আসে সব সময় সময় সময়ে ;—
হইলে সময়-সময় সময়ে,—
দেখিবে সময়ে এ…ল ॥

আমার এ সময় বড় অসময়,—
হ'তে পারে সময় এ সময়ে সময় ;—
হয়ত ভাবিতে হবে না রে সময়
সে সময়ের সময় ঐ এ...ল ॥

অসময়ে—

শচীন্দ্রকুমার ঘোষ।

"শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কলিযুগ পাবনাবতার অনন্ত লীলারসময় বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীধাম নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুদিন পর শ্রীবৃন্দাবন গমন মানসে বহির্গত হইয়া কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া অত্যন্ত লোক সংখ্যা দেখিয়া ফিরিয়াছিলেন। সেই সময় শান্তিপুর, হালিসহর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর সন্নিকট ভাগীরথী তীরবর্ত্তী বরাহনগর মালিপাড়া শ্রীল রঘুনাথ পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রীত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ও প্রত্যাগমন সময়ে রঘুনাথ পণ্ডিতকে "ভাগবতাচার্য্য" এই উপাধি দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি ভক্ত সাধারণে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীপাটকে "শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী" বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন।

এক সময় শ্রীপাটের বৈভব বর্ণনাতীত ছিল। কিন্তু সর্ব্বধ্বংশী কালের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকল বাহিরের বৈভব শ্রীহীন হইয়াছে সত্য কিন্তু এখনও সেই পণ্ডিতরাজের প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহাদি বর্ত্তমান। কলিকাতার এত নিকটবর্ত্তী হইলেও অনেকে শ্রীপাটের বিষয় সবিশেষ অবগত নহেন। অস্তু যাহাই হউক শ্রীপাটের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে ভক্তগণ প্রকৃত পক্ষেই ব্যথিত হইয়াছিলেন কিন্তু কি জানি প্রভুর কি ইচ্ছা, পূর্ব্ব সেবাইতগণ দ্বারা কোন মতেই শ্রীপাটের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইল না।

রঙ্গিয়া প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গের কথা আর কি বলিব। সেবাইতগণ স্বইচ্ছায় ১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র তারিখে রেজেষ্টারী করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ও অপরাপর শ্রীবিগ্রহাদির সহ উহার সেবা ও সমস্ত সম্পত্তি এবং ইমারত প্রভৃতি নিঃসত্বভাবে শ্রীশ্রীনিতাই প্রেমে পাগল সুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক প্রেমকণ্ঠ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়কে দিয়াছেন। ঐ তারিখ হইতে পূর্ব্ব সেবাইতগণের বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণের উহাতে কোনই দাবী রহে নাই। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়কে সম্পূর্ণ-রূপে আদান প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ এই শ্রীপাট বাড়ী বাবাজী মহাশয়ের হস্তগত হওয়ায় এবং পাটবাড়ীটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমও স্থায়ীভাবে ঐস্থানে হইবার সুযোগ হইয়াছে। এ সংবাদে নিশ্চয়ই সকলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

এখন আমরা খুবই আশা করিতে পারি যে, অচিরেই শ্রীপাটের মন্দিরাদি এবং অন্যান্য লুপ্তপ্রায় অতিতের মহা পুণ্যময় স্মৃতিগুলি সংস্কার হইয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু একটী কথা সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সংস্কার কার্য্য সম্পাদনে যে অর্থের

প্রয়োজন তাহা আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা না হইলে হইবে না। আসুন, ভাগ্যবান ভক্তগণ, সামান্য অর্থের বিনিময়ে প্রাচীন মহাতীর্থের উদ্ধার ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনামপ্রচারের কেন্দ্রস্থলরূপ বাবাজী মহাশয়ের আশ্রম সংরক্ষণে সহায়তা করিয়া নিজেকে ধন্য করুন। মনে রাখিবেন সর্ব্বদা এমন সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় নিজে হাতে কিছু করিবেন না, করিতে হইবে আপনাদের। যাহার আছে তিনি এমন সৎ ও অত্যাবশ্যক সদনুষ্ঠানে সাহায্য না করিলে অর্থের অপব্যবহার করা হয় বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন

"দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং স্বাত্ত্বিকস্মৃতং"

এই পুণ্যানুষ্ঠানে যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীপাট বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দিয়া আসিতে পারেন, অথবা শ্রীপাটের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দে, সেন লাহা এণ্ড কোং ডাক্তার খানা ৩৩।এ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। এ সম্বন্ধে কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জানিতে পারিবেন। শ্রীপাট-বাড়ীর প্রাচীন ইতিহাস বিস্তৃতভাবে সংগ্রহ হইয়াছে, আমরা শীঘ্রই উহা ভক্তগণের নিকট উপস্থিত করিব।

বিনীত নিবেদক বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীহরিদাস নন্দী।

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীপাটবাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব।—বিগত ২৩এ চৈত্র শনিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষে বরাহনগর মালিপাড়া শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাটীতে ২৪ প্রহর নামকীর্ত্তন মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৯এ চৈত্র মঙ্গলবার শুভ অধিবাস কীর্ত্তন হইয়া ২০এ চৈত্র বুধবার হইতে ২৩এ চৈত্র শনিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চব্বিশপ্রহর নাম কীর্ত্তন হইয়া ঐ দিন প্রাতে সামান্ত রকম নগরসংকীর্ত্তন ও মহোৎসব হয়। বৈকালে উক্ত পাটবাটীতে স্থাপিত টোলের পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীমহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনলীলা ও রঘুনাথ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত শ্রবণ ও তাঁহাকে ভাগবতাচার্য্য উপাধীদান আখ্যানটী তিনঘণ্টা ব্যাপী ভক্তগণসঙ্গে কীর্ত্তন করেন। পরদিন ২৪এ চৈত্র রবিবার প্রাতে উক্ত বাবাজীমহাশয় ভক্তগণসঙ্গে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগারাধনা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং সমাগত ভক্তবৃন্দের সেবা হয়। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

এবার মহোৎসবে যেরূপ লোকসমাগম হইয়াছিল তাহাতে শীঘ্রই কীর্ত্তন মহোৎসবের জন্ত সুবিস্তৃত স্থান হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইল।

শ্রীপাটের সংস্কার সম্বন্ধে ভক্তগণের নিকট আবেদন এই সংখ্যাতেই স্থানান্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে, সকলে উদ্যোগী হইলে, আগামী বৎসরের উৎসবের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা হইবে আশা করা যায়।

শ্রীভাগবদ্ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা।—ভবানীপুর ১৬নং অভয়চরণ সরকারের লেনে উক্ত সভার ষড়বিংশ বার্ষিক অধিবেশন বিগত ১৩ই চৈত্র হইতে ১৮ই চৈত্র পর্য্যন্ত হইয়াছে, সভার কর্ত্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সভার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্যের আন্তরীক যত্নে পূর্ব্বের মতই উৎসব হইতেছে। সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। তাঁহার অবর্ত্তমানে সকলে চেষ্টা করিয়া যে সভাটী বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে যথার্থই তাঁহারা ধন্তবাদের পাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু সভার সর্ব্ববিধ উন্নতী করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সভার সম্পাদক মহাশয় এবার পূর্ব্বের ন্তায় কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভাগবতাশ্রমে স্মরণ মহোৎসব।—বিগত ২১এ চৈত্র ভক্তি-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের শুভ জন্ম তিথি ছিল। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ২১এ চৈত্র হইতে ২৩এ চৈত্র পর্যান্ত অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি হইয়াছে। শ্রীমান্ অনাথবন্ধু ও গোপীবন্ধু পিতৃদেবের পদানুসরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ শ্রীগোবিন্দের নিয়মিত লীলা উৎসবগুলি বজায় রাখিয়া যথার্থই বংশোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। মঙ্গলময় শ্রীভগবান ইহাদের মঙ্গল করুন।

ঢাকা হরিসভা।—বিগত গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে ১০ই চৈত্র হইতে ১৬ই চৈত্র পর্য্যান্ত ঢাকা হরিসভার ১৫শ বার্ষিক উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নদীয়াবিনোদ গোস্বামী এই দুইজন ছিলেন এবারের সভার বক্তা। কুলদাবাবু তিন দিন ও নদীয়াবিনোদ প্রভু দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভক্তিসম্পাদক মহাশয় প্রত্যহই বক্তৃতার প্রারম্ভে ও অন্তে সঙ্গীত করিয়াছিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-তালিকায় কীর্ত্তনের যেরূপ তালিকা ছিল অসুস্থতা নিবন্ধন কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া যোগ দিতে না পারিলেও কীর্ত্তনের অভাব হয় নাই। সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক তাঁহার স্বভাব সুলভ সুকণ্ঠে কয়েকদিনই কীর্ত্তনে শ্রোতৃবর্গের আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। সভার কর্ত্তৃপক্ষ সভার স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। সভাটী যখন সাধারণের তখন সকলেই এ কার্য্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশাকরা যায়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন উৎসব।—বিগত ১৪ই চৈত্র ফাল্গুনী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি শ্রীমন্মহাপ্রভুর হালিসহরে আগমন তিথি ছিল। এতদুপলক্ষে সেখানে যথাযথ ভাবে উৎসব হইয়াছে। শনিবার ১৬ই চৈত্র পানিহাটী হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় সদলে গিয়া খুব নামকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ করিয়াছেন। পরদিন রবিবার শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় ফরিদপুর হইতে আসিয়া যোগদান করিয়া ছিলেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীপাটের উন্নতী বিধানে যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, সম্প্রদায়ের সকলকেই আমরা তাঁহার অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি। লুপ্তপ্রায় শ্রীপাটের কীর্ত্তি বজায় রাখিতে বর্ত্তমান সময় আমরা পূজনীয় বাবাজী মহাশয়কেই একমাত্র অগ্রণী দেখিতে পাই।

বাহিরে হৈ-চৈ করিয়া এক একটা নূতন প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া প্রাচীন কীর্ত্তি-গুলি যাহাতে বজায় থাকে তাহার চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (৪৪৩—৪৪৪ চৈতন্যাব্দ)

—*—

বৈশাখ

শ্রীরাম নবমী	৫ই বৃহস্পতিবার (কলিকাতায় পূর্ব্ব দিনে)
একাদশী	৭ই শনিবার
দমন কারোপণোৎসব	৮ই রবিবার
শ্রীবলদেবের রাসযাত্রা	১০ই মঙ্গলবার
একাদশী	২২এ বুধবার
অক্ষয় তৃতীয়া	২৮এ শনিবার

জ্যৈষ্ঠ

জহ্নু সপ্তমী	১লা বুধবার
শ্রীসীতা নবমী	৩রা শুক্রবার
একাদশী	৫ই রবিবার
শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা (ফুলদোল)	৮ই বুধবার
একাদশী	২১এ মঙ্গলবার

আষাঢ়

একাদশী	৩রা সোমবার
শ্রীস্নানযাত্রা	৮ই শনিবার
একাদশী	১৯এ বুধবার
শ্রীরথযাত্রা	২৪এ সোমবার
পুনর্যাত্রা	৩২এ মঙ্গলবার

শ্রাবণ

একাদশী (শয়ন)	১লা বুধবার
শ্রীহরির শয়ন (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ)	২রা বৃহস্পতিবার
একাদশী	১৬ই বৃহস্পতিবার
শ্রীঝুলন যাত্রারম্ভ	৩০এ বৃহস্পতিবার
একাদশী	৩১এ শুক্রবার

ভাদ্র

পবিত্রারোপণ	১লা শনিবার
শ্রীঝুলন পূর্ণিমা	৩রা সোমবার (রাত্রিতে ঝুলন যাত্রা সমাপন)
শ্রীবলরাম জন্মযাত্রা	৪ঠা মঙ্গলবার
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	১২ই বুধবার
শ্রীনন্দোৎসব	১৩ই বৃহস্পতিবার
শ্রীএকাদশী	১৫ই শনিবার
শ্রীরাধাষ্টমী	২৬এ বুধবার
একাদশী (বিজয়া মহাদ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও শ্রীবামন দ্বাদশী,	৩০এ রবিবার

আশ্বিন

একাদশী	১৩ই রবিবার
শ্রীবিজয়োৎসব	২৭এ রবিবার
একাদশী	২৮এ সোমবার (অদ্য হইতে একমাস নিয়ম সেবা)
শ্রীশরদ্রাস	৩১এ বৃহস্পতিবার

কার্ত্তিক

একাদশী	১১ই সোমবার
শ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা (অন্নকূট মহোৎসব)	১৬ই শনিবার
	(প্রদোষে বলি দৈত্যরাজ পূজা)
যমদ্বিতীয়া (মধ্যাহ্নে শ্রীযমরাজ পূজা)	১৭ই রবিবার
শ্রীগোপাষ্টমী	২৩এ শনিবার
একাদশী (উত্থান)	২৭এ বুধবার
ভীষ্ম পঞ্চক (অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত)	২৭এ বুধবার
প্রবোধনী, শ্রীহরির উত্থান, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপ্তি	২৮এ বৃহস্পতিবার
শ্রীরাস যাত্রা	৩০এ শনিবার

অগ্রহায়ণ

কাত্যায়নী ব্রতারম্ভ (অদ্য হইতে ১মাস ব্রত হইবে)	১লা রবিবার
একাদশী	১১ই বুধবার
একাদশী	২৬এ বৃহস্পতিবার

পৌষ

একাদশী	১১ই বৃহস্পতিবার
একাদশী	২৭এ শনিবার

মাঘ

একাদশী	১১ই শনিবার
বসন্ত পঞ্চমী	২০এ সোমবার
মাকরী সপ্তমী (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব)	২২এ বুধবার
ভীষ্মাষ্টমী	২৩এ বৃহস্পতিবার
একাদশী (ভৈমী)	২৬এ রবিবার
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব	২৮এ মঙ্গলবার

ফাল্গুন

একাদশী	১২ই সোমবার
শিবচতুর্দ্দশী	১৫ই বৃহস্পতিবার
একাদশী (আমর্দ্দকীব্রত)	২৭এ মঙ্গলবার
শ্রীদোল যাত্রা (শ্রীগৌর পূর্ণিমা)	৩০এ শুক্রবার

চৈত্র

একাদশী (বাঞ্জুলী মহাদ্বাদশী)	১২ই বুধবার
শ্রীরাম নবমী	২৪এ সোমবার
একাদশী	২৬এ বুধবার
দমন কারোপণোৎসব	২৭এ বৃহস্পতিবার
শ্রীবলদেবের রাসযাত্রা	২৯এ শনিবার

সম্পাদকীয়—এবার বঙ্গবাসী পঞ্জিকার বৈষ্ণব ব্যবস্থাপক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের মতানুযায়ী ব্যবস্থা যাহা বঙ্গবাসী পঞ্জিকায় প্রকাশ হইয়াছে তাহাই ভক্তিতে প্রকাশ হইল।

ভক্তি বিজ্ঞাপনা

পুলিনের সিদ্ধ তৈল

খোস, চুলকানি হইতে আরম্ভ করিয়া কাউর কার্ব্বাঙ্কল

এমন কি নিয়মিত ব্যবহারে

গলিতকুষ্ঠ

পর্য্যন্ত ভাল হয়। যাবতীয় ঘায়ের

ব্রহ্মাস্ত্র

এক শিশি ঘরে থাকিলে বিশেষ উপকার হইবে।

২ আউন্স শিশি ।।৹ আনা। ৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

পুলিনস্ রিলিফ্ বাম

যে কোন প্রকারের বাত, আঘাত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, গলক্ষত, মাথা ধরা, বুকে সর্দ্দি বসা, দাঁতের বা কাণের বেদনা প্রভৃতিতে অব্যর্থ। একবার ব্যবহার করিলে ইহার গুণ ভুলিতে পারিবেন না। মূল্য প্রতি শিশি ।।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

সেন লাহা এণ্ড কোং

৫৩।এ ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ভক্তি"র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৬

আর কবে ডাকিব তোমায় ?

দিবসের যাহা কাজ, সমস্ত করিয়া আজ,
ওই হায় অস্তাচল শিরে,—
দিনমণি বসিলেন ধীরে।
দিবস ফুরা'য়ে গেল, সন্ধ্যা যে হইয়া এল,
আজি ত চলিয়া গেল হায় !
এমনি করিয়া সে ত, আসে যায় অবিরত,
দিন আসে পুনঃ চ'লে যায়।
এইমত রাত্রি দিন, চলিছে বিরামহীন,
কতদিন গিয়াছে এমন ;
যেদিন যাইবে চ'লে ডাকিলে চোখের জলে,—
তা'রে আর পাব না কখন।

এইমত দেখে তবু,　　শিক্ষা না হ'তেছে প্রভু,
জীবনের দিন চ'লে যায় ;
হায় কি করিনু তবে,　　আসি ওগো এই ভবে,
না ডেকে তোমার দয়াময় !
মিথ্যা এ জীবন ল'য়ে,　　মিথ্যা শুধু ভার ব'য়ে,
মিছা কাজে দিন ব'য়ে যায় ;
সবি মোর মিথ্যাময়,　　সত্য তুমি দয়াময়,
এখন (ও) না ডাকি যদি হায় !
আর কবে ডাকিব তোমায় ?

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত)

(২৪)

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর আগে আগে লোকে ফুল ছড়াইয়া যাইতেছে।

"পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।"

নাচিতে নাচিতে তিনি গঙ্গার নিকট আসিলেন, এবং গঙ্গার ধার দিয়া যে পথ আছে সেই পথ দিয়া চলিলেন,—

"আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধবের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোনা ঘাট নাগরিয়া ঘাটে গিয়া
গঙ্গার উপর দিয়া গেলা সিমলিয়া॥"

এই সিমলিয়াতে চাঁদ কাজির বাড়ী। প্রভু নাচিতে নাচিতে মোহন ভঙ্গিতে চলিয়াছেন। সেই প্রকাণ্ড নগর নবদ্বীপ, সেই নিশিতে কড়ি, খই, পুষ্পময় হইয়াছে। জলস্রোতের মতই জনস্রোত, তাঁহার সহিত চলিয়াছে। লোকে দেহ গেহ ভুলিয়াছে। তাহারা কোথায় চলিয়াছে এবং কেন যাইতেছে তাহা স্মরণ নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কার্য্যে ভুল নাই। তিনি কাজি-পাড়ার পথ ধরিলেন, আর অমনি সেই লক্ষকণ্ঠে "মার কাজি" "মার কাজি" ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন কাজি বাড়ীর বাহির হইয়া, সেই বিশাল জনতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। আর তাহার সেই পাইকগণ এই জনতার মাঝে আত্ম-গোপন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। কাজিও আর অন্য উপায় না দেখিয়া, বাড়ীর ভিতর লুকাইয়া পড়িল।

নিমাই কাজির বাড়া আসিয়া,—সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া কাজিকে ডাকিলেন। কাজি আসিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে, শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন।

কাজি দেখিলেন প্রভুর মুখ করুণায় পূর্ণ, সে মুখ তাহার হৃদয় ধরিয়া টানিতেছে। তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিতেছেন— "গৌরহরি, তোমার মাতামহ গ্রাম্য সম্পর্কে আমার কাকা, সেই সম্পর্কে তুমি আমার ভাগিনা, তুমি আমার দোষ ক্ষমা কর আর আমি কীর্ত্তনে বাধা দিব না। আমি যে আর কীর্ত্তনে বাধা দিব না তাহা তুমি আসবার পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি। কারণ ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত পাইককে কীর্ত্তনে বাধা দিতে পাঠাইয়াছি তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম ও হরিনাম, আপনা হইতেই উচ্চারিত হইতেছে। তাহারা চেষ্টা করিয়াও উহা ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহার উপর রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন এক নররূপী সিংহ আমার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, বুঝিয়াছি এই কীর্ত্তনে ঈশ্বরের শক্তি আছে।"

কাজি শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কথা কহিতেছেন আর ধীরে ধীরে তাহার মনে একটী ভাবের উদয় হইতেছে। তাহা এই যে, তাঁহার সম্মুখের এই বস্তুটী স্বয়ং শ্রীভগবান, ক্রমে এ ভাব তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "গৌরহরি হিন্দুগণ যাহাকে নারায়ণ বলেন, তিনিই তুমি।"

তখন দয়াল গৌরহরি, কাজির একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন "তুমি নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরিনাম উচ্চারণ করিলে ইহাতে তোমার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইল।"

তাহাই হইল। নিমাইর অঙ্গুলি স্পর্শে, কাজির নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল। তিনি ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় প্রভুর চরণে পড়িয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

প্রভু কাজিকে সত্য সত্যই বড় কৃপা করিলেন। আর তদবধি কাজি সপরিবারে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করিতে লাগিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কাজি বাদশাহের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ যদিও তাঁহাকে সমাজে লইলেন না, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের আচার ব্যবহার হিন্দুর মতই হইল। সেই কাজির কবর অদ্যাপি বিরাজিত, তাহা আমরা দর্শন ও স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আজিও তথায় ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কাজির বংশের এখন আর পূর্ব্ব সৌভাগ্য নাই। তাহারা এখন পথের ভিক্ষুকের ন্যায় দরিদ্র। পূর্ব্বের সে বাড়ীও আর নাই। ২০০।২৫০ শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহারই কিছু কিছু অংশ আছে। বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীর নাম ফজলে খোদা। তাহারা গৌর ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

(নিমাইয়ের নানা লীলা)

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে ॥
আপন বন্ধুয়া, বান্ধিয়া আনিব,
আমি না ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জিউ,
নারী বধ দিব তারে ॥
পুনঃ ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম নাগরের হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে ॥
জ্ঞানদাস কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনী রাধা,
মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা ॥"

নিমাই ভক্তদিগের নিকট, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, দুর্গা, ব্রহ্মা প্রভৃতি নানা দেব দেবী রূপে এবং পুরাণোক্ত নানা অবতার রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন।

একদা নিমাই, দেব গৃহে শ্রীভগবান রূপে প্রকাশ পাইয়া নিতাইকে বলিলেন, "আমার রূপ দেখ" নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন প্রভুর আদেশে ভক্তগণ বাহির হইয়া যাইলে নিতাই রূপ দেখিয়া, আনন্দ ভাবে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একদা শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছাক্রমে, নিমাই তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। নিতাই পরে আসিয়া উহা দর্শন করেন। এবং উভয়েই সেরূপ দেখিয়া, ভয়ে চক্ষু মুদিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। পরে তিনি রূপ সম্বরণ করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিলেন "মাতাল তোকে কে এখানে ডাকিল ?" নিতাই বলিলেন—"আমি ঠাকুরের দাদা, আমি ত থাকিবই, তুমি এখানে কেন ?

শ্রীঅদ্বৈত তখন ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার আবারও জাত কি হে ? বৃন্দাবনে ত যার তার ঘরে ভাত খেয়ে বেরিয়েছ, এখানে এসে আবার ঠাকুরের দাদা হ'য়ে ব'সেছেন।"

নিত্যানন্দ। সন্ন্যাসীর আবার অন্নে দোষ কি ? তুমিত কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘোর সংসারী। এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ তোমার কি প্রাণে ভয় নাই ?

সকলে সে মধুর দৃশ্য উপভোগ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই উভয়ে কোলাকুলি করিলেন।

* * * *

প্রভুর শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ প্রীতি অতুলনীয় ছিল। কোন সময়ে শ্রীবাসের পুত্র বিয়োগজনিত দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন "পণ্ডিত ! তুমি আমার নিজজন। তোমাকে সান্ত্বনা বাক্য বলা আমার উচিত। তোমার পুত্র পরলোকগত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্ররূপে বর্ত্তমান রহিলাম।"

* * * *

নিমাইর অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখিয়া, সকলে চমৎকৃত। তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইনি "শুক কিংবা প্রহ্লাদ" হইবেন। আবার কেহবা, তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিতেছেন। তাহার উপর তাঁহার নবীন যৌবন, অপার্থিব রূপ, শত শত ব্যক্তি তাঁহার পদানত। এ সুখ দেখিয়া, প্রকাণ্ড একদল লোক তাঁহার শত্রু হইয়াছে। কেহ বলিল, "শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইয়াছে" কেহ বলিল, "উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে" কেহ কেহবা, তাঁহাকে প্রহার করিবার পর্য্যন্ত, পরামর্শ করিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ, লোকের পরামর্শ, ক্রমে ক্রমে সমস্তই জানিলেন। তখন একদিন, তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! নগরে পরামর্শ হইয়াছে যে, আমাকে মারিবে, একথা কি আপনি শুনিয়াছেন?" নিত্যানন্দ দুঃখে অধোবদন হইয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিলেন, আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, আমি সন্ন্যাসী হইব, তখন আমার ভিক্ষুকের মত অবস্থা দেখিয়া, লোকে নরম হইয়া, হরিনাম গ্রহণ করিবে। কেহই আমার উপর দ্বেষ রাখিবে না।

প্রভুর বাক্যে, নিত্যানন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। অতি দুঃখে তাঁহার আয়ত নেত্রদ্বয় হইতে জল পড়িতে লাগিল।

* * * *

আজ নদীয়াবাসীর বড়ই নিরানন্দের দিন। গত রজনীতে, নদীয়ার চাঁদ নদীয়া আঁধার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রাতে দাবানলের ন্যায় সে সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। আর সকলে ব্যস্ত হইয়া প্রভুর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিলেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বাসুঘোষ প্রভৃতি আছেন। তাঁহারা আসিয়া কি দেখিলেন তাহা বাসুঘোষের শ্রীমুখেই শ্রবণ করুন—

সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি।ধ্রু
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন তন্ত্র,
কিবা হৈল কিছুই না জানি॥
গৃহ মাঝে শুয়ে ছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কিবা করি গেলরে ছাড়িয়া॥
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষভাষা শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥"

মাতার বাক্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। নিতাই কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছেন, "মা চিন্তা কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করাইয়া দিব।"

নিতাই আরও বলিলেন "প্রভু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, কাটোয়ায়, কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, প্রথমে সেই স্থানে তল্লাস করা যাউক।" তখন তিনি বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর এই চারি জনকে লইয়া তীরের ন্যায় কাটোয়ার দিকে ছুটিলেন। এই সময়কার প্রাচীন পদ—

"তোমরা কেউ দেখেছ যেতে ।ধ্রু।
সোণার বরণ গৌরহরি অনেক সন্ন্যাসী সাথে।"
তার ছিড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢুলে ঢুলে যায়,
যেন পাগলের প্রায়।
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে,দণ্ড করোঙ্গা হাতে ।।

এদিকে নিতাই প্রমুখ পঞ্চ জনা আসিয়া, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় প্রভুর চরণে পতিত হইয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ নিমাই তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। জগতের ইতিহাসে সে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! কুলের কুলবধূ পর্য্যন্ত সে দৃশ্য দেখিয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল। প্রভু যে উদ্দেশ্য লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহার অর্দ্ধেক বোধ করি বা অত্রই সিদ্ধ হইয়াছিল।

প্রভুর কটির ডোরে কমণ্ডলু বাঁধা, হাতে দণ্ড। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলেই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। দৌড়াইতেছেন কিরূপ,—না বিদ্যুতের মত। পশ্চিমমুখে দৌড়াইতেছেন, একেবারে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া উঠিবেন। দেহ, গেহ একেবারে সমস্ত ভুলিয়াছেন। এই লক্ষ লক্ষ লোক কেহই প্রভুর সহিত দৌড়াইতে পারিল না। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছেন, তিনি তাই তাহাদের নয়নের আড় হইতে পারিলেন না।

ভক্তগণ প্রভুর সহিত দৌড়াইতে পারিতেছেন না? বুঝি বা তাহাদের প্রিয় আরাধ্য নিমাই চক্ষের অন্তরালে চলিয়া যায়। হায়! হায়! কি হইবে। নিতাইচাঁদ তখন কাতর হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আর দৌড়াইতে পারি না। "ভাই! তোমার এ অভাগা ভাইকে ফেলে যেও না। আমরা তোমাকে না দেখিলে প্রাণে মরিব।" বলিতে বলিতে নিতাই ভাবিতেছেন, তাইত করিতেছি

কি, শ্রীভগবানকে আমি ভাই বলিয়া ডাকিতেছি। উনি কৃপায় অবতার হইয়া জীবকে ভবসাগর পার করিতে আসিয়াছেন। আমিও উহার পদে প্রার্থনা জানাইব। তখন বলিতেছেন, "হে প্রভু! হে দয়াময়, হে দীননাথ! আমাকে উদ্ধার না করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

প্রভুর বাহ্য মাত্র নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ, বৃন্দাবনে যাইতেছেন। প্রাণ কানাইর সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার প্রাণের নিতাইচাঁদ এত করিয়া যে সাধ্য সাধনা করিতেছেন তাহা তাহার কাণেও যায় নাই। তিনি বৎসহারা গাভীর মত বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া কেবলই দৌড়াইতেছেন।

নিতাইচাঁদও জ্ঞানহারা, তিনি প্রাণের ভাইকে চোখের আড় না করিয় প্রাণপণে পিছু পিছু ছুটিয়াছেন। অপর ভক্তেরা পিছাইয়া পড়িয়াছেন। সে এক অপার্থিব দৃশ্য।

ক্রমশঃ

শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণ গৌরাঙ্গ *

বসুধা জাহ্নবা প্রাণ নিত্যানন্দ রায়।
গোরা প্রেমে আত্মহারা চঞ্চলের প্রায়॥
ত্রিভুবন পরিত্রাতা অদোষ দরশী।
কৃপাসিন্ধু প্রেমদাতা সর্ব্বচিত্তাকর্ষি॥
সর্ব্বভাবে গৌরাঙ্গের রসোল্লাসকারী।
রসের নাগর নিতাই রসের নাগরী॥

* সুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রেম-পাগল মহাত্মা শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পদামৃত আস্বাদনে লিখিত। (লেখক)

গোরা মন গোরা প্রাণ, গোরা আঁখিতারা।
অহর্নিশি গোরা প্রেমে পাগলের পারা॥
পূর্ণ শশী শ্রীগৌরাঙ্গ, নিতাই চকোর।
গোরাপদ কমলের মত্ত মধুকর॥
গোরা প্রেমে মাতোয়ারা হেলে দুলে যায়।
যারে দেখে তারে বলে ভজ গোরা রায়॥
মত্তমাতঙ্গ গতি পথ নাহি জানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দেয় জনে জনে॥
পাপী তাপী, অন্ধ জড়, পাষণ্ডী যবন।
অবিচারে কোল দিয়া দেয় প্রেম ধন॥
নিশি দিশি কেঁদে কেঁদে অরুণ নয়ন।
জীবের লাগিয়া চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
মহামত্ত মাতোয়াল নিত্যানন্দ রায়।
কেঁদে কেঁদে নদীয়ার পথে চলি যায়॥
ঊর্দ্ধবাহু প্রেম কণ্ঠে গোরানাম গায়।
দন্তে তৃণ ধরি জীবে গৌরাঙ্গ ভজায়॥
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ হুঙ্কার করয়।
কুল মান ছাড়ি সবে গৌর গৌর কয়॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বামী স্ত্রীমিলিয়া।
গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দে ফুলিয়া ফুলিয়া॥
ছুটিল প্রেমের বন্যা রসের লহরী।
পিরিতি বিলাসে মত্ত নদীয়া নাগরী॥
সর্ব্বত্র প্লাবিয়া ঢেউ খেলে নিরন্তর।
ডুবিয়া রহিল যত ভকত মকর॥

গৌর নাম সংকীর্ত্তন, প্রেম সেবা দিয়া।
রসের মুরতি নিতাই যাইছে নাচিয়া ॥
প্রেমের স্বরূপ জীব সাক্ষাৎ পাইয়া।
"নিত্যানন্দ-প্রাণগৌর" গাইছে কান্দিয়া ॥
কোটী ইন্দু সুশীতল শ্রীপদ কমলে।
প্রেম মকরন্দ পান করি কুতুহলে ॥
মন ভৃঙ্গ সদা গাবে নিতাই গৌরঙ্গ।
এ বাসনা পূর্ণ কর গৌর অন্তরঙ্গ ॥
হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জনমের সার।
যোগেন্দ্র দাসের গতি করিও এবার ॥

দীন—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়।

ভক্ত সুরেশ

(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা লিখিত)

জমীদার হারুবাবুর ছেলে সুরেশ পড়াশুনায় খুব ভাল, তার মত ছেলে কাছাকাছি দশ গ্রামে একটা পাওয়া যায় না, এ কথা সকলই বলে। তবে বড় লোকের ছেলে, কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য না করা তার স্বভাব ছিল,—একটু উদ্ধত ছিল। সুরেশ যখন বি-এ, পড়িত, তখন কলেজেও বেশ সুনাম ছিল ; তবে একটু স্পষ্টবাদিতার জন্য তার পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

কলেজে এক প্রফেসর ছিলেন। তিনি তাঁর বৃদ্ধ মা বাপকে পৃথকান্ন করিয়া দেন। বৃদ্ধ বাপ পত্নীর সহিত দু'এক দিন উপবাসও থাকেন। সুরেশ খবর পাইয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করে এবং একদিন প্রফেসর বাবুকে দু'কথা শুনাইয়া দেয়। সেবার পরীক্ষার বছর। প্রফেসর চটিয়া লাল হইয়া

প্রিন্সিপালকে সুরেশের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জ্ঞাপন করেন। সুবিচার (?) করিয়া প্রিন্সিপাল সুরেশকে পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। না দিলে পরীক্ষা বন্ধ।

সুরেশ এক রোখা ছেলে। সে টাকাও দিল না—পরীক্ষাও দিল না। বাড়ী চলিয়া আসিল। হারুবাবু বিরক্ত হইলেন। সারা বছর পড়িয়া, এক রাশ ঘরের টাকা খরচ করিয়া, সময় কালে পরীক্ষা না দিলে, সকল মা বাপই বিরক্ত হন। সুরেশ মাকে বলিল, যে সকল স্কুল কলেজে মা বাপের প্রতি ভক্তির কথা নাই,—যে সকল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অধ্যাপক বৃদ্ধ পিতামাতাকে পৃথকান্ন করিয়া দিয়া বউটী লইয়া সুখে-সচ্ছন্দে বাস করিতে লজ্জা বোধ করে না এবং সেই অসহায় পিতামাতাকে কেহ সাহায্য করিলে সে অসচ্চরিত্র মধ্যে গণ্য হয়, আর কলেজের অধ্যক্ষের বিচারে তার পাঁচ টাকা জরিমানা হয় আমার তেমন বিদ্যার দরকার নাই, তেমন সব স্কুল কলেজে হিন্দুর ছেলের পড়াই উচিত নহে।”

সুরেশের মা সুরেশকে কলেজে পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সুরেশ আর কলেজে গেল না। হারুবাবু অত্যন্ত ধীর প্রকৃতি, যেমন বিচক্ষণ, তেমন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তিনি “যা হওয়ার হবে” বলিয়া সুরেশকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তবে মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁর তিনটী ছেলে। বড় ছেলে রমেশ, মেজ সুরেশ, ছোট নরেশ। তিনি সুরেশকে খুব ভরসা করিতেন কিন্তু সুরেশ কথার অবাধ্য, উদ্ধত, তার প্রতিও তাঁর আর আশা রহিল না।

তার পরে সুরেশ বাড়ীতেই থাকে। বড় লোকের ছেলে অন্ন বস্ত্রের অভাব নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সে নিষ্কর্ম্মা থাকার পাত্রও নয়। সে দশ বিঘা পতিত জমী তারের কাঁটা দিয়া ঘেরিয়া ফেলিল,—নিজ হাতে কোদাল ধরিয়া, লাউ, বেগুণ, লঙ্কা কুমড়ো উচ্ছে, কলা প্রভৃতির ক্ষেত্র

করিল, লোকে প্রথম প্রথম তাকে উপহাস করিত “বড় লোকের ছেলে কোদাল চালায়। মান অপমান জ্ঞান নাই,” কিন্তু সুরেশ তাহাতে কাণ দিত না। সে নিজের লক্ষ্য সাধনের বেলায় পরের কথায় কাণ দেওয়ার পাত্রই ছিল না।

সুরেশ দুইটী মালী রাখিল। তরকারী ও শাক-শবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া ফেলিল। হারুবাবুর মত একজন জমীদারের সংসারে তরকারী খরচ বড় কম নহে। প্রত্যহ দু'বেলা একশ লোকের ভোজন। সুরেশ সংসারের তরকারীর অভাব ঘুচাইয়া দিল। শেষে বিক্রী আরম্ভ করিল। তিন বছরে চারিশত টাকা জমা করিল।

গ্রামের মধ্যে ছোট বড় সকলেই সুরেশের বাগানের শাক-শব্জীর অংশীদার ছিলেন। গরীবেরা সাহস করিয়া চাহিতে পারিত না, সুরেশ মালী দিয়া বাড়ী বাড়ী লাউ বেগুণ পাঠাইয়া দিত। তাহা ছাড়া সে অনাথা গরীব বিধবার সাহায্যকারী,—অসহায় গরীবের উপবাস-দিনে অন্ন-দাতা,—রুগ্ন-ভগ্নের ঔষধদাতা,—এবং লোক-সেবায় অগ্রগণ্য।

সুরেশের সব গুণ, দোষ কেবল ধর্ম্ম মানে না। কালী কৃষ্ণ পূজা করিলে কি হয়—গৌর-নিতাই বলিয়া লাফাইয়া বেড়াইলে কি হয়—একাদশী করিলে কি হয়,—গঙ্গাস্নান করিলে কি হয়—মিছে মিছি টাকা খরচ করিয়া তীর্থে গেলে কি হয়—মহোৎসব দিলে কি হয়? এই “কি হয়” কথাটা সুরেশের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। তার অন্যান্য গুণে গ্রামের লোক বিমুগ্ধ, সুতরাং তার এই দোষ কেহ মনে করিতে অবসর পায় না।

সুরেশদের বাড়ীর দশবাড়ী তফাতে মধুসূদন সাহার বাড়ী। মধু বড় কৃষ্ণভক্ত। তার মা-বোন-স্ত্রী-পুত্র সকলই তার কৃষ্ণ ভক্তির একান্ত পক্ষপাতী—সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ। কোন সাধু বৈষ্ণব, গোঁসাই, সন্ন্যাসী

মধুর বাড়ী পদার্পণ করিলে সকলেই তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিতশির হয়। মধুর দোকান আছে,—কিছু জমী জাতিও আছে। সে বড় মানুষ না হইলেও তার অন্ন-বস্ত্রের কোন অভাব নাই। তার বাড়ী প্রতি বৎসর দুর্গা পূজা হয়,—রাসযাত্রা হয়,—মাঘী পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়। অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, গুরু, বৈষ্ণব মধুর বাড়ীতে প্রায়ই আসা যাওয়া করেন। মধু তাঁহাদিগকে ভক্তি-সম্মানে সেবা করে। মধু নির্ম্মল স্বভাব, বিনয়ী, পরোপকারী এবং সুরেশের প্রতি খুব শ্রদ্ধাযুক্ত। মধু প্রত্যহ বৈকালে গৃহে বসিয়া পরিবারবর্গের মধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করে। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থও পাঠ করে। কোথায় কাহার নিকটে একখানা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর পাইয়াছিল, তাহা প্রত্যহ পাঠ করিয়া সকলকে শুনায়, আর চোখের জল ছাড়িয়া বলে "আমার হরিদাস ঠাকুরের মত এমন মহা মহীয়ান আর পৃথিবীতে হয় না। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন,

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার যে পবিত্রতা নাহিক আমাতে।"

আহা! আমার মহাপ্রভু যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আপনাকে পবিত্র বোধ করেন, তিনি কত উচ্চ, কত মহীয়ান, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। আমার মহাপ্রভুর শ্রীমুখে হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে—মহাপ্রভুর ভুবনভরা রূপ দেখিতে দেখিতে যিনি ভীষ্মের মত ইচ্ছামৃত্যু মরিতে পারেন এবং যাঁর জীবনহীন দেহ স্বয়ং মহাপ্রভু স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করেন—যাঁর সমাধি ক্ষেত্রে নিজ হস্তে বালুকা দান করেন—এবং যাঁর তিরোভাব মহোৎসবের অন্ন স্বয়ং বিশ্বম্ভর, আচল পাতিয়া ভিক্ষা করেন, আহা! তাঁর সমান আর কেহ নাই। তিনি প্রধান হইতে প্রধান,—গরীয়ান হইতে গরীয়ান, তিনিই যথার্থ পুণ্যতনু পতিত পাবন। তাঁর পবিত্র নামই মহামন্ত্র—জীবন সঙ্কটে রোগে মহা মহৌষধ—তাঁহার নামই মহা পথের

সম্বল,—মহাশক্তিমান হইবার মহা সহায় !” বলিতে বলিতে মধু ভাবের আবেগে রোমাঞ্চিত হইত,—তাহার নয়নে পুলকাশ্রু বহির্গত হইত এবং কেবল “জয় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জয়” বলিয়া ধ্বনি করিত।

সুরেশ মধুর বাড়ী সব সময় যাতায়াত করিত,—মধুর মঙ্গলামঙ্গলে অগ্রে আসিয়া সুহৃদের মত দণ্ডায়মান হইত,—কথা প্রসঙ্গে লোকের সম্মুখে মধুর প্রশংসা করিত, কিন্তু মধুর কৃষ্ণ ভক্তিকে সে একটা খেয়ালের মধ্যে গণ্য করিত।

এক দিন মধুর ছেলে নিমুর কলেরা হইল। খবর শুনিয়া সুরেশ সকলের আগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, রোগীর পার্শ্বে বসা সকল কর্ম্মেই সুরেশ। দু'দিন দু'রাত কাটিয়া গেল। রোগ আর হটিল না। হাতে পায় খাল ধরিল,—কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল,—মানুষ চেনার শক্তি গেল, বড় বড় ডাক্তার আনা হইল,—সকলেই বলিল, রোগীর আর আশা নাই।

মধু তখন ডাক্তারী ঔষধ বন্ধ করিয়া দিল। নিমুর চারি পাশে টবে ধরা তুলসী গাছ আনিয়া স্থাপন করিল। তাহার গায়ের উপরে হরেকৃষ্ণ নামাঙ্কিত নামাবলি ফেলিয়া রাখিল এবং পরিজনবর্গের সহিত কেবল “জয় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জয়” “দোহাই ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, রক্ষা কর !” এইকথা বার বার বলিতে লাগিল।

মধুর ব্যবহারে সুরেশ চটিয়া গেল। “যাবৎ জীবন তাবৎ চিকিৎসা” সুরেশের এই মত। মধু জোড় হাতে বলিল, তা সত্য বটে ! কিন্তু রোগ যখন অসাধ্য হয়—ডাক্তার যখন জবাব দেয়, তখন আর মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ভিন্ন গতি নাই। আর প্রভু আমার যদিও কর্ম্মফলদাতা, কিন্তু ভক্তের ভগবান। তিনি আমাদের মত অপরাধীর ডাকে সাড়া না দিলেও ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের নামের দোহাই দিলে, আর কৃপা-কটাক্ষ না করিয়া

থাকিতে পারেন না। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর আমার মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান অন্তরঙ্গ, তাই এই সঙ্কট কালে আজ ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তের দোহাই দেওয়াই কর্ত্তব্য। মধুর এইরূপ ব্যবহার সুরেশের মোটেই ভাল লাগিল না, সে স্পষ্টই বলিল, তোমার এরূপ কার্য্য অর্ব্বাচীনের মত হইতেছে। এই বলিয়া সুরেশ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া স্বদলে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় আট-টা।

ডাক্তারেরা বলিল, "ছেলেটা আর বড় জোর এক ঘণ্টা বাঁচিবে ?"

সুরেশ শ্মশানবন্ধু সংগ্রহ করিতে ও কাঠ খড়ের আয়োজন করিতে, গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা প্রায় চারিটা বাজিল। মধুর কোন সাড়া শব্দই নাই। সুরেশ তখন উদ্‌ব্যস্ত হইয়া একবার মধুর বাড়ীতে গেল, দেখিল মধু অনাহারে এক ঘরের মধ্যে বসিয়া কেবল বলিতেছে "জয় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর,—দোহাই ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের!" আর নিমুর কাছে তার মা বসিয়া আছে; নিমু বিছানায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছে!"

সুরেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কথা বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,—শরীর রোমাঞ্চিত হইল, পা ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। সে তখন মধুর পাশে বসিয়া পড়িল। মধুর নয়নধারা দেখিয়া নয়নে ধারা বহাইতে লাগিল। কি যেন এক অদ্ভুত ভাবে সুরেশ বিভোর হইল; লৌহ চুম্বকের সন্নিকটে পতিত হইয়া চুম্বকত্ব লাভ করিল, আর অঙ্গারে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গারকে উজ্জ্বল করিয়া দিল, সহসা সুরেশ বলিয়া ফেলিল, "হরিবোল হরিবোল!" "জয় ব্রহ্মহরিদাস ঠাকুরের জয়।"

সুরেশ রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত মধুর কাছে রহিল। মধুর স্ত্রী মধুকে প্রকৃতিস্থ করিল। সুরেশও আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে ছেলে "বাবা" বলিয়া ডাক ছাড়িল। ভাই বে

নিয়া হাসিয়া কথা বলিতে লাগিল। মধু ছেলে ওজন করিয়া সন্দেশের হরিরলুট দিতে যোগাড় আরম্ভ করিল। অবশ্য সুরেশই তাহাতে অগ্রণী হইল। লোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সুরেশের চঞ্চলতার স্থলে ধীরতা আসিল, আজ ভার মুখে সব কাণ্ডকর্ম্ম করিতে লাগিল। আর এক একবার "হরিবোল" "হরিবোল", "জয় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জয়" বলিতে লাগিল। নীরবে—লোকচক্ষুর অগোচরে সুরেশের নয়ন অনেকবার জলসিক্ত হইতে লাগিল। তাহা কেবল মধুই দেখিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গেলাম—নিমু যখন ভালর দিকে যাইতে আরম্ভ করিল, তখন গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতে কিউ, জেড্ ব্রহ্মচারী (একজন খুব বড় ডাক্তার) তাহার কলের পাওনা ষোল টাকা মধুর নিকট দাবী করিলেন, না দিলে আইন অনুসারে নালিশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। মধু আইন জানে না, কিন্তু আইনের ভয় করে; অজ্ঞান অর্ব্বাচীন কৃষ্ণভক্ত লোক, সামান্য দোকানদার, সে ডাক্তার প্রভুর টাকা তখনই বাক্স খুলিয়া দিয়া দিল। স্পষ্ট বক্তা সুরেশের মুখ ভার,—তখনও চোকে জল পড়িতেছিল। একবার বলিল, "শকুন শেয়ালেরও চক্ষু লজ্জা থাকে, হায়রে দেশ,—হায়রে ভারতবর্ষ,—আর হায়রে হিন্দুজাত, কবে তোরা মানুষ হবি !"

অনন্য ভক্তি

[প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন লিখিত।]

শ্রীভগবান প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎবাসীকে যে গীতামৃত পান করাইয়া গিয়াছেন, উহার একটি একটি কথায় আলোচনা করিলেও

এই সংসার দাবদগ্ধ নিরাশ জীবনে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আশার উদয় হইয়া থাকে।

মায়ার কুহকে পতিত হইয়া মানব নব নব দুর্ব্বাসনার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আপনা হইতে বিজড়িত হইয়া কতপ্রকার পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি বায়ুর ফুৎ-কারে কদাচিৎ যেমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ মহাপাপীর হৃদয়েও চিৎ-প্রেরণায় একটা ভাব জাগিয়া উঠে—আমি কি করিতেছি, আমার এই সকল দুষ্কর্ম্মের পরিণতি কোথায়? আমি কোথায় যাইতে বসিয়াছি, একটির পর একটি করিয়া আমি নিয়ত যে সকল অসৎকর্ম্ম করিয়াছি, এ কর্ম্মপাশ হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব এইরূপ যাহার নিজের হৃদয়ে এই অনুশোচনা হয় এবং লোকসমাজেও যে ঘৃণ্য হইয়াছে, যাহাকে কেহ আশ্রয় দেয় না, যাহাকে অসৎ কর্ম্মী বলিয়া বিতাড়িত করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বপরিত্যক্ত ব্যক্তিকেও কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান তাঁহার সকরুণ ডাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাং অনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" (৯।৩০)

আমায় যে একবার অনন্য ভাবে ভজন করে, আমি তাহাকেই সাধুপদে উন্নীত করি যেহেতু আমার নিকট সকলেই সমান—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু নমেদ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"

অর্থাৎ সকল ভূতেই সমকৃপাশীল আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। সকলের নিকট অনাদৃত পাপীকেও তিনি অনাদর করেন না, সুদুরাচারকেও সাধু পদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার স্বতন্ত্র স্বভাব। সূর্য্য স্বীয় কিরণ ছটায় যেমন জগতের সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের করুণা সর্ব্বত্র বিসারী উহার তারতম্য হইতে পারে না, যিনি

সকলকার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া চিৎস্ফুরণ করাইতেছেন তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কোথায় ?

অগ্নি আলোক প্রদানাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের আমরণকাল পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন, ইহা অগ্নির স্বভাব, কিন্তু আমি যদি অগ্নির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে নিকটে না আনি বা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ না করি, তাহা অগ্নির দোষ হইতে পারে না, কল্পবৃক্ষ প্রার্থনা পূরণ করে, কিন্তু প্রার্থীর অনাগমন কল্পবৃক্ষের পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক হইতে পারে না।

জীব-পালক ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকেও ভক্ত-পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বেশ্বর করুণাময় ভগবানের কারুণ্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়া যে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে আসিয়াছে, তিনি তাহারই আপন হইতে আপনতম হইয়া কৃপাধিক্য প্রকাশে তাহার যোগক্ষেম বিধান করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তেরই মহিমাপ্রকাশ পাইয়াছে। ভক্ত নিজের শক্তিতে তাঁহাকে বশীভুত করিয়া থাকে জগতে সে দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে অনন্যভাবে তাঁহাকে ভজনা করে তিনি তাহার হন। এখানে এই অনন্য ভজন অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃজন পালনাদি বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত দেব ও দেবী প্রভৃতি সকলকেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের অংশ ও শক্তিরূপে জানিয়া দেবতান্তর উপাসনাদি ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে সম্যক বা সাধু অধ্যবসায়। এই সদধ্যবসায়শীল ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিতে হইবে, এবম্বিধ ভজন পরায়ণ ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম তৎকালে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না হইলেও উহার আংশিক পরিত্যাগ হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ ভজন প্রবৃত্তিই আসিতে পারে না, কারণ ভজন প্রবৃত্তি সত্ত্বগুণের কার্য্য।

সত্ত্বোদ্রিক্ত হৃদয় ব্যতিরেকে ভজন হইবে না, অবশ্য তস্করের কালী পূজা আর এই ভজন যে স্বতন্ত্র বিষয় তাহা বলাই বাহুল্য।

"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবত সঙ্গতঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১১)

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বোক্ত নানাদেবতা যজনস্যাপি সংযোগ পৃথকত্বেন ভক্তিযোগ ফলত্বমাহ এতাবানিতি ইন্দ্রাদীনপি যজতাং ইহ তত্তৎ যজনেন ভাগবতানাং সঙ্গতো ভগবত্যচলো ভাবো ভক্তির্ভবতীতি যৎ এতাবানেব নিঃশ্রেয়স্য পরম পুরুষার্থস্য উদয়োলাভঃ অন্যৎ তু সর্ব্বং তুচ্ছমিতি"

অর্থাৎ সকামী ভক্তেরও ভগবদ্বিভূতি জানিয়া দেবতান্তরের ভজনের ফলে কমলাসিদ্ধির সহিত শ্রীভগবানে অচল ভাবের উদয় অর্থাৎ স্থির নিষ্ঠা হয়, তাহার ফলে যে পরম পুরুষার্থের লাভও হইয়া থাকে উহাই লাভ নামে অভিহিত হইতে পারে। অপর বিষয়াদি বৈভব লাভ অতি তুচ্ছ।

সুতরাং "ভজতে মামনন্য ভাক্।" এই অনন্য ভজন তামসি বা রাজসিক ভাব প্রণোদিত ভজন হইতে পারে না, যেহেতু ভজনের প্রথম সোপান শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও নাম গুণলীলাদি শ্রবণ হইতেই হৃদয়ে লুক্কায়িত দুর্ব্বাসনা সকল বিদূরিত হইয়া থাকে, উহা হইতেই অনাবিদ্ধ চিত্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অনন্তর সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া থাকে, এই শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে সাক্ষাৎ ভজন। অতএব অনন্য ভজন পরায়ণের দুর্ব্বাসনা থাকিতে পারে না, যেখানে দুর্ব্বাসনার সদ্ভাব থাকিবে সেখানে ভজন হইতেছে না জানিতে হইবে। ভোজনে প্রবৃত্ত পুরুষের গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তিই হইয়া থাকে। তখন আর ক্ষুধার উদ্রেক হয় না।

পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি তাহার জাত্যু-

চিত আচার পরিবর্জ্জিত হইয়া অনন্য ভাবে আমার ভজন করে তাহাকেও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া জানিবে "আচারব্যতিরিক্তত্বমস্য স্বল্প বৈকল্যমিতি ন তাবতানাদরণীয় অপিতু বহুমন্তব্য ইত্যর্থঃ।" পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমা যৎ সমেঽপি বৈষম্য-মাপাদয়তি শৃণু তন্মহিমানং অপিচেতিতি…যঃ কশ্চিৎ সুদুরাচারোঽপি চেদ্‌ জামিলাদিবদনন্যভাক্‌ সন্মাং ভজতে কুত্রাচিৎ ভাগ্যোদয়াৎ সেবতে…স প্রমাণতোঽসাধুরপি সাধুরেব মন্তব্যঃ হি যস্মাৎ সম্যক্‌ ব্যবসিতঃ সাধু নিশ্চয় বান্‌ সঃ।" অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তের এমনই মহিমা যে অসৎকেও সৎ করিয়া দেয় এবং স্বভাব আমি আমাতে বৈষম্য আনয়ন করিয়া তাহার পক্ষপাতী করিয়া ফেলে।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীভগবান সর্ব্বভূতে সম হইলেও তাঁহাতে স্বাশ্রিতবাৎসল্য লক্ষণ বৈষম্য আছে, তিনি ভক্তকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করেন।

"উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চেতি" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৬)

এই সূত্রের ভাষ্যেও তিনি দেখাইয়াছেন যে—ভক্তবৎসল প্রভুর ভক্ত-পক্ষপাতীত্ব রূপ বৈষম্য উৎপন্নই হইয়াছে কারণ ভক্তরক্ষণাদি কর্ম্ম তদীয় স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূত ভক্তি সাপেক্ষ, ইহাতে নির্দ্দোষাদিবাচক বেদ বাক্যের কোন বিরোধ হয় না,যেহেতু ঐরূপ বৈষম্য শ্রীভগবানের গুণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। "যমেবৈষ বৃণুতে" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "প্রিয়োহি জ্ঞানিনো-ঽত্যর্থং" ইত্যাদি বহু স্মৃতি বাক্যে উহা অভিহিত হইতে দেখা যায়। এই ভাষ্যের টীকাতেও উহা বিশদ করিয়াছেন যথা—"ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি শ্রুতির্গ্রাহ্যা, প্রিয়োহীতি সর্দ্ধত্রিকং শ্রীগীতাসু। অপি চেদিতি যদ্যপীত্যর্থঃ সুদুরাচারো বিনিন্দাচরণঃ শাস্ত্রীয় কর্ম্মশূন্যো বা। অনন্য-ভাক্‌ সন্‌ মাং ভজতে দেবতান্তরং বিহায় মামেব স্বারাধ্যবুদ্ধ্যা সেবত ইত্যর্থঃ

স ত্বয়া সাধুরেব অর্জ্জুন ! মন্তব্যঃ নতু দুরাচারাংশং বীক্ষ্য তস্যাসাধুত্বঞ্চাশঙ্ক্যমিত্যর্থং। মন্নিষ্ঠা প্রভাবেন দুরাচারাস্পর্শাদিত্যেব কারাশয়ঃ। হি যস্মাদসৌ সম্যাগ্ ব্যবসিতঃ মদেকান্তিত্বরূপ পরম নিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। দুরাচারোঽপি তস্য ঝাটিত্যেব নশ্যেদিত্যাহ ক্ষিপ্রমিতি।”

এখানে তাঁহার স্বাশ্রিত বাৎসল্যেরই বিশেষ উক্তি দেখা যায় ঐ কথাই “অপিচেৎ সুদুরাচো” এখানে সুস্পষ্টিকৃত হইয়াছে ঐ টীকার যথা—“মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতা লক্ষণং স্বভাবো দুস্ত্যজ এব যদহং জুগুপ্সিত কর্ম্মণ্যপি ভক্তেঽনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামীতি পূর্ব্বার্থং পুষ্ণন্নাহ “অপি চেৎ” ইতি অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিত কর্ম্মাপি সন্ মাং ভজতে মৎকীর্ত্তনাদিভির্মাং সেবতে তদাদি স সাধুরেব মন্তব্যঃ” অর্থাৎ আমার শুদ্ধ ভাক্ত বশ্যতা লক্ষণ স্বভাব দুস্ত্যজ, আমি অতি গর্হিতকর্ম্মা ভক্তেরও অনুরাগী হইয়া তাহার উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকি। এখানে দেখা যাইতেছে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে যে রকমের অসদাচারী হউক না কেন, যখন অনন্য ভাবে আমার শরণ লইয়া ভজন পরায়ণ হইল উহার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিয়া থাকি, ইহাই তাঁহার ভক্ত পক্ষপাতিত্ব ও ভজনের মহিমা, আমার ভজনের পর আর তাহার অসৎ প্রবৃত্তি থাকে না, যেহেতু আমিই তাহার অসৎ প্রবৃত্তির পরিহার করাইয়া তাহাকে সাধু পদে প্রতিষ্ঠিত করি, তৎকালে তাহার পূর্ব্বাচরিত সমস্ত দুষ্কৃতির ক্ষয় না হইলেও মদেকান্তিতা বশতঃ আমাকে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় করিয়া লওয়ায় সে সাধুপদবাচ্য হইয়াছে, যেহেতু বহু সৎকর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিরও ঈদৃশী নিষ্ঠা দেখা যায় না। সুতরাং ভগবদ্ভজনের পরেও যে নবোদ্ভূত দুষ্প্রবৃত্তির সম্ভাবনা হইতে পারে না, তাহা স্থির নিশ্চয়, বরং উত্তরোত্তর উহার পরিহারই হইয়া থাকে, নতুবা “ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা” এই বাক্যের ব্যর্থতা হইয়া পড়ে।

বরং আমরা বলিতে পারি "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ না সান্তমনসোবাপি" ইত্যাদি শ্রুতিতে দুরাচারের ভগবদ্ বৈমুখ্যই অভিহিত হইয়াছে, তাহার সাধুত্বের সম্ভব কোথায়? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন— উহা সাধারণ দুরাচারী পর "মদেকান্তী তু মনসিধৃতেনাতিপুতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনির্ধূয় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচার নিষ্ঠমনা ভবতি।"

সুতরাং যাঁহার নাম স্মরণ মাত্র সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া যায়, যাঁহার নামে কর্ম্মের সকল বৈগুণ্য দূরীভূত হয় সেই ভগবানের ভজনের সময়ে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না।

অবশ্য সাধারণ স্মৃতি শাস্ত্রর সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে যে তাঁহারা অকৃত প্রায়শ্চিত্তকে সাধু মনে করিবেন না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত শব্দের প্রকৃত অর্থাবধারণ করিলে আর তাহা বলা চলে না। প্রায়স শব্দ কিঞ্চিৎ ন্যূন বহুল অর্থেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং যে শ্রীভগবানে বহুল ভাবে চিত্তার্পণ করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতের ক্ষালণ কামনা করিতেছে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইল জানিতে হইবে। নতুবা লোক দেখাইয়া কাহন কত কড়ি উৎসর্গ করিয়া প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কেন আমার অসৎ প্রবৃত্তি হইয়াছিল, হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ ভগবান আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি তুমি আমার দুর্ব্বাসনা বিদূরিত করিয়া সৎ পথে পরিচালন কর। ইহাই প্রায়শ্চিত্ত, যেখানে ভগবৎ স্মৃতির প্রতিকূল বিষয়ই রহিল না, সেখানে পৃথক কোন পৃথক প্রায়শ্চিত্তের কথাই আসিতে পারে না। সেই জন্যই শ্রীভগবান পরে বলিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি স্থির জানিয়া রাখ আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না।" জীবের ইহা অপেক্ষা বড় আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে? শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি
সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥"

এই সকল শাস্ত্র বাক্যের অভিপ্রায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ভজনের সঙ্গে সঙ্গেই অবশিষ্ট দুরাশয়ত্বের পরিহার পূর্ব্বক তাহাকে ভজনের প্রকৃত পথে আনয়ন করে বলিয়াই সে সাধু, তাহার আর অসৎ প্রবৃত্তি আসে না। সুতরাং দুরাচারিত্ব ও অনন্য-ভজন পরায়ণতার কথা যুগপৎ হয় না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

আরাধনা।*

সম্মুখে সাকার মূর্ত্তি চিত্তগ্রাহী অনুপম
নেত্রদ্বার হ'ল রুদ্ধ তায়;
ধূপ-গন্ধে নাসা রুদ্ধ শঙ্খ ঘণ্টায় শ্রবণ
মুখে মন্ত্র, মন কোথা যায়?

অনেক তার্কিক সময় সময় প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, ভগবান সর্ব্বত্রই সকল সময় বর্ত্তমান আছেন, তবে তাঁহাকে আরাধনা করিতে ও ডাকিতে পৃথক মূর্ত্তি, স্থাপন প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বর করিতে হয় কেন? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, জল সর্ব্বত্রই সকল সময় আছে অর্থাৎ সর্ব্বত্র

* প্রবন্ধ লেখক, প্রবন্ধটী পাঠাইয়াই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় নামটী এক্ষণে অপ্রকাশিত থাকিল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক লিখিবার বাসনা তাঁহার ছিল, উঁহার অন্যান্য যাহা দু'একটী লেখা পাইয়াছি ক্রমে ক্রমে আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার দিব। (ভঃ সঃ)

মৃত্তিকার নিম্নে জল থাকে ; তবে লোকে কূপ, পুষ্করণী প্রভৃতি খনন করে কেন ? সুতরাং জল পাইতে হইলে কূপ, পুষ্করণী প্রভৃতির যেরূপ আবশ্যক ; তদ্রূপ ভগবানকে পাইতে হইলে বিগ্রহ, দেবালয়, তীর্থস্থান, সৎগুরু প্রভৃতির আবশ্যক হয়।

(২) পথিকগণ পথভ্রমণে ক্লান্ত ও পিপাসার্থ হইয়া যেমন বিশ্রামার্থ বৃক্ষতলে বসেন এবং পিপাসা নিবারণার্থ জলাশয়ে গমন করেন ; তদ্রূপ ভগবানকে পাইতে হইলে ঐ সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়।

(৩) আমরা চঞ্চল মতি, তজ্জন্য সম্মুখে সাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় নেত্রদ্বয় ঐ মূর্ত্তিতে পতিত হইয়া অপরাপর বাহ্য দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয় না।

(ক) ধুপগন্ধে ঘ্রাণশক্তি রুদ্ধ হয় এজন্য অপর কোন সৌরভ নাসিকায় প্রবেশ করে না।

(খ) শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে শ্রবণ ইন্দ্রিয় রুদ্ধ হয় এজন্য অন্য কোন রব কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না।

(গ) মুখে মন্ত্র এবং ভগবানের অর্চ্চনাদি দ্বারা মন ভগবদ্ প্রেমে আকৃষ্ট হয় ; সুতরাং চিত্ত অন্য দিকে ধাবিত হয় না।

অতএব যে কোন কাজ করিতে গেলেই তাহার নিয়মিতরূপ, অল্প বিস্তর আস্বাবের প্রয়োজন হয়। জল পাইতে হইলে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট জলাশয়ের আবশ্যক তদ্রূপ ভগবানকে পাইতে হইলে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ও মূর্ত্তির আবশ্যক।

(৪) যিনি যে কোন দ্রব্য বা ব্যক্তিকে ভালবাসেন তিনি সেই দ্রব্য বা ব্যক্তিকে অথবা দেব-দেবীকে স্বীয় আরাধ্য বস্তু জ্ঞান করতঃ পবিত্র মনে একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে ধ্যান করিবেন। এইরূপে আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। একলব্য নিষাধ পুত্র এই উপায়েই স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

সুখের সন্ধান।—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ১২২ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রায় দুইশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দাম দেড় টাকা। সমালোচনার জন্য এই পুস্তক খানি আমরা পাইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাতে গল্পচ্ছলে নীতি বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক দুর্ব্বোধ্য বিষয়েরও সুন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি সরস ও সরল ভাষায় উপন্যাসের ভঙ্গীতে লিখিত হওয়ায় এক খানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে। পঠিত বিষয়গুলির ছাপ সহজেই হৃদয়ে লাগিয়া যায়। স্ত্রী শিক্ষার জন্য যাঁহারা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাইতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাইয়া তৃপ্ত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। বিবাহে আজকাল যে সকল বাজে পুস্তক উপহার দেওয়া হয় তাহাতে অনেক স্থলে হিতে বিপরীত হয়। এই পুস্তকখানি বিবাহে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আজকালকার দিনে এই ভাবের পুস্তক যত আদৃত হইবে ততই সমাজের মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জন্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি, আমরা সকলকেই ইহা পাঠের জন্য অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।—শ্রীশ্রী সোণার গৌরাঙ্গ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব কৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত। পোঃ সায়েস্তাগঞ্জ গ্রাম চরহামুয়া জেলা শ্রীহট্ট এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। মূল্য ৪৲ ডাক মাঃ ৷৵০ আনা লেখা আছে। শ্রীগ্রন্থখানি খণ্ডাকারে প্রকাশ হইতেছেন

আমরা আদি লীলার ১ম খণ্ডখানি মাত্র পাইয়াছি। যে ভাবে ব্যাখ্যা লেখা আরম্ভ হইয়াছে সেই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত হইলে গ্রন্থখানি যে ভক্ত-সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবে সমগ্র গ্রন্থখানি পাইবার জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত আছি যোগেন্দ্রবাবু যে উপযুক্ত লোক, সে বিষয়ের পরিচয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীপত্রিকা হইতেই বৈষ্ণব সমাজ পাইতেছেন। নানাবিধ ভ্রান্ত মতবহুল সমাজে এ ভাবের একজন নির্ভিক লেখক খুব আবশ্যক। শ্রীচরিতামৃত অফুরন্ত অমৃতের ভাণ্ডার, যিনি যেরূপ ভাবেই ইহা আস্বাদন করিবেন তিনি তাহাতেই কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। নানাভাবে শ্রীগ্রন্থের নানা সংস্করণ বাহির হইয়াছে, যোগেন্দ্রবাবু উহারই মধ্যে একটু নূতন ধরণে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা প্রথম খণ্ডখানি মাত্র পাইয়াছি এবং পাঠে আনন্দ পাইয়াছি অতঃপর অন্যান্য খণ্ড পাইলে আমাদের বক্তব্য বলিবার বাসনা রহিল। ভক্তগণ এখন হইতেই শ্রীগ্রন্থের গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইয়া থাকুন ইহাই আমাদের অনুরোধ। শ্রীগ্রন্থের ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে।

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত "**প্রাণের কথা**" পুস্তক মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী আষাঢ় মাসেই পাইবেন। মূল্য এখনও স্থির হয় নাই।

ভক্তির গ্রাহকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পরে মূল্য দিব বলিয়া আজ পর্য্যন্তও দেন নাই, আগামী শ্রাবণ মাসে ভক্তির ২৭শ বর্ষ পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে গ্রাহকগণের বার্ষিক মূল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য অন্যথায় আমরা আষাঢ় মাসের ভক্তি তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইব।

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য।

বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা।—গত বৈশাখ মাসের ভক্তিতে বঙ্গবাসী পঞ্জিকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, কলিকাতা ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা পাইয়া মিলাইয়া দেখিলাম উহার সহিত অনেক স্থলে মিল নাই। অমিলের কারণ কি? উভয় ব্রত তালিকার ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণই শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব স্মৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা দিয়াছেন সন্দেহ নাই; তবে মতের মিল হয় না কেন? আমরা উভয় ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণের উপর এ বিষয়ের মীমাংসার ভার দিলাম। তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য আমাদিগকে জানাইলে বারান্তরে উহা প্রকাশের বাসনা রহিল।

ভ্রম সংশোধন—বঙ্গবাসী পঞ্জিকায় প্রকাশিত ব্রত-তালিকায় ২২এ বৈশাখ বুধবার একাদশী ছাপা হইয়াছে কিন্তু ২২এ বৈশাখ রবিবার হয়। আমরা পঞ্জিকার ছাপা দেখিয়া ছাপিয়া ছিলাম, পাঠকগণ বুধবারের স্থলে রবিবার করিয়া লইবেন। অন্যান্য যে সকল মতদ্বৈধ আছে তাহা পরে আলোচিত হইবে। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের প্রকাশিত ব্রত-তালিকার একখানি সমালোচনা পাইয়াছি আগামী মাসে উহা প্রকাশিত হইবে।

ষোলপ্রহর নামযজ্ঞ।—আন্দুলের নিকটবর্ত্তী বাণুপুর গ্রামে ২০এ বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্য্যন্ত একটী ষোল প্রহর নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ২০এ বৈশাখ শুক্রবার অধিবাস হইয়া ২১এ ও ২২এ ষোলপ্রহর নাম হয় ২৩এ যথারীতি নগর সংকীর্ত্তন ও সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগারাধনা এবং প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতিকাব্য প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী

এবং সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গৌরগুণ কীর্ত্তনে ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। ভক্তি-সম্পাদক মহাশয় সদলে কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ছিলেন। উক্ত গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্বরচিত নিতাইগুণ অতি সুন্দর ভাবে কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন এবং মহোৎসব সম্বন্ধীয় যে নূতন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন ভক্তির পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

আজ, মহা মহোৎসবে, মাতি মহারবে
তোলরে গৌর নামের মহারোল।
নাম রসায়নে রসুক রসনা
সঘনে বলরে গৌর হরি বোল ॥
ধ্বনি শুনি মত্ত হউক সমীরণ
নাচুক উর্দ্ধে গ্রহ তারাগণ
ভেদি গৃহ বন আকাশ ভুবন
সাগর সলিলে উঠুক কল্লোল ॥
দু'বাহু তুলিয়া বল জয় জয়
জয় বিশ্বম্ভর জয় দীনাশ্রয়
জয় মহাপ্রভু জয় দয়াময়
প্রেমানন্দে ভাবে হও উতরোল ॥
নামে মেতে যাক্ পাষণ্ড অসুর
পাষান হৃদয়ে হউক প্রেমাঙ্কুর
প্রেমে উচ্চ নীচ অন্ধ কি আতুর
আচণ্ডালে ধেয়ে দাওরে কোল ॥
এ "বিশ্বরূপে" কয় কি ভয় কি ভয়
ঝঙ্কার করিয়া লও নামাশ্রয়

ঘুচে যাক্ শঙ্কা মার জয় ডঙ্কা
শঙ্খ করতাল বাজাও মাদল ॥

নানাপ্রকার বিলাস ব্যসনে মত্ত কলিহত জীবের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ অনাবিল আনন্দের অনুষ্ঠান দেখিয়া যথার্থই আনন্দ অনুভব হয়। আমরা উৎসবের উদ্‌যোক্তার সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রার্থনা করি।

নববর্ষারম্ভে উৎসব।—ভক্তি-নিকেতনে বিগত ১লা বৈশাখ এক আনন্দ সম্মিলন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন রাত্রে ভক্তি-নিকেতনের কোনও সভ্যের গৃহে কীর্ত্তনানন্দ হয়। পরদিন প্রাতে ভক্তি-নিকেতন হইতে নগর সংকীর্ত্তন হইয়া মহোৎসব হয়। অনেক ভক্ত ঐ দিন একত্রিত হইয়া আনন্দোৎসবের শোভাবর্দ্ধন করিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভু উভয় দিনই উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনানন্দ করিয়াছিলেন।

বিশেষ কথা।—ভক্তির নূতন গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ভক্তির পুরাতন বর্ষ সকল পাইবার জন্য অনেকে আগ্রহ করিতে ছিলেন, আমরা অনেক যত্নে মাত্র কয়েক বৎসরের পত্রিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে ভক্তি ২৭শ বর্ষ চলিতেছে। ১ম বর্ষ হইতে ১৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত আর পাইবার উপায় নাই। ১৫শ হইতে এখনও পাইতে পারেন। কিন্তু তাহাও খুব অল্প আছে যাঁহার আবশ্যক অতি শীঘ্র তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখুন। এবার ফুরাইলে আর আমরা দিতে পারিব না। ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে এক এক বৎসরের পত্রিকা ১।৹ টাকা স্থলে ১৲ এক টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। মনে রাখিবেন অতঃপর দশগুণ মূল্যেও একখানি পাইবেন না। সত্বর গ্রহণ করুন ইহাই নিবেদন।

শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের সংবাদ।—বিগত ২৫এ বৈশাখ শ্রদ্ধেয় শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলে শ্রীধাম বৃন্দাবন

গমন করিয়াছেন সেখানে নব রাত্র উৎসব সমাধা করিয়া অন্যান্য দু' এক স্থানেও যাইবেন। পাঠকগণের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীমান্ অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্যও এবার বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। এক দিকে বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন, অন্য দিকে গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমান্ অনাথের ভক্তিমাখা সঙ্গীত। আনন্দের প্রস্রবণ ছুটাইবে সন্দেহ নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বাবাজী মহাশয়ের কলিকাতায় ফিরিবার সম্ভব। তাঁহার কীর্ত্তনের তালিকা অন্যান্য বারের ন্যায় এবারে হয় নাই কাজেই পরপর সংবাদ ঠিক দিতে পারিলাম না, যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহাই যথাসময় ভক্তির পাঠকগণ পাইবেন।

শোক-সংবাদ

হাওড়া জেলার খড়িয়প নিবাসী (অধুনা কলিকাতা নিবাসী) গৌর ভক্তবর মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিগত ১৬ই বৈশাখ সোমবার বেলা ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ইহধাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। বসু মহাশয় ভক্তি-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের অতিশয় প্রিয় শিষ্য ছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতেই ক্রমে ইহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। ইদানিং শয্যাগতই ছিলেন। বসু মহাশয়ের শ্রীশ্রীগৌর নিতাই প্রীতি, সাধু বৈষ্ণব সেবার আগ্রহ অনুকরণীয়। বর্ত্তমানে তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান। আমরা শ্রীমান দ্বয়ের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র বাবুর শোকসন্তপ্ত বন্ধুবর্গের শান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

আষাঢ়
১৩৩৬

প্রার্থনা

"তেম্‌নি ক'রে আবার এসে ডাকাও গৌর প্রেমের বান।
(তাতে) ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান ॥"

প্রেমের ঠাকুর! বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর! এস—আর একবার তেম্‌নি ক'রে এসে তোমার নাম প্রেমের বন্যা বহাইয়া জীবের হৃদয়-মরুভূমিকে সরস করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দাও। সব যে গেল ঠাকুর, এইত সেদিন কি কাণ্ড না ক'রে গেলে, এত অল্পদিনের মধ্যে যে আমরা তোমাকে এমন ক'রে ভুলে যাব এতো স্বপ্নেরও অগোচর! আজ আমি দু'পাতা পাঠ মুখস্ত করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া বসিয়া আছি, আর সেদিন তাবড় তাবড় পণ্ডিতকেশরী সকল তোমার নিকট কেমন নরম হ'য়ে তোমার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন, আজ আমি স্ত্রীপুত্র ধন মান পাইয়া একেবারে তোমর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া বসিয়া আছি, আর সেদিনের সেই রঘুনাথ দাস, রূপ সনাতন, ঠাকুর নরোত্তম, রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ তোমার

কৃপাপাবার জন্য কিনা ত্যাগ করিয়াছেন? সামান্য বাহবা পাবার জন্য আজ জাল জুয়াচুরি মিথ্যা প্রবঞ্চনা কোন কিছুতেই আটকাইতেছে না, কিন্তু সে দিনের সেই রাজ-পণ্ডিত সার্ব্বভৌম, বৈদান্তিকগণের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এমন যে প্রকাশানন্দ, অমন দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী প্রভৃতি তোমার কৃপা পাইয়া কি না করিয়াছিলেন?

প্রভু! এত গেল পণ্ডিত, ভাগ্যবান ভক্তের দিক দিয়া। পতিত পাষণ্ডের দিক দিয়া দেখিলেও ত তোমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া পারা যায় না, কিন্তু কিযে আমার দুর্দ্দৈব আমি মোটেই তোমাতে অকপট বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছি না। তোমার দোহাই দি বটে কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসিয়া মোটেই নয়, কেবল আমার ব্যবসার খাতিরে, লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়। দয়াময়! আমার এ জীবনটাকি এইভাবে কপটতার প্রশ্রয় দিতে দিতেই যাইবে? সত্য সত্যকি তোমার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে না, সত্যসত্যই কি তুমি যে জীবের একমাত্র আশ্রয়দাতা—একমাত্র ভরসা স্থল, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া তোমার পদে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইতে পারিব না?

এবার তোমার কাছে আমার দুইটী প্রার্থনা—হয় আমাকে তোমার ভাবে বিভোর করিয়া প্রতিকার্য্যে তোমার মঙ্গলময় সত্ত্বা উপলব্ধি করাইয়া ধন্য কর, নয়ত একেবারে পতনের অতলতলে ডুবাইয়া দাও। ঐযে মধ্যে মধ্যে সুখের আভাস দিয়া চিত্তকে আকুল করিয়া আবার অহঙ্কারের মধ্যে আনিয়া শতগুণ জ্বালা বৃদ্ধি, তাহা করিও না। হয় তোমায় লইয়া দিবানিশি বিভোর থাকি, নয় তোমায় ভুলিয়া যাহা খুসি করি। তবু আশা থাকিবে যে একদিন না একদিন তোমার কৃপা পাইয়া ধন্য হইব। এভাবে উভয় সঙ্কটে ফেলিয়া আর যন্ত্রণা দিও না।

দিন দিন আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি, পূর্ব্বে যে কার্য্য খুব সহজে

অল্প সময়ে করিতাম এখন বহু চেষ্টায় ও বহু সময় ক্ষেপ করিয়াও তাহা সমাধা করিতে পারি না, তাই মনে হইতেছে আমার এবারকার বাজী বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ কাতরে প্রার্থনা, যেভাবে থাকিলে তোমার ভুবনমঙ্গল নাম না ভুলিয়া দিবানিশি মাতিয়া থাকিতে পারি তাহা কর। আর যে কটাদিন থাকিব যেন তোমাকে লইয়া সুখে কাটিয়া যায়। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফেরে যদি তাহা না হয় তবে ডুবাইয়া দাও আরো অতল তলে, আমি তাহাই তোমার মঙ্গলময় বিধান বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু একটা কথা—

"সুখে বা দুঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা তোমারি।
তুমি আমার আমি তোমার আর সকলি তোমারি॥"

এইটী যেন ভুলি না। আজ জ্বালায় জ্বলে দীনহীন কাঙ্গালের তোমার নিকট এইটীই প্রার্থনা।

দীন—

নির্ভর।

মন্দ করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়,—
বল্‌ব না ত,—আমার ভাল কর দয়াময়!
তোমার যাহা ইচ্ছা, প্রভু, কর্‌বে তুমি তাই;
তোমার ইচ্ছা ছাড়া, আমার ইচ্ছা কিছুই নাই।
ইচ্ছাময় হে, তোমার ইচ্ছা-ই জানি পূর্ণ হবে;
আমার ইচ্ছা জানিয়ে তোমায়, ঠকব কেন তবে?

কিন্তু এটা আমার মনে জানে সবিশেষ,—
সর্ব্বশুভ মূলাধার যে তুমি পরমেশ !
তোমার ভিতর নাই ত কোথাও অকল্যাণের লেশ !
এইটে আমি জানি যে গো,—তুমিই জানিয়েছ ,
জানিয়ে আমায় এই কথাটা, আগেই ঠ'কেছ ।
কাজেই এখন ভাল মন্দের ধার্‌ব না ত ধার,
আমার কাছে ভাল-মন্দের নাই সে বিচার আর !
তুমি যেটা কর্‌বে ওগো, করবেই ত তাই !
আমি কেন ভাব্‌তে যাব,—আমার গরজ নাই !!

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ।

"বংশীধারী"

জীবনে এ ঘটনা কখন সংঘটিত হইয়াছে তাহা সম্যক জ্ঞাত হইতে পারিলাম না—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারিতেছি যে, একদিন কিজানি কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে কত যুগ-যুগান্তের স্মৃতি জড়িত অমিয়-মধুর বংশী-ধ্বনি হঠাৎ আমার ন্যায় দীন অভাজনের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া, পাষাণ হৃদয়ে চির বিদ্ধ হইল। হৃদয় পাষাণ—পাপপূর্ণ—ইহা ক্ষণিক বংশীধ্বনি মুখরিত হইয়া চিরদিনের জন্য সেইধ্বনি শ্রবণ মানসে ব্যাকুল হইল।

বাঁশী বাজিয়াছে—আমার হৃদয় কারাগারে বংশীধ্বনি মুখরিত হইয়া চিরদিনের জন্য তাহা পুনর্ব্বার শ্রবণ-মানসে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে—বংশীনিনাদে হৃদয় মুখরিত হইয়া নব নব আশার সঞ্চার করিয়াছে। যাঁহার

শ্রীমুখ পদ্ম হইতে বংশীধ্বনি নিনাদিত হইয়া ভক্তিপ্রাণ ভক্তমণ্ডলীর হৃদয় বারিধির ক্ষুদ্ধ তরঙ্গ বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়—তাহাকে দর্শন করিবার মানসে মন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বংশীধারীর সুমধুর মন প্রাণ মাতান বংশী-ধ্বনি, যাহা আমার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমার মনকে কি জানি এক অপ্রকাশিত আনন্দে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। সেই তান-নিনাদিত মূর্চ্ছনা আমাকে এক অপ্রকাশিত গুপ্তস্থানে কাহার সন্ধান করিতে বলে তাহা আমি কি বলিব? মূর্খ আমি—অন্ধ আমি, দীনহীন কাঙ্গাল আমি—পথ ভোলা পথিক আমি, আমি আবার কোন দুরন্ত দুস্তর পথের সন্ধানে যাইব? আমি কণ্টকময় পথে পদার্পণ করিয়াছি এবং বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি—এক্ষণে উপায়হীন। কেমন করিয়া এই কণ্টকময় প্রাচীর বেষ্টিত সংসাররূপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই চির আলোকিত—চির প্রার্থীত—সাধুজন-বাঞ্ছিত বনবিহারী শ্রীশ্রী বংশীধারীর অনুসন্ধানে চিত্ত নিয়োজিত করিব, তাহার উপায় কি? প্রাণ যে সেই সুমধুর ধ্বনি শ্রবণে পাগল প্রায়। এক অপ্রকাশিত রুদ্ধ বেদনায় হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু বদ্ধ আমি কেমন করিয়া প্রাণের শীতলতা সম্পাদনে তৎপর হইব? প্রাণ ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছে কিন্তু হে প্রাণ! তুমি রোরুদ্যমান হইলেও তোমার কঠিন বাঁধন ভক্তি অশ্রুধারা বিধৌত করিতে পারিবে কি? বন-বিহারীর সন্ধানে তোমাকে চিরদিনের জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে—দর্শন এজন্মে হইবে কিনা জানি না। কত জন্ম জন্মান্তর তোমাকে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। তোমার মস্তকের উপর দিয়া অসীম ঘাত প্রতিঘাত, লক্ষ লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত বিপুলভাবে চলিয়া যাইবে। তোমার অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হইবে—কিন্তু তোমাকে থাকিতে হইবে অটল, অচল এবং মূহ্যমান হইয়া। হৃদয়কে ভক্তিবারি বিধৌত করিতে হইবে। বাঁশী বাজি-

যাছে—হৃদয় তাহা শ্রবণ করিয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছে। অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারময় অট্টহাস্য ভেদ করিয়া ঐ বাঁশী বাজিয়া উঠিল—মূর্চ্ছনার শত শত ঝঞ্ঝাময়ী রাগরাগিণী পূর্ণমাত্রায় আমার পাষাণ হৃদয়ের প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে বিস্তার লাভ করিল। তারপর কি হইল? তারপর ব্যাকুলতাপূর্ণ ভিক্ষা প্রার্থনা—ক্রন্দন—অশ্রু, ইহা ব্যতীত আর কিছুই রহিল না।

হে বংশীধারি! হে চির নূতন প্রেমময়! তুমি তোমার অমিয় মধুর বাঁশরী পুনরায় নিনাদিত করিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র অভাজনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লও। প্রাণের বদ্ধ বেদনা জাল কখন ছিন্ন করিবে তাহা হে প্রিয়তম! একবার বলিয়া দাও।

নির্জ্জনে যমুনা পুলিনে দণ্ডায়মান হইয়া আর কত ব্যথা দিবে, হে বৃন্দাবন বিহারী! তাহা একবার বলিয়া দাও। আমি যে তোমার প্রেম-ভিখারী। তুমি তো দেখিতেছ—তোমার কৃপাকণা-লুব্ধ এই অধম দিবানিশি তোমার জন্য নীরবে মৌন হৃদয়ের অশ্রুকণা লইয়া কাতর ভাবে দিন যাপন করিতেছে। এই অশ্রুজল ব্যর্থ নহে—দয়াময় তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া তোমার দাসকে চিরবাধিত কর। হৃদয়ের কলুষ পঙ্কিল প্রবাহ দূরীভূত কর। চিত্ত আমার সম্পূর্ণরূপে নিরোগ কর।

শ্রীশ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটী গান

আজু মধু চাঁদনী চিত-উনমাদনী
কাঁহা সো নন্দকিশোর?
মলয় পরশনে মরম বঁধুসঙ্গে
মিলন-পিয়াসী চিত মোর॥
কুসুম-সুগন্ধ উলসিত অন্তর,
পাপিয়া পিউ পিউ গাহে নিরন্তর,

কোয়েলা মুহু মুহু বোলই কুহু কুহু
নিরখি চান্দমুখ মুগধ চকোর।—
কাঁহা সো নন্দ কিশোর ?
যমুনা চান্দ ছবি ধরই হিয়াপর
কতই রঙ্গে বিভোর।
বরজ ভরিসব মহা মহোৎসব
নাহি আনন্দক ওর।
মঝু-চিত চাতকী শ্যাম-জলদহারা
আপনা বিসোঙরি হওল বাউরী পারা,
পেখবিন্দু ইহ সব নিরখি শূনময়,—
(ঝরে) ঝর ঝর লোচনলোর।
কাঁহা কাঁহা মঝু মনচোর ?
কাঁহা সো নন্দ কিশোর ?

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা

(ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত)

(৬)

ধনবানের চালচলন নকল করিতে যাইয়া যেমন নির্ধন ব্যক্তি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হয়, অক্ষম দুর্ব্বলব্যক্তির তেজপ্রকাশ যেমন অপমানেরই দ্বার স্বরূপ হয়, নির্গুণের আত্মগরিমাও সেইরূপ যে বিপরীত ফলোৎপাদক হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবে ? সবমানুষই মানুষ, তন্মধ্যে যেসকল গুণ থাকিলে

মানুষ বৈষ্ণব পদবাচ্য হয় তাহার একটীও যদি কাহার দেহে থাকে তবে তাহাতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়া যায়। তাই আমাদের মনে হয় যে, প্রকৃত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-লক্ষণ কখনও কাহারও নিকট বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু এই যে সকল সমাজ হঠাৎ বৈষ্ণব সমাজের বিদ্বেষী হইয়া উঠিল ইহার কারণ কি? যাত্রায় বা থিয়েটারে বৈষ্ণবের সং দিয়া লোক হাসাইবার কারণ কি?

যে বৈষ্ণব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ, যে বৈষ্ণব প্রেমাশ্রুর প্রস্রবণ যে বৈষ্ণব কারুণ্য-রসসংসিক্ত উদ্রিক্ত ভক্তি রসময় বিগ্রহ, সেই বৈষ্ণব কি কখনও হাস্যরসোদ্দীপক সংএর যোগ্য? যাঁর দর্শন মাত্রে পাষণ্ডের হৃদয় গলিয়া যায় তাহাকে লইয়া কি ব্যঙ্গ করা যায়? কাজেই বুঝিতে হইবে যে, বৈষ্ণবের কখনও সং হয় না; সং হয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিলোপকারী ভণ্ড, কপটী, অপদার্থের। পবিত্র বেশের আমরা পক্ষপাতী, তথাপি অসঙ্কোচে এখানে বলিতে বাধ্য যে, বিদ্যাহীন উপদেষ্টা এবং গুণহীন বেশই বহুব্যাপক বৈষ্ণব বিদ্বেষিতার মূলীভূত কারণ।

রাজ-কিঙ্করের দোষ যেমন রাজাকে কলঙ্কিত করে সেইরূপ এই বৈষ্ণব-দ্বেষিতা ক্রমে ক্রমে সীমা ছাড়াইয়া পবিত্রাদপি পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংস্কর্ত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেও সংক্রামিত হইয়া পড়িল। উপাস্য ভগবান নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেও স্পর্শ করিল। শৈব, শাক্ত, গাণপত্যাদি অন্যান্য সমাজের নিকট বৈষ্ণব, বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৈষ্ণবশাস্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শাস্ত্র উপদেষ্টা, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গদেব, বৈষ্ণবউপাস্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিদ্বেষের ও বিদ্রুপের বস্তু হইয়া পড়িল।

যদি শাস্ত্রানভিজ্ঞ তরল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ দ্বারা শুধু এরূপ হইত তাহা হইলে তাহাদেরই অজ্ঞতার বা ভ্রষ্টাচারের উপর দোষ দেওয়া যাইত কিন্তু অনুসন্ধান করিলে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত, অনেক শিক্ষিত, সভ্য, অনেক

পরুকেশ প্রধান ব্যক্তিকেও এই বিদ্বেষের বহ্নিকে প্রদীপ্ত করিতে দেখিয়া সহজেই মনে হয় কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের দোষ-দৃষ্টেই এই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমরা এই বিদ্বেষিতা যে নিতান্ত আধুনিক তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ অনুশীলন দ্বারা দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যতদিন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন ততদিনই তাঁহার প্রভাবে প্রভাহীন স্মার্ত্ত, দার্শনিক, তান্ত্রিক ব্যক্তিগণ তাঁহার বিদ্বেষ করিত, কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর সে বিদ্বেষ ভাব কিছু কমিয়াছিল। প্রথমেই তাহাদের মনে হইল—এমন অগ্নিশিখাতুল্য নবযৌবনা প্রেমবতী ভার্য্যাকে যে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে সে কখনও সাধারণ লোক নহে।

তারপর মনে হইল—পুত্রশোকাতুরা শচীমায়ের কথা, পতি বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আর গৌরহারা নদীয়ার আবালবৃদ্ধ বণিতার বিহ্বলতার কথা। ইহাদের আকুল ক্রন্দনে বিদ্বেষীগণের কঠোর চিত্তও কোমল হইল। তাহারা দেখেন আর ভাবেন—মানুষত অনেকেই আছে কিন্তু যার জন্য এত লোক বিহ্বল হইয়া কাঁদে সে তো সাধারণ মানুষ নহে।

বিদ্বেষীগণের শ্রীগৌরাঙ্গে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলেও তাঁহাতে যে কোন অমানুষী শক্তি আছে ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিলেন। তারপর আরও দেখিলেন যে, যতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ছিলেন ততদিন বিনা কারণেও যেন নবদ্বীপ কি এক আনন্দোৎসবে মাতিয়া থাকিত। নিরন্তর নামকীর্ত্তন, নিরন্তর জনস্রোত, নিরন্তর প্রেমতরঙ্গ যেন কি এক ভূলোক দুর্লভ অপ্রাকৃতভাবে নদীয়া টলমল করিত। কিন্তু নদীয়ায় ত আর সবই আছে কেবল একা গৌর নাই; তবে আজ নদীয়ার এমন দশা কেন? পাখী আছে ডাকেনা, গাছ আছে ফুল ফল নাই, মানুষ আছে যেন জীবন্মৃত,

পশুতেও মাঠে গিয়া মনের আনন্দে তৃণ জল খায় না, সেই সুরধুনী পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে, সেই সন্ধ্যাধুসর পবিত্র কুঞ্জ পড়িয়া আছে কিন্তু তাহারও যেন কিছু শোভা নাই। লোকের প্রাণ যেন আনন্দশূন্য—উৎসাহহীন। পরস্পর দেখা হইলেও কেহ আগের মত আলাপ করে না। গৃহধর্ম্ম সবই আছে কিন্তু কর্ম্মী নাই যেন সব অচল হইয়া গিয়াছে। যে একজনের অভাবে আজ সারা নদীয়ার এমন পরিবর্ত্তন তাহাকে কোন্‌মুখে সাধারণ মানুষ বলি ?

মানুষত কত হইতেছে কত যাইতেছে কিন্তু এমন মানুষ কে কয়টী দেখিয়াছে ? কাজেই এ অভাব বড় সহজ অভাব নয় এই অভাবেই নিন্দুক, পাষণ্ডী, বিদ্বেষী নিজ নিজ স্বভাব ছাড়িয়া হায় হায় করিতে লাগিল।

এদিকে ত নদীয়ার এই অবস্থা, ওদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করিয়া পুরুষোত্তমে গিয়া প্রভাব প্রকাশ করিয়া বসিলেন। তৎকালের প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত সেই ভূলোক-বৃহস্পতি বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুকে পূর্ণতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সপরিবারে তাঁহার দাস হইলেন। উড়িষ্যার রাজ-প্রতিনিধি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা রায় রামানন্দ নিজ পদ গৌরব ছাড়িয়া প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, উড়িষ্যার মহা পরাক্রমশালী স্বাধীন নৃপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার দাস হইলেন। এইভাবে সমস্ত উচ্চপদস্থগণ, ভূম্যাধিকারীগণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, মহাতেজঃপুঞ্জ যোগী সন্ন্যাসী, দণ্ডীগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া প্রভুর চরণাশ্রয়ে শীতল হইতে লাগিলেন। কোন অনুরোধ উপরোধ নাই, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমাগাথায় পূর্ণ করিয়া দিল।

কি আশ্চর্য্য যে, যাহারা দেখিয়াছে তাহারাতো মজিয়াছেই, যাহারা দেখে নাই তাহারাও নাম, গুণ ও করুণার কথা শুনিয়াই প্রেমে মত্ত হইতে লাগিল।

বিদ্বেষীগণ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে লাগিল "এমন মহিমা যাঁর, তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করা যায় কিরূপে? সাক্ষাৎ শ্রীভগবান ভিন্ন এমন সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষণী শক্তি অন্যে সম্ভবে না।"

নবদ্বীপের পূর্ব্ববিদ্বেষীগণের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল। এবং গৌর যে আমাদেরই এই গরবে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি জন্মিল। যে গৌরের রূপ, গুণ, লীলা, নৃত্য, কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া বিদ্বেষীগণ পূর্ব্বে জ্বলিয়া মরিত, তাহাই তাহাদের নিকট কত মিষ্ট লাগিতে লাগিল। সকলের প্রাণই আজ গৌড়-গৌরব শ্রীগৌরচন্দ্রকে দেখিতে লালাইত হইল। ইহাও ভগবানের ভগবত্তার একদিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অন্তর্য্যামী শ্রীগৌর ভগবান ইহাদের বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই, কুলিয়ায় আসিয়া সাতদিন থাকিয়া সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই খানেই নদীয়ার সমস্ত বিদ্বেষীসমাজ শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তাস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অপরাধ মুক্ত হইয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপই সকল সমাজের মস্তকস্বরূপ ছিল, কাজেই নবদ্বীপের মস্তক গৌর-পদে অবনত দেখিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ শ্রীগৌর-চরণে সাষ্টাঙ্গ পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও তৎপ্রচারিত মত সার্ব্বভৌমিক মত বলিয়া সর্ব্ব সাম্প্রদায়ের সর্ব্বত্র পরিগৃহিত হইল।

বলাবাহুল্য এই সময় হইতেই গ্রামে গ্রামে সংকীর্ত্তন, আপদুদ্ধারে হরির-লুট, তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন আপদুদ্ধার স্বস্ত্যয়ন ও মোক্ষধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ে পরিগৃহীত হইল। সকল সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত গৃহেই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ত্তমান সময় অনেক বিশৃঙ্খলা হইলেও সন্ধান করিয়া দেখুন শ্রীগৌড় মণ্ডলে স্মার্ত্ত, দার্শনিক, তান্ত্রিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী সকল মতের লোককেই শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে ভক্তিপ্রদর্শন করিতে দেখা যায় এবং মৃতাহে বৈধি ক্রিয়ার পর মোক্ষধর্ম্ম বলিয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন

শ্রীলীলা কীর্ত্তন করা হয়। এখনও ভারতের বহু শাক্তগৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক স্থল আছে যাহার গৃহে যুগল বিগ্রহ নাই, তিনি আধুনিক ভাগ্যবান বলিয়া উপেক্ষিত হয়। যার মৃত্যুতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন না হয় তিনি নিন্দিত হন। শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম ও বৈষ্ণবপ্রথা যে সমাজে অপ্রবর্ত্তিত ও অনাচরিত তাহা সমাজের বহির্ভূত, যথা—শীক্, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি। এই যে সকল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব আচার বলা হইল বলুন দেখি কোন হিন্দু সন্তান তাহা অস্বীকার করিতে সমর্থ?

আবার দেখুন হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা প্রধান অঙ্গ। জাতিভেদ-শূন্য শীক, জৈনাদি ধর্ম্মসমাজ হিন্দুসমাজের বহির্ভূত। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণগণ হীনবর্ণকে একাবছানায় বসিতেও দেন না বা স্পৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণও করেন না। এমন প্রবল জাতিভেদের সমাজেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত বৈষ্ণববেশধারী যেকোন জাতিই হউন নীচ বলিয়া ঘৃণা করিবার কাহারও অধিকার নাই। এই সকল কারণে ও প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে অন্য কোন সম্প্রদায়েই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না এটা পরে নূতন হইয়াছে এই বিদ্বেষের কিছু কিছু কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ববারেও বলা হইয়াছে।

ক্রমশঃ

গৃহী বৈষ্ণব সমস্যা

মানব কখনও গর্ব্বোন্নত ভাবে বুক ফুলাইয়া ও মস্তকোন্নত করিয়া বলিতে পারে না যে, "আমি একজন ধার্ম্মিক অথবা আমি একজন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নৈয়ায়িক ইত্যাদি।" যদিও অন্য বিষয়ে অর্থাৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন ও ন্যায় ইত্যাদিতে অধিকার লাভ করতঃ কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন স্থানে স্ব স্ব প্রতিভার প্রভাব

বিস্তার করনে বটে কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে কেহ কোথাও পূর্ব্বোক্ত ভাবানুযায়ী যশোলাভ করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না। যেহেতু ভগবৎতত্ত্ব অনন্ত, অপার ও অপরিসীম। ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, তাহার বিষয় পাঠ করিয়া অথবা বলিয়া সামান্য মানব যে শেষ করিতে পারিবে না ইহা সকলেরই সহজ বোধগম্য। যদি কোন সময় কোন ভক্তের মনে তিলমাত্র অহঙ্কারের সূত্রপাত হইত অথবা হয়, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতেন অথবা এখনও করেন।

ভগবান ভক্তকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, যেহেতু ভক্তের মন, প্রাণ, দেহ যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত থাকে। ভক্তের নিজ বলিতে তো এ সংসারে কিছুই নাই, কাজে কাজেই ভগবদ্বিষয়ে ভক্তের গর্ব্বিত হইবার আদৌ কোন শক্তি নাই। ভক্ত পাঠক মহাশয়গণ হয়ত বলিতে পারেন যে, ধর্ম্ম বিষয় উপদেশ বা বক্তৃতা না শুনিলে সংসারী লোক কেমন করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে! ধর্ম্ম বিষয় বলাই যদি গর্ব্ব ও অহঙ্কারের বিষয় হয় তবে কলির জীবের গতি কি হইবে? কথাটী যথার্থ। ধর্ম্ম বিষয় উপদেশ দেওয়া বা বক্তৃতা করা যে দোষণীয় তাহা নহে, উপদেশ ও বক্তৃতাই যে গর্ব্ব ও অহঙ্কার মূলক তাহা নহে। অধুনা অনেক অধিকারী মহাশয়গণই আত্মম্ভরিতা ও মাৎসর্য্যের পৃষ্ঠ পোষণ করিয়া থাকেন। পাঠক মহাশয়গণ! আমাকে ক্ষমা করিবেন, চরিত্র পরিস্ফুটন মানসে আমি নিম্নোদ্ধৃত নিন্দা অথবা ব্যাজোক্তি ব্যবহার করিলাম।

আজ আমি মালা তিলক পরিধান করিয়া প্রাতঃস্নান করতঃ সন্ধ্যাহ্নিক কীর্ত্তন ইত্যাদি অষ্টকালীন সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করি সত্য, কিন্তু আমার মন যদি সম্পত্তি বিনামা করিয়া রেহান গৃহিতাকে বঞ্চনা করার উপায়

খুঁজিতে থাকে ও লোকের অসাক্ষাতে উকীল মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে তৎপর হয়, তবে আমার বৈষ্ণবতায় কপটতা আসিল না কি? আমি গর্দ্দভ হইয়া সিংহ চর্ম্ম-পরিধান করিয়া লোক-সমাজে সিংহ হইবরা জন্য লালায়িত হইলাম না কি?

আজ আমায় কেহ বিশ্বাস করে না, আমায় কেহ ডাকেনা, আমাকে সর্ব্বদাই নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে হয়, এমতাবস্থায় আমি কি করি, আমি লোক সমাজে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করি, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন আমার ভাবনাই প্রবল।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ এক পাটোয়ারী বুদ্ধি মস্তিষ্ক জুড়ে বসল। বাঃ বাঃ সব ঠিক! সব ঠিক! গুরু নির্ব্বাচন করা দূরের কথা, নিজে নিজেই দীক্ষালাভ করিলাম। মালা, তিলক, সন্ধ্যা ইত্যাদীর অনুকরণ আরম্ভ করিলাম, একদিন, দুই দিন, তিন দিন, বাস্ সিদ্ধি লাভ করিলাম। এখন সকলেই আমাকে "সাধু" বলে। আর কি চাই! আহার, বিহার পূর্ব্ববৎই রহিল, কিন্তু লোক সমাজে যাতে আমার মাছ,মাংস খাওয়ার কথাটা প্রকাশ না হয় সেদিকে বেশ একটু দৃষ্টিও রহিল। যাহা হউক আমি এখন সাধু; আমার এখন হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক, চক্ষু পাকৃড়াইয়া বক্তৃতা করিবারও বেশ শক্তি আসিল! এখন আমি একজন ধর্ম্মবক্তা। আমি যাহা বলব তাহাই বেদবাণী। এখন সকলেই বুঝিতে পারেন এরূপ ভাবের ধর্ম্মোপার্জ্জন কতদূর ইষ্টজনক। এই যে বাচালতা, এই যে কপটতা এবং এই যে কুভাব ইহাই একমাত্র সর্ব্বনাশের শ্রেষ্ঠ পথ। আমার পুঁজি নাই এক পয়সা অথচ খরচ করিতে চাই এক আনা। আমার পোষিবে কিসে! যাহার যতটুকু জানা আছে, তাহার ততটুকু প্রকাশ করা বিধেয়। বেশী বলিতে গেলে তাহা সত্য হইলেও মিথ্যায় পরিণত হইয়া

যায়। তবে এ কণ্টক ছেদনের কি কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। তাহা কি? উত্তর সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রয়।

"সদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু" যার গুরু যাকে যতটুকু অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন সে ততটুকুরই অধিকারী হইবে।

ধর্ম্মকথা, কৃষ্ণকথা যাঁর কথা সে নিজে না বলিলে অথবা না বলাইলে কাহারও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। ভাবুক পাঠক ভ্রাতৃবৃন্দ। একবার মনে করিয়া দেখুন, ঐযে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী তীরে রসিক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রেমাম্বুধির অতল তলে নিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,

তোমার মুখে ক�ৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন॥

মরি! মরি! স্বয়ং নামী হইয়াও ভক্তের মুখে নাম শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা। তিনি আবার বলিয়াছেন,

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্‌তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥

প্রভু হে! কি আশ্চর্য্য! কি মধুর মহিমা তোমার! সকল তত্ত্বের মূল হইয়া, সকল রসে রসিক হইয়া, রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতত্ত্ব রায় রামানন্দের নিকট শুনিতে এত ব্যস্ত কেন দয়াময়? আবার দেখুন ভাবুক শিরোমণি রসিক চূড়ামণি! রায় রামানন্দের কি মধুর, কি প্রেমময়, অমিয় মাখা কথা!

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যেতুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাঠ।
সাক্ষাৎ তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥

তবে মনুষ্য! কর্ম্ম ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছ! চেষ্টা সকল কাজের জন্যই করা উচিত। কিন্তু সেই চেষ্টা শুধু স্বাধীন চেষ্টা হইলে চলিবে না। সকল সময়ে সকল চেষ্টাই যেন ভক্তি মিশ্রিত স্বাধীন থাকে।

শ্রীহরমোহন দাস্।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত)

(২৫)

চেতনা পাইয়া এবার শ্রীগৌরাঙ্গ এমনই দৌড় দিলেন যে, নিতাইও তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলেন। ভক্তগণ ইহাতে আকুল হইলেন। নিতাই তখন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, "তোমরা কাতর হইও না। প্রভু কখনই আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারিবেন না।" সারা নিশি তাঁহারা সেইস্থানে প্রভুকে চিন্তা করিয়া বসিয়া রহিলেন, আহার নাই, নিদ্রা নাই। ক্রমে রজনী শেষ হইয়া আসিল। দূরে প্রভু স্ত্রীলোকের ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন, ভক্তগণের কর্ণে সে করুণ স্বর ভাসিয়া আসিল। তাঁহারা সে স্বর লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন, আর দেখেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে সোণার অঙ্গে কৌপীন পরিয়া শূন্যগাত্রে বসিয়া বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ক্রন্দন করিতেছেন।

এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণের লাগ পান নাই। তাই প্রভুর এ আকুল ক্রন্দন। ভক্তগণ নিকটে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিতেছেন জীব উদ্ধার ত দূরের কথা, এ দৃশ্য দেখিয়া এখনই যে ত্রিজগৎ প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া যাইবে।

কিছু শান্ত হইয়া প্রভু আবার দৌড়াইতেছেন। বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার যেন কোন সম্বন্ধই নাই। ভক্তগণ যে আসিয়াছেন তাহা টেরও পান নাই। সেই পশ্চিম মুখে ছুটিয়াছেন। নয়ন মুদিয়াই দৌড়াইতেছেন। তাহাতে বেশী দূর যাইতে পারিতেছেন না, পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। আর নিতাই তাড়াতাড়ি বাহু পসারিয়া তাঁহাকে ধরিতেছেন। আবার কখন বা ধরিবার পূর্ব্বেই তিনি পড়িয়া যাইতেছেন। নবনীত কোমল অঙ্গে কত ব্যথা লাগিতেছে, ভক্তগণের চক্ষে তাহা অসহ্য।

এইরূপে তিন দিবস ও তিনি রাত্রি গেল, প্রভু বা ভক্তগণ জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই। চৈতন্যমঙ্গল গীতে আছে, দেবীদ্বয় ও ভক্তগণের আকুল ক্রন্দন প্রেম ফাঁসরূপে প্রভুকে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

"প্রেম ফাঁসে বাঁধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ।
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিল।
অঝোর নয়নে প্রভু কাঁদিতে লাগিল।।" চৈঃ মঃ

এই প্রেম ফাঁসে বদ্ধ হইয়া তাঁহার বৃন্দাবন গমন ত দূরের কথা তিনি ক্রমশঃ শান্তিপুরের অপর পারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। নিকটে রাখালগণ গরু চরাইতেছিল হরি নামের মূর্ত্তি প্রভুর সন্দর্শনে তাহাদের রসনায় আপনা হইতে হরি হরি ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। নিতাইচাঁদ অবাক বিস্ময়ে প্রভুর এই কার্য্য সন্দর্শন করিলেন।

রাখালগণের মুখে হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া প্রভুর হৃদয় শীতল হইল। তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা প্রাচীন পদ—

ও ব্রজের রাখালগণ !
এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখাল ধ্রু ॥
আমি বৃন্দাবন যেতে ছিলাম।
নাম শুনে ধেয়ে এলাম ॥
এই যে আমি মরে ছিলাম।
নাম শুনে প্রাণ পেলাম ॥
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল।
হরি নামে আবার প্রাণ এল ॥”

প্রভু যেমন রাখালগণকে ব্রজের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতাইর সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি পিছন হইতে ইঙ্গিতে তাহাদিগকে শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিয়া দিলেন। তাহারা তাহাই করিল এবং প্রভু শান্তিপুরের পথ ধরিলেন।

নিতাই দেখিলেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি চন্দ্রশেখরকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, আচার্য্য যেন নৌকা লইয়া এ পারের ঘাটে থাকেন তাহার পর যাহা করিবার আমি করিতেছি।

প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থা। তিনি শান্তিপুরের পথে চলিয়াছেন। পথ দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু চিত্ত তাঁহার বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাবনায় পরিপূর্ণ। অবন্তি নগরের বিপ্রের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া এক মনে মুকুন্দ ভজনা করিবেন এই চিন্তাই তাঁহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া রহিয়াছে। একবার বলিলেন, “সাধু বিপ্র! তোমার সঙ্কল্প জীবমাত্রেরই অনুকরণ করা উচিত।”

প্রভুর চিত্তের অবস্থা যখন এইরূপ নিতাই তখন তাঁহার নিকট আগাইয়া

আসিলেন। তাহার পদশব্দ প্রভুর কাণে আসিল। তিনি বুঝিলেনা কোন পথিক; জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃন্দাবন কত দূর?"

নিতাই প্রভুর অবস্থা বুঝিলেন, "বলিতেছেন, "আর অধিক দূর নাই।"

নিতাইর কণ্ঠস্বরে প্রভুর ধ্যান ভাঙ্গিল না। উত্তর শুনলেন মাত্র। যেমন যাইতেছিলেন তেমনই চলিয়াছেন।

নিতাই দেখিলেন প্রভু চিনিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি তাঁহার পথ রোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আমি নিত্যানন্দ।"

প্রভু এতক্ষণে নিতাইকে চিনিলেন। আর তখন দুই ভাইর মিলন হইল। নিতাই তখন যেন হারানিধি পাইলেন। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি তাহা রোধ করিলেন।

প্রভু বিস্মিত ভাবে নিতাইর মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। যেন একটু একটু চিনিতেছেন। বলিতেছেন "যেন শ্রীপাদ?"

নিতাই করযোড়ে বলিতেছেন, "হাঁ প্রভু আমি তোমার নিত্যানন্দ।"

প্রভু বলিলেন, "তুমিত আমার নিত্যানন্দই বটে। আমি ত একাকী বৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তুমি কিরূপে এখানে আসিলে?"

নিতাইর তখন ভয় হইতেছে পাছে প্রভু সম্পূর্ণ বাহ্য পাইয়া তাঁহার ছলনা বুঝিতে পারেন, তাই বলিতেছেন, "চলুন আমরা গল্প করিতে করিতে যাই। আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, এ কথা লোকমুখে শুনিয়া আমি দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিতেছি, এতক্ষণে আপনার নাগাল পাইলাম।

নিতাইর কথা শুনিয়া প্রভুর বড়ই আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, বেশ করিয়াছ, চল আমরা দুইজনে বৃন্দাবনে গিয়া নির্জ্জনে মুকুন্দ ভজনা করিব।"

নিতাই বলিলেন, "প্রভু তাহাই হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া প্রভুকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। নিতাই দুই একটি কথায়

প্রভুর প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। পাছে বেশী কথা বলিলে তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্য হয়।

প্রভুর সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের চিন্তা রহিয়াছে। তিনি কখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্রজে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইব ত?" আবার কখন বলিতেছেন "জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি দিব।"

"নিতাই বলরে কতদূর বৃন্দাবন।
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন॥
কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকরা ক'রে খাব
রাধাকুণ্ডে গড়ি দিব।
(জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)" (প্রাচীন পদ)

প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন আর কতদূর?"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে প্রভুর ধারণা হইয়াছে তিনি বৃন্দাবনের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নিতাইর চিত্তে বিষম ভয় জাগিতেছে। যদি প্রভু একবার তাঁহার ছলনা বুঝিতে পারেন তাহা হইলে বড়ই বিপদ হইবে। স্বেচ্ছাময় প্রভু তখন এমন দৌড় মারিবেন যে, আর তাঁহাকে ধরা যাইবে না।

যাহা হউক সুচতুর নিতাই প্রভুর অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "আমরা ত বৃন্দাবনে এসে পড়েছি ঐ দূরে যে বটবৃক্ষ দেখা যাইতেছে উহাই বংশীবট আর উহার নীচে যে নদী-গর্ভ দেখা যাইতেছে উহাই শ্রীযমুনা।"

প্রভু নিবিষ্ট ভাবে উভয়ই দেখিলেন কিন্তু চিত্ত তাঁর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ভাবনায় বিভোর কাজেই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, নিতাই পথ ভুলাইয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া চলিয়াছেন। দূরে গঙ্গাগর্ভ এবং তাহার উপর একটি বটবৃক্ষ আছে বটে কিন্তু উহার পরপারে শান্তিপুর।

নিতাই বলিলেন "প্রভু একটু দ্রুত চলুন, আজই আমরা শ্রীবৃন্দাবন ধামে পৌঁছিব।"

প্রভুর যেন বৃন্দাবনের কথা শুনিয়া আনন্দে প্রত্যয় হইতেছে না। বলিতেছেন, "তাহিত শ্রীপাদ! এত নিকটে শ্রীবৃন্দাবন? আমার অদৃষ্টে কি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন আছে?"

নিতাইর এ সব কথা ভাল লাগিতেছে না। তিনি প্রভুকে যেন ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে বাঁচেন। বলিতেছেন, "প্রভু, ক্ষুধা তৃষ্ণায় দেহ আমার কাতর, একটু দ্রুত চলুন যমুনায় স্নান করিয়া বংশীবটতলে বিশ্রাম করি।"

প্রভু যেমনি অতি কঠিন তেমনি অতি সরল। তিনি নিতাইর প্রবঞ্চনা বাক্যে সহজে ভুলিলেন, বলিতেছেন, "শ্রীপাদ তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়া যমুনায় অঙ্গ মার্জ্জন করি।" এই বলিয়া তিনি দৌড়াইলেন, নিতাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলেন। দৌড়াইতে যে উভয় প্রভুই খুব পটু, তাহা ভক্তগণ জানেন। তবে নিতাইকে ধরা সহজ।

শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে যমুনা ভ্রমে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। নিতাইর বড় ভয়, যদি অদ্বৈত আসিয়া না পৌঁছাইতে পারেন! শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতের কথা বড়ই মানেন। সাধ্যমত তাঁহার কথা অবহেলা করেন না।

এই সময়, ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। তিনি প্রভুর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভুর সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। তিনি নিতাইর মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! ইনি ত দেখিতেছি অদ্বৈত আচার্য্য, ইনিও এখানে আসিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে?" তখন তিনি একবার ভাল করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, তখন সমস্ত পরিষ্কার হইল। বুঝিলেন নিতাই তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া আসিয়াছেন। অতি দুঃখে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। এখন

এই প্রাণ পাগল প্রাচীন পদটি আস্বাদন করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ, নিতাইচাঁদকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

"নিতাই! এত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। ধ্রু॥
তুমি, জাহ্নবী দেখায়ে বল ঐ দেখা যায় যমুনা॥
তুমি, ভাই হ'য়ে ভাই এই করিলে
(আমায়) ব্রজে যেতে দিলে না।
আমার খেলার সাথি সব গিয়েছে
আমার যাওয়া হল না।
আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হ'লাম,
তারে বুঝি পেলেম না॥

প্রভুর চিত্ত ব্যথিত, তিনি বলিলেন, "আমার বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।" শ্রীঅদ্বৈত সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার বিরহে তোমার ভক্তগণ প্রাণে মরিতেছে, তুমি ভক্তবৎসল তাই কৃপা করিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত আগমন করিয়াছ। বস্তুতঃ শ্রীঅদ্বৈতের নিত্যানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতার অবধি নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্যের কথায় শান্ত হইলেন না। বলিলেন, "শ্রীপাদ মনে করেন আমি তাঁহার হাতের পুতুল, তাই তিনি ইচ্ছামত নাচান।"

নিতাই শুনিয়া অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত তখন প্রভুর হাত দুইটি ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। নিতাই ও অদ্বৈত প্রভুর দুই পার্শ্বে। নিতাইর আবার স্বাভাবিক আনন্দ ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রভুকে ফিরাইয়া আনিয়া নিতাইর আনন্দের অবধি নাই। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল কুবের পণ্ডিত। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া নিত্যানন্দ নাম হয়।

প্রভুকে ফিরাইয়া আনিয়া নিতাইর চিত্ত আনন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া

উঠিতেছে। তাঁহার সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরের দুই পার্শ্বে তাঁহারা দুইজন প্রহরীর ন্যায় বসিয়া। তিনি আর পলাইবেন কোথায়? তাই নৌকায় বসিয়া নিত্যানন্দের আনন্দের অবধি নাই। নিত্যানন্দ তখন আনন্দময় হইয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "ও গো ঠাকুর! বাড়ী নিয়ে যাচ্ছত, কিন্তু পেট ভরে খেতে দেওয়া চাই। জানত আজ চারিদিন পেটে অন্ন নাই। তাহার উপর দৌড়িয়া দৌড়িয়া প্রাণ গিয়াছে। প্রভু সন্ন্যাসী হইয়া ঢোকে ঢোকে প্রেমামৃত পান করিতেছেন উঁহার না হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। আমার ত আর সে অবস্থা নয়! ক্ষুতাশেই আমি মারা পড়িতে বসিয়াছি। এখনও বলিয়া রাখিতেছি যেন পেট ভরিয়া খাইতে পাই।"

শ্রীঅদ্বৈত তখন নিতাইর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ। কোন্দলে একটুও রুচি নাই। তিনি বলিতেছেন, "তুমি যে কাজ করিয়াছ আমি ত কোন ছার, ত্রিভুবনবাসী তোমাকে অন্ন দিবে। বাপরে বাপ! এ কয়েকদিন পশু পাখীও আহার করে নাই।"

বাড়ীতে আনিয়া শ্রীঅদ্বৈত অতি যত্নের সহিত দুই ভাইকে ভোজনে বসাইলেন।

নিতাই ভাইকে হারাইয়া ছিলেন, ভাইকে পাইয়াছেন, এখন আবার সেই ভাইয়ের সহিত একত্রে ভোজন করিতেছেন সুতরাং তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। তিনি আপন মনে খাইতেছেন। যখন আর খাইতে পারেন না তখন শ্রীঅদ্বৈতের সহিত কোন্দল জুড়িয়া দিলেন। বলিতেছেন, "তখনই ত বলিয়াছিলাম, পেট ভরিয়া অন্ন দিতে হইবে, তা পেট ভরিল না এখন কি করি।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি জানি তোমার সন্ন্যাস করা সমস্তই ভণ্ডামি। সন্ন্যাসী মানুষ ফল মূল খাইয়া অল্লাহারে থাকিবে তা নয়

রাশিকৃত অন্ন খাইবে, আমরা এত অন্ন পাবই বা কোথায় ? সন্ন্যাসীর অল্পাহারই ভাল, এখন উঠে পড় আর লোভ করিও না।”

তখন নিতাই “এই নে তোর অন্ন নে” এই বলিয়া এক মুঠা ভাত লইয়া আচার্য্যের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। আচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন না। এই বলিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন যে, “অবধুতের ঝুটা আমার গায়ে লাগিল ! আজ আমি পবিত্র হইলাম।”

নিতাই আবার বলিতেছেন “কি তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদকে ঝুটা বল ? ইহাতে তোমার অপরাধ হইল। আমার মত এক শত সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইলে তোমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন “তোমাকে খাওয়াইয়া আমার কুলধর্ম্ম সমস্ত গেল আবার সন্ন্যাসী খাওয়ান, আমা হ’তে তা হবে না।” এইরূপে কিয়ৎক্ষণ দুই প্রভুর রসকোন্দল হইল।

একটু পরে প্রভু কীর্ত্তন করিতে উঠিলেন। সেই উদ্দণ্ড নৃত্য আর মুখে হরি হরি ধ্বনি। নিতাই সাথে সাথে থাকিয়া তাঁহাকে আগলাইয়া বেড়াইতেছেন পাছে তিনি আছাড় খান। তত্রাচ সব সময়ে তিনি তাঁহাকে রাখিতে পারিতেছেন না। এক একবার বিষম আছাড় খাইতেছেন।

অনেক চেষ্টায় প্রভুকে শান্ত করিয়া শয়ন করান হইল। শ্রীনিত্যানন্দও নিকটে শুইলেন।

দুই ভাই শয়ন করিয়া আছেন। নিতাই বলিতেছেন, “প্রভু ! একটা কথা বলিব। তুমি কি নবদ্বীপের কথা ভুলিয়াছ ? মা বেঁচে আছেন কি না জানি না, শ্রীবাস মুরারি প্রভৃতি তোমার ভক্তগণ সম্ভবতঃ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। প্রভু অনুমতি কর, আমি সকলকে এখানে আনয়ন করি।”

শ্রীনিমায়ের তখন নবদ্বীপের কথা মনে পড়িল। তিনি বিষন্ন হইয়া বলিতেছেন "আমার সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ কি তথায় পৌছিয়াছে ?"

নিতাই বলিলেন, "আমি আচার্য্যরত্ন দ্বারা সে সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইয়াছি।"

আচার্য্য রত্ন যে সঙ্গে ছিলেন প্রভু তাহা জানেন না। সুতরাং তিনি তাঁহার নাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তখন নিতাই সন্ন্যাসের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলেন। এবং বলিলেন "প্রভু আজ্ঞা কর আমি নবদ্বীপে গিয়ে সকলকে এখানে আনি।"

প্রভুর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। বুঝিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণে মরিবেন। তখন ভক্তগণকে আনিবার জন্য তিনি নিজ মুখে অনুমতি দিলেন।

নিতাই আবার বলিতেছেন "প্রভু তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপ শুদ্ধ লোক আসিতে চাহিবে। সকলকেই আনিব ত ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন "হ্যাঁ, সকলকেই আনিবে। আমি সকলকার নিকট বিদায় লইয়া যাইব।"

শুনিয়া নিতাই বড়ই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন "যে আজ্ঞা।" নিতাই প্রকারান্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে আনিবার নিমিত্ত অনুমতি চাহিয়া লইলেন। সরল প্রভু প্রথমে নিতাইর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে নিতাইর আনন্দ দেখিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন।

প্রভুর মুখ আঁধার হইয়া গেল। তিনি সন্ন্যাসী তাঁহার আর এক্ষণে স্ত্রীর মুখ দর্শন নিষিদ্ধ। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন শ্রীপাদ, সকলকে আনিবেন—কেবল একজন ছাড়া।"

নিতাই প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিয়া, দুঃখে মাথা হেঁট করিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া নিতাই নবদ্বীপে চলিলেন। তিনি শচীমাকে বলিয়া

আসিয়াছেন, নিমাইকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন, তিনি তাহা পারেন নাই সুতরাং তাঁহার দুঃখের অবধি নাই, এক্ষণে নিতাইর সহিত শচী মার মিলন বর্ণনা মুরারি গুপ্তের ভাষায় শ্রবণ করুন,—

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে, "কোথা আছে আমার নিমাই।"
"না কাঁন্দিহ শচী মাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইল শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাইয়া দিল তোমা লইবারে॥
শুনিয়া নিতাই মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচৈতন্য হ'য়ে ভূমে পড়ে শচীমাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ, "চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদিয়া নিবাসী,
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥

কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গা জলে॥"

নিমাইর শোকে শচীমা আমার যেন পাগলিনী। তিনি মালিনীকে বলিতেছেন—

"হেদে গো মলিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশ হীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখো ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥"

দোলা আসিয়া আঙ্গিনায় রহিয়াছে। শচীমা নিকটে দাঁড়াইয়া তিনি উহাতে চাপিয়া নিমাইর নিকট যাইবেন। এমন সময় অবগুণ্ঠনাবৃত বালা বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া নিতাই বড়ই কাতর হইলেন। তিনি অতি দুঃখে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন "শ্রীমতীকে লইয়া যাইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই।"

শ্রীমতী ফিরিয়া গেলেন। তাবত লোক সে দৃশ্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

নিতাই যে গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া আসিয়া ছিলেন তাহা এই ভাবে সম্পন্ন হইল। তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া অদ্বৈত ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত ভক্তগণের মিলন করিয়া দিলেন।

———o———

হরিদ্রা

চলতি কথায় হরিদ্রাকে হলুদ বলে। আমাদের দেশে হলুদ একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ইহার আদর কম তথাপি অন্যান্য জিনিসের তুলনায় খুবই বেশী বলিতে হইবে। প্রত্যহই ডাল তরকারীতে হলুদ ভিন্ন চলিবার উপায় নাই। একদিন হলুদ না থাকিলে মেয়েরা যেন চক্ষে অন্ধকার দেখে। আজকাল কি জানি কেন অনেক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ (?) হলুদের ব্যবহার অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছেন। কোনরূপ মাঙ্গলিক কার্য্যে হলুদের ব্যবহার সকলের আগে দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র কন্যার বিবাহে গায়ে হলুদের ব্যাপারটা বোধ হয় সকলেই জানেন। পূর্ব্বে অনেকে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার গায়ে হলুদ মাখিতেন। এখনও উৎকল অঞ্চলে হলুদ মাখার ব্যবস্থা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে উপনয়ন বা বিবাহে দেখিতে পাওয়া যায় হলুদ মাখাইয়া বর কন্যাকে স্নান করান হয়। সহরে এখন পাউডারে হলুদের স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের ভাবিবার অবসরও হয় না যে, পাউডারের মধ্যে এমন অনেক বিজাতীয় জিনিস আছে যাহাদ্বারা চর্ম্মের মসৃণতা নষ্ট হইয়া যায়।

রোগের বিজাণু নষ্ট করিতে হলুদ অদ্বিতীয়। তাই আর্য্য ঋষিগণ আহারে, মাঙ্গলিক কার্য্যে, উৎসবে, ঔষধে প্রচুর পরিমাণে হলুদের ব্যবহার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হলুদের নিম্নলিখিত নামগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী। কাঁচা হরিদ্রা ও শুকনা হরিদ্রার গুড়ার ভিন্ন ভিন্ন গুণ। অনেকে কাজের সুবিধার জন্য হলুদ গুড়া করিয়া রাখিয়াদেন এবং রাঁধিবার সময় সেই

গুড়া হলুদ ডাল তরকারীতে দিয়া থাকেন। কিন্তু হলুদ গুড়া করিয়া বেশীদিন রাখিলে ইহার গুণের বিশেষ তারতম্য হয়। এই জন্যই প্রত্যহ বাটিয়া লইয়া ডাল তরকারীতে দেওয়াই উচিৎ। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রোগগুলিতে হলুদ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে।

১। আমলকীর রসের সহিত অথবা মধুর সহিত কাঁচা হরিদ্রা খাইলে সকল প্রকার মেহ রোগেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ইহা একটি বিশেষ পরীক্ষিত মহৌষধ।

২। কাঁচা হরিদ্রা বাটিয়া গায়ে মাখিলে বিস্ফোটক এমন কি বসন্ত রোগ পর্য্যন্ত হয় না। শীতের সময় অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন কাঁচা হলুদ গায়ে মাখিলে খোস পাঁচড়া হয় না। বসন্ত রোগের পর আরোগ্য স্নানে এখনও অনেকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া থাকে।

৩। পারার ঘা বা অন্য যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, নিম-পাতা সিদ্ধ করা জলে দ্বারা বেশ করিয়া ধুইয়া হলুদ চূর্ণ ঘায়ের উপর ছড়াইয়া দিলে ঘা শীঘ্র শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

৪। হলুদ ত একেই উপকারী তারপর অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণে ইহার গুণ আরও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কুষ্ঠ রোগে হলুদ একটি মহা উপকারী জিনিস। কফাত্ত জনিত কুষ্ঠে—ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী ও বচ এই গুলির সহিত হলুদ দিয়া তাহার কষায় পান করিলে উপকার হয়। আবার হলুদ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, সোমরাজ, হরিতকী, ডহর করঞ্চ ও শ্বেত সর্ষপ একত্রে গোমুত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠের উপর প্রলেপ দিলে সদ্য সদ্যই উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। কচি কচি বাসক পত্র এবং হলুদ গোমুত্রে বাটিয়া বার বার প্রলেপ দিলে কুষ্ঠের প্রকোপ প্রসমিত হয়। এই ঔষধটি তিনদিন ব্যবহার করিতে হয়।

৫। হলুদ, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ দিয়া পান করিলে বাতাদি জ্বর ভাল হয়।

৬। প্রবল আমাতিসারে হলুদ, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, যষ্ঠিমধু ও চাকুলের ক্বাথ পানে উপসম হইতে দেখা যায়।

৭। হলুদ, ওল, চিতা, সোহাগার খৈ এইগুলি চূর্ণ করিয়া গুড় মিশাইয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে অর্শ ভাল হয়।

৮। কার্পাসের সুতায় হলুদ ও সিজের আটা পুনঃ পুনঃ মাখাইয়া শুখাইয়া সেই সুতা দ্বারা অর্শের বলি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সহজেই উহা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়।

৯। হলুদ, ত্রিকুট, ডহর করঞ্জার ফল ও টাবা নেবুর শিকড় একত্রে সামান্য জল দিয়া বাটিয়া গুটি প্রস্তুত করিয়া তাহা ছায়ায় শুখাইয়া লইতে হয়। দারুণ বিসূচিকা রোগে ইহার অঞ্জন লইলে উপকার হয়।

১০। সোমরাজের বিচির সহিত হলুদের গুড়া প্রত্যহ প্রাতে খালিপেটে ঠাণ্ডা জল দিয়া খাইলে ক্রিমি ভাল হয়।

১১। কবিরাজেরা বলেন—হলুদের ক্বাথে কল্কে সিদ্ধ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পাণ্ডুরোগের উপকার হয়।

১২। ২ তোলা হলুদের গুড়া ৮ তোলা দধির সহিত প্রাতে সেবন করিলে কামলা রোগ অবশ্যই ভাল হইয়া থাকে।

১৩। রাজযক্ষ্মারোগে ছাগলের দুধের সহিত বাসক পাতার রস ও হলুদের গুড়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে উপকার হয়।

১৪। হলুদ, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুল ও শঠী চূর্ণ করিয়া খাঁটি সরিসার তৈলের সহিত অবলেহন করিলে উৎকট শ্বাসরোগ ভাল হয়। অনেকস্থলে এটী পরীক্ষা করা হইয়াছে।

১৫।—হলুদ, সোহাগা, জয়িত্রী ও একটু তুঁতে ঘোষালতার রসে পেষণ করিয়া চারমাষা পরিমাণ বটিকা করিয়া রাখিবে পরে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে মানুষের প্রস্রাবের সহিত খাওয়াইলে মূর্চ্ছাগত হউক বা যে কোন অবস্থাতেই

থাকুক না কেন সে জীবিত হইয়া উঠিবেই। খুব ভাল রোজার নিকট ইহার গুণাবলী শোনা গিয়াছে।

১৬। শুকনা হলুদ প্রদীপে বা কাঠের আগুনে পোড়াইয়া ভূতাবিষ্ট লোকের নাকের নিকট ধরিলে তাহার জ্ঞান হইবে।

মোটামুটী কয়েকটী গুণের কথা লেখা হইল। ইহা ব্যতীত বহু রোগে হলুদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে শিক্ষিতাভিমানি অনেকে হলুদ ব্যবহারকে অসভ্যতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেও যাঁহারা প্রাচীন আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উপরি লিখিত রোগ সমূহে উপযুক্ত নির্দ্দেশমত হরিদ্রার ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীসোমেশ্বর কবিরাজ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা

রামপ্রসাদ।—(পঞ্চাঙ্ক নাটক) চাতরা (শ্রীরামপুর) শীতলা হোমিও হোম হইতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই নাটকে ভক্তবীর রামপ্রসাদের পুণ্যজীবন অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ভক্তিরসের অজস্র ধারায় গ্রন্থের প্রতি পত্র সিক্ত। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে "রামপ্রসাদ" যেমনই চিত্তাকর্ষী আবার অনাবশ্যক আড়ম্বরের অসদ্ভাবে ইহা তেমনই মনোরম। রামপ্রসাদ, ভজহরি ও পাগলিনীর চরিত্র স্বাভাবিক অথচ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ভাবপ্রবণ, সরস ও বিশুদ্ধ। যে রামপ্রসাদের গানে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মুখরিত গ্রন্থকার দক্ষতার সহিত তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-গুলি চয়ন করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর আদরের ধন, নাট্যকার এই সাধক বীরের চরিত্র সাধারণের উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ

রূপে নাট্যাকারে গ্রথিত করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। থিয়েটার কোম্পানী সমুহের কর্তৃপক্ষগণ যে সকল বাজে ঘৃণিত রুচিবিশিষ্ট নাটকের অভিনয় করিয়া দর্শকগণের ক্ষণিক বাহবা লাভ করেন, তাহাদের যদি এই সুন্দর নাটকখানির প্রতি যথোচিত সমাদর দেখিতে পাই তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

সংবাদ ও মন্তব্য

পূজনীয় শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে দিল্লী গিয়াছিলেন, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামানন্দ বিতরণ করিয়া অন্যান্য দু' একস্থানে ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ৫ই আষাঢ় পানিহাটীতে শ্রীশ্রীদণ্ড মহোৎসবে যোগদান করিয়া ৬ই বৈকালে আমতার সন্নিকট বসন্তপুরে যাইবেন। সেখানকার উৎসবান্তে পাঁতিহালে আসিয়া দুইটি অষ্টপ্রহর করিয়া ১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার আন্দুলের নিকট ঝোড়হাট যষ্ঠীতলা হরিসভায় আসিবেন। এখানকার মহোৎসব শেষ করিয়া ১৫ই রাত্রে কলিকাতায় ফিরিবেন। তারপরই শ্রীশ্রীরথযাত্রায় রওনা হইবার আয়োজন চলিতে থাকিবে। ২০এ কিংবা ২১এ আষাঢ় শ্রীধাম নীলাচলে রওনা হইবেন। শ্রীধাম হইতে ফিরিতে শ্রীশ্রীঝুলন পূর্ণিমার ২।১ দিন পূর্ব্বে। তাহার পরের সংবাদ আগামী মাসে দিবার চেষ্টা করিব।

আগামী শ্রাবণ মাসে ভক্তির বর্ত্তমান ২৭শ বর্ষ পূর্ণ হইবে। ভাদ্র মাস হইতে ভক্তি ২৮শ বর্ষে পদার্পণ করিবেন। ভাদ্র মাস হইতে ভক্তিতে পৃথক পত্রাঙ্কে **প্রেমানন্দ-শিক্ষা** প্রকাশ আরম্ভ হইবে। বলা বাহুল্য ২৮শ বর্ষ হইতে ভক্তির কলেবর এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি করা হইল। গ্রাহকগণের সহানুভূতি পাইলে ভবিষ্যতে আরও কলেবর বৃদ্ধির আশা রহিল।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৭শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

শ্রাবণ
১৩৩৬

অচিন্।

কে তুমি নাম না জানি
উদয় হ'য়ে অন্তরে।
দিলে মোরে পাগল ক'রে
কেমনে রহি শান্তরে ॥
ও বয়ান কুঁদে কোঁদা
বচনে ঝরে সুধা
উপমা পাই না কোথা
কি সুষমাবন্তরে ॥
ঐ আশে নানা দেশে
কত গিরি কন্দরে,
ভ্রমিলাম কত দুঃখে
কত বন প্রান্তরে ;
ঐ অনুপম ভাঁতি
ও মোহনমূরতি
খুঁজে এ মূঢ়মতি
শ্রান্ত অতি পান্থরে ॥
কে তুমি নাম না জানি
উদয় হ'লে অন্তরে।

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষশেষে দু'টো কথা।

পরম মঙ্গলময় শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের কৃপায় ও শ্রীগুরুবর্গের আশীর্ব্বাদে আজ "ভক্তি" দেবীর আর একটী বৎসর পূর্ণ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণের করকমলে উৎসর্গ করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আজ ভক্তির ২৭শ বর্ষ পূর্ণ হইল। আগামী ভাদ্র মাস হইতে ২৮শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। এই আনন্দ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আনন্দ সংবাদ পাঠকগণকে দিয়া রাখি যে, **আগামী ২৮শ বর্ষ হইতে ভক্তির কলেবর এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি করা হইল কিন্তু মুল্য বৃদ্ধি হইল না।**

এই শুভ দিনে আমার ক্ষুদ্র প্রাণে যেমন আনন্দ হইতেছে তেমনই এক অতীত কাহিনী স্মরণে দুঃখও হইতেছে। পাঠকগণ হয়ত বলিবেন এই যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের হেতু কি? ইহার উত্তর এককথায় বলিতে গেলে আমি বলিতে বাধ্য যে, সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও আমার অগ্রজ আচার্য্যপাদের স্মৃতিটুকু যে বজায় রাখিতে পারিয়াছি এইটীই আমার আনন্দের কারণ। আর দুঃখের হেতু এই যে, আমার এত সাধের ভক্তিকে আমি এখনও মনের মত করিয়া ভক্তগণের হাতে দিতে পারিতেছি না। এই না পারার কারণ আমার নিজের অযোগ্যতা ত বটেই, তবে সেই সঙ্গে দারিদ্রতাও যোগ দিয়াছে। ভক্তির প্রাণ ভক্ত পাঠকগণ, তাঁহারা যদি এ বিষয় একটু উৎসাহ প্রদান করেন তাহা হইলে আমাকে বোধ হয় আর দুঃখ করিতে হয় না।

যে সকল গ্রাহক ও বন্ধুবর্গ আমাকে গ্রাহক সংগ্রহাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ । আর

যাঁহারা আমাকে পক্ষান্তরে ভক্তিকে উৎসাহদানের পরিবর্ত্তে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অথবা যথাসময় বার্ষিক ভিক্ষা প্রদান না করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের ব্যবহারে প্রকৃতই দুঃখিত। কিন্তু আমার দুঃখে বা আনন্দে কিছু আসে যায় না; যাঁর ভক্তি তিনি কৃপা করিয়া ইহাঁদের সুমতি দিন ইহাই আমার প্রার্থনা।

যেমন স্নেহ-দৃষ্টিতে পাঠকগণ এতদিন ভক্তিকে দেখিয়া আসিতেছেন আগামী বর্ষেও যেন সে কৃপালাভে আমি বঞ্চিত না হই। যে সকল বন্ধুবর্গ গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং নানা প্রকার উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রদান করিয়া ভক্তি প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও যেন একটী বর্ষ পূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ভার বৃদ্ধি পাইল মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ভক্তির প্রচারে লাগিয়া যান।

ভক্তির প্রত্যেক গ্রাহক যদি আমাদিগকে ২।১টী করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলে আমার মনে হয় অচিরেই মনের মত করিয়া দেবীকে সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি। আমি খুবই আশা করি আগামী বর্ষে ভক্তির সহৃদয় পাঠকগণ এ বিষয় একটু মনোযোগী হইবেন।

আর একটি কথা—**ভক্তির বৎসর শ্রাবণ মাসে শেষ হয় এবং ভাদ্র হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। আমরা বরাবর ভাদ্র মাসের ভক্তি ভিঃপি করিয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি। অনেক সময় ভিঃপির টাকা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় পর মাসের পত্রিকা পাঠাইতে বিলম্ব হয়। সেই কারণে গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা তাঁহাদের**

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা এই শ্রাবণ মাসের পত্রিকা পাইয়াই যেন মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেন। অবশ্য মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে ১॥৵০ আনাতে হইবে, আর ভিঃপিতে ১৸৴০ আনা লাগে। অধিকন্তু অনেক অসুবিধাও আছে।

তারপর যাঁহারা ২।৩ মাস পূর্ব্বেও গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহারাও স্মরণ রাখিবেন যে, এই শ্রাবণ মাসেই তাঁহাদের দেয় চাঁদা পরিশোধ হইল। কারণ ২।১ মাস পূর্ব্বে গ্রাহক হইলেও তাঁহারা ভাদ্র হইতেই পত্রিকা পাইয়াছেন। তাঁহারাও যাহাতে আমরা ১লা ভাদ্রের মধ্যে বার্ষিক মূল্য পাই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্যথায় আমরা ৩রা ভাদ্র হইতে সকলকেই ভিঃপি করিব ফেরৎ দিয়া ভক্তিভাণ্ডারের ক্ষতি করিবেন না ইহাই প্রার্থনা।

যাহাতে আগামী বর্ষের ভক্তিকে বর্দ্ধিত কলেবরে আপনাদের শ্রীকরে প্রদান করিতে পারি তাহার জন্য যাঁহার যেমন সামর্থ তদনুরূপ কৃপা প্রদর্শন করিলেই কৃতার্থ হইব। আপনাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম। জয় জয় গৌর হরি।

দীনহীন—সম্পাদক।

ব্রজবালার কৃষ্ণসাধন

(পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত)

(নীলাচলে ব্রজমাধুরী হইতে)

হেমন্ত কাল। গম্ভীরা মন্দির নীরব। ভক্তগণের অবিরাম প্রবাহ থামিয়া গিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন মহাপ্রভু এখন নির্জ্জন

স্থানে থাকিতে চাহেন। অন্তরঙ্গ দুই চারিটী ভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও সহিত তিনি অধিকক্ষণ কথা বলেন না—দিবা-নিশি কেবলই ব্রজ-লীলার অনুধ্যান—ব্রজ-রস আস্বাদন। ব্রজ-ভাব-নিমগ্ন মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ভাবে ভাবে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। পুণ্য-পবিত্রতা ও প্রেম-ভক্তির সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি-সদৃশ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনই এখন সর্ব্ব সাধনার সার বলিয়া মনে করেন। গম্ভীরা মন্দির দর্শন করিলে মনে হয় যেন এই মর জগতে অনন্ত মাধুরীময় গোলোক মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে—নরলোকে এমন আনন্দ-বৃন্দাবন-মাধুরী অতিশয় অসম্ভব—স্বপ্নেরও অগোচর। বদরিকা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, অযোধ্যা, অবন্তী—এমন কি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা রঙ্গস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের অধিবাসী ভক্তও গম্ভীরা মন্দিরের এই নব শ্রী দেখিয়া বিস্মিত হন—তাঁহাদের মনে হয় প্রেমের এমন প্রাণময় জাগ্রত মহাতীর্থ আর যেন কখনও তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে রক্ত-মাংসময় নরদেহ বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় সাক্ষাৎ ঘনীভূত প্রেমানন্দ রস বিগ্রহ গম্ভীরা-মন্দিরে জীবের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন—কেমন সৌম্য শান্ত সুন্দর সমুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে একদিন সায়াহ্নে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালার পরে স্বরূপ ও রামানন্দ গম্ভীরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রেমমূর্ত্তির শ্রীচরণে প্রণত হইলেন, মহাপ্রভু প্রেম-হর্ষভাবে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন—"আমি এই মাত্র তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। অন্ধ সহসা নয়নযুগল পাইলে তাহার যেমন আনন্দ—তোমাদিগকে দেখিলেও আমার সেইরূপ আনন্দ হয় বাস্তবিকই তোমরা *আমার অন্ধের নয়ন।*"

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—"যিনি দিবানিশি নয়ন মুদিয়া থাকিতেই ভালবাসেন—তিনি যে নয়নের আদর করেন ইহা কিরূপে বুঝিব?"

রায় রামানন্দ স্বরূপের কথায় যোগ দিয়া বলিলেন—"প্রভু এখন অধিকাংশ সময়েই ভাবাবেশে বিভোর থাকেন—আমরা নিকটে থাকিলে সে অনুভব ও আস্বাদনের বাধা হয় বলিয়া প্রাণের আবেগে শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াও আড়ালে অপেক্ষা করি।"

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ইহা তোমাদের অন্যায়, আমাকে যদি তোমরা আপন বলিয়া মনে করিতে তবে এরূপ ভাবিবার অবকাশ হইত না। আমি সন্ন্যাসী, আমার কেহ নাই—তোমরাও যদি আমাকে এইরূপ পর বলিয়া ভাব, তবে আর কে খবর লইবে? আমি যখন যে ভাবেই থাকি, তোমাদের কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই।"

মধুময় ভগবান্ এমন মধুরভাবে এই কয়েকটী কথা বলিলেন যে, শুনিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায় যেন একেবারে গলিয়া গেলেন। রামরায় বলিলেন, "দয়াময় এ দীনের প্রতি তোমার এত দয়া!"

মহাপ্রভু রামরায়ের কথায় বাধাদিয়া বলিলেন—"রামরায়! আপন জনের মুখে শিষ্টাচারের কথা শুনিয়া কেহ কখনও তৃপ্তি পায় না। এখন ওসব কথা ছাড়। আজ সকাল থেকে মনে হইতেছে—তোমাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শুনি। সুখময় হেমন্ত ঋতু আসিয়াছে—আর রাসের কথা ঘন ঘন মনে হইতেছে।"

প্রভুর মুখে 'হেমন্ত' শব্দ শুনিয়াই স্বরূপ শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন:—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ-কুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চন-ব্রতম্॥"

শ্লোক শুনামাত্রই মহাপ্রভু সতৃষ্ণভাবে স্বরূপের মুখপানে কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আগ্রহসহকারে বলিলেন—"তারপর, স্বরূপ?"

স্বরূপ বলিলেন—"তারপর যা বলিবার তাই!"

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহা যোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

মহাপ্রভু হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন "একটু থাম—একটু বুঝিতে দাও। হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে নন্দব্রজ কুমারিকাগণ হবিষ্য ভোজন করিয়া কাত্যায়নী অর্চনা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রামরায়! নন্দব্রজ-কুমারীদের সাধন দেখ, হেমন্তকালে ব্রজধামে অত্যন্ত শীত। কুমারীরা শীতের ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া—রবির উদয় না হইতেই কালিন্দীজলে প্রত্যহ স্নান করিতেন, হবিষ্য ভোজন করিতেন। কুমারীরা এই কঠোর ব্রত করিতেন—কেন করিতেন—তাহা তাঁহাদের প্রার্থনাতেই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের প্রার্থনা এই ;—"মহামায়া মহাশক্তি কাত্যায়নী—ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটিবে ইহা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি না, কিন্তু তুমি মা মহাযোগিনী—দুর্ঘট ঘটনে সমর্থা, তোমার নিকটে আমাদের প্রার্থনা, যেন আমরা ব্রজেন্দ্রসুতকে পতিরূপে প্রাপ্ত হই। তুমি অপরাপর শক্তিসমূহের মধ্যে সর্ব্বোপরি, দেবি কৃপা করিও, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও।"

শ্রীকৃষ্ণানুরক্তা কুসুম কোমলা গোপকুমারীগণ একমাসকাল কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতেন।

মহাপ্রভু। ভাল, তারপরে কি হইল স্বরূপ?

স্বরূপ। ইহারা প্রত্যূষে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণের নাম গাইতে গাইতে কালিন্দীস্নানে গমন করিতেন। একদিন ঘটনা বড়ই বিপরীত হইল। সে ঘটনায় সরলা গোপবালারা বড়ই বিপদে পড়িলেন।

শ্রীপাদ স্বরূপের কথা শেষ হইতে না হইতেই রসময় রামরায় মুখে হাতদিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বসন হরণ! কি লজ্জা!" রামরায়ের নয়নপ্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখের হাসি মিলাইয়া গেল—কিন্তু নয়নের

হাসি লুকাইল না। মহাপ্রভু ধীর গম্ভীর ; প্রথমতঃ কোন কথাই বলিলেন না। চিত্ত নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত। স্বরূপ বলিলেন, "সেই বিপরীত ঘটনা বলিতে হইবে কি ?"

মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন বলিবেনা স্বরূপ ?"

স্বরূপ বলিতে লাগিলেন :—ব্রজবালারা প্রতিদিন যেমন তীরে বস্ত্র রাখিয়া পুণ্যসলিলা কালিন্দীতে স্নান করেন, সেদিনও সেইরূপ কালিন্দী-সলিলে অবগাহন করিলেন। কৃষ্ণনাম তাঁহাদের মুখে লাগিয়াই আছে।

মহাপ্রভু স্বরূপের কথায় বাধাদিয়া বলিলেন, "স্বরূপ, কুমারীদিগের অনুরাগ দেখ, কুমারীহৃদয়ে যে অনুরাগ আমি উহার কণা পাইলেও কৃতার্থ হইতাম। শয়নে স্বপনে কেবলই কৃষ্ণ ভাবনা, স্নানে ভোজনে মুখে ঐ কৃষ্ণনাম। এমন অনুরাগ না হইলে কি কৃষ্ণ মিলে ? বল তারপর কি হইল।"

স্বরূপ।—তারপরে ব্রজবালারা তীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বসন নাই। এতগুলি বসন কোথায় গেল, বাতাস নাই যে উড়িয়া যাইবে ? এ ঘাটে কেহ কখনও চোর দেখে নাই—তবে এ বসন চুরি করিল কে ? সম্মুখে নীপতরু, চাহিয়া দেখেন নীপ শাখায় চিত্র বিচিত্র বসনগুলি ধ্বজার ন্যায় ঝুলিতেছে, আর তাঁহাদের ঘরের মাখন-চোর তাঁহাদের সেই চিত্তচোর নীপশাখায় বসিয়া পরিহাসের হাসি হাসিতেছেন। আর বুঝিবার বিলম্ব রহিল না, বসন চুরি ইহারই কার্য্য। ব্রজবালারা অপ্রস্তুত হইলেন। অপ্রস্তুত হইবারই কথা। করযোড়ে বসন চাহিলেন—কিন্তু সে কথা শোনে কে ? বসনচোর বড় সহজ ছেলে নয়। রসিকশেখর নীপতরুর শাখায় বসিয়া হুকুম করিলেন, "যদি বসন পাইতে চাও, হেথায় এস। তোমরা ব্রতচারিণী আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই—এখনও মিথ্যা বলিব না। বসন নিতে হয় এখানে এস,

আমি বসন দিব। বসন থাকিতে কেনই বা এই দারুণ শীতে ক্লেশ পাইতেছ ?"

এই বলিয়া রসরাজ নন্দদুলাল নীরব হইলেন, যেন অতি ভালমানুষ— কিছু জানেন না—পরম সাধু !

রামরায়।—"শুধু পরম সাধু—একবারেই পরমসাধু শিরোমণি ! তাহা না হইলে কি এত প্রত্যুষে এই বসনচুরি ! শ্রীপাদ, তার পর কি হইল, বেশী কিছু বলিব না, পাছে প্রভু কি মনে করিবেন ?"

মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"এই হুকুমের পরে ব্রজবালারা কি করিলেন স্বরূপ ?

স্বরূপ। আজ্ঞে উহারা কুমারী হইলেও রসময়ী। বসনচোরের কার্য্যে ও কথায় উঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের পাথার উথলিয়া উঠিল, লজ্জিত ভাবে একে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু কালিন্দীর শীতল সলিলে আকণ্ঠ মগ্না ব্রজবালাদের অঙ্গযষ্টি শীতে থরহরি কাঁপিতে লাগিল। তাঁহারা বিনীতভাবে বলিলেন—"শ্যামসুন্দর ! যদি আমাদের বসন দাও, আমরা তোমার দাসী হইয়া তোমার আদেশ পালন করিব, আর যদি না দাও তবে তোমার এই অপরাধের কথা রাজাকে জানাইব।

রামরায়। রাজার ভয় ! সরলা গোপবালাদের ভয় প্রদর্শনের কথা শুনিয়াও হাসি পায়। যাহার এত দুঃসাহস সে কি কখনো কাহারও ভয় করে ? ইহাতে বসন চোর কি উত্তর করলেন ?

স্বরূপ। তাহার উত্তর অতি স্পষ্ট। যদি আমার দাসী হও তবে আমার কথা রাখ, এখানে এসে কাপড় লও। নচেৎ দিব না—রাজার ভয় ? রাজা আমার কি করিবেন ?

মহাপ্রভু। একেবারেই নিরূপায় ! স্বরূপ এইরূপ করিয়াই বুঝি

বহিরঙ্গকে আপন করিয়া লইতে হয় ? শ্রীভগবান বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা থাকিতে কাহাকেও আপন করেন না। ভাল তারপর ?

স্বরূপ। তারপর কুমারীগণ নিরূপায় হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তীরে উঠিলেন। কর দ্বারা কোন প্রকারে লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা লজ্জাসঙ্কোচিত দেহে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। নারীজাতির পক্ষে প্রাণ ত্যাগ অপেক্ষাও লজ্জত্যাগ অধিকতর কঠোর। কিন্তু নিরূপায়।

মহাপ্রভু। বুঝিলাম তারপর ?

স্বরূপ। তারপর ধর্ম্মজ্ঞ শিরোমণি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমরা ব্রতচারিণী, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র জাননা। তোমরা ব্রত লইয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলে অবগাহন করায় দেব-অবহেলন হইয়াছে, সেই পাপ অপনোদনের জন্য আপনাপন মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নত হইয়া প্রণাম কর। তবে বস্ত্র পাইবে।

রাম রায়। অসাধারণ বিড়ম্বনা, এ যে ভারী বিপত্তি।

স্বরূপ। বিপত্তি নয় আ-পত্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি। রায় মহাশয়! মান, লজ্জা ভয় তিন থাকিতে নয়।

রাম রায়। কি উৎকট পরীক্ষা। এত পরীক্ষা করিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় শুদ্ধ করিয়া লন। ব্রজবালারা অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিলেন তো ?

স্বরূপ। না করিয়া উপায় কি ? শ্রীকৃষ্ণচরণে মান লজ্জা ভয় প্রভৃতি নারী ধর্ম্মে একেবারেই তিলাঞ্জলি দিয়া উভয় হাত যোড় করিয়া উহারা আপন আপন মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে লজ্জা বা ভয়ের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। সরলপ্রাণ, ব্রতভঙ্গ হইলে পাছে বা কৃষ্ণ প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন তাঁহাদিগকে বস্ত্র দিলেন।

মহাপ্রভু। গোপীজনবল্লভের লীলারহস্য তাঁহার একান্ত ভক্তগণেরই অনুভবের বিষয়। এসকল ব্যাপার বেদগুহ্য। ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, অধিকারি ভেদেই ধর্ম্মভেদ। বিশুদ্ধ আনন্দ রসের গড়া তনু ব্রজবালাদের অধিকার ও ভজন সৌভাগ্য অন্যত্র অসম্ভব।

রামরায়। রসিক শেখর ব্রজবালাদিগকে বঞ্চনা করিলেন। তাঁহারা তাহা বুঝিলেন না। ব্রজবালাদের ন্যায় অমন সরল মন তো দেখা যায় না।

স্বরূপ। তাতো বটেই। কিন্তু রসরাজ বসন দিবার সময়ে সে কথা নিজেই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের লজ্জা হরণ করিয়া আবার তাহাদিগকে আরও লজ্জিত করার জন্য তিনি বলিলেন। তোমাদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া কেমন ঠকাইয়াছি। এই তোমাদের বুদ্ধি?

রাম রায়। ব্রজবালারা ইহাতে কি কোনও উত্তর করিলেন না?

স্বরূপ। কিছুই না তাঁহারা একটু মৃদু হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন, কৃষ্ণের নিকট অপ্রস্তুত হওয়াও তাঁহাদের আনন্দ। তবে তখন তাঁহাদের নয়নে কিঞ্চিৎ লজ্জার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল তাহাতে তাঁহাদের শ্রীমুখকান্তি আরও মধুর দেখাইতে ছিল।

রামরায়। তাতো হইবেই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যাঁহার জন্য তাঁহাদের এই কঠোর ব্রতাচরণ সে ফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

স্বরূপ। তাহা বুঝিয়াও তাঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন, মনের ভাব এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে স্পষ্ট বাক্য না শুনিয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিবেন না। তাঁহাদের কথা বুঝি এই ছিল—চতুর চূড়ামণি! রসিকরাজ আমরা যাহা করিয়াছি তাহাতে তোমার চরণে অপরাধ হইল কিংবা তোমার প্রীতি সাধন হইল তাহা জানি না। এখন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে কি না তাহাই বল, একবার শুনিয়া ঘরে যাই।

রামরায়। ব্রজবালাদের সঙ্কল্প বুঝিয়া সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবান কি উত্তর করিলেন ?

স্বরূপ। তিনি বলিলেন, তোমাদের সংকল্প অবশ্যই সত্য হইবে।

মহাপ্রভু। স্বরূপ এস্থলে শ্রীভাগবতের দুইটি কথা না বলিলে তোমার এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিবে। উহার একটী কথা এই শ্রীভগবান গোপবালা দিগকে বলিয়াছিলেন যাহাদের বুদ্ধি কেবল আমাতে আবিষ্ট হইয়াছে, যাহাদের অন্য কোন কামনাই নাই তাহাদের কাম সাধারণ কামনয়, এবং তাদৃশকামে কামজনিত কর্ম্মবন্ধনও ঘটে না! কেন না ভ্রষ্ট যবের আর অঙ্কুর হয় না, তাহার উপর সেই ভ্রষ্ট যব যদি ভর্জ্জিত হয় তবে কোনও ক্রমে তাহার আর অঙ্কুরের সম্ভাবনাই থাকে না। ব্রজবালাগণের কামনান্তর রহিত এবং ভাববিশেষ সংস্কৃত ভগবৎ প্রেম সেবারূপ কাম কোনও ক্রমেই কর্ম্মবন্ধনের হেতু নয়। যদিও ব্রজবালাগণ শ্যামসুন্দরের শ্রীমুখে এই উপদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করেন নাই তথাপি পরম কারুণিক শ্রীভগবান এ স্থলে এই উপদেশ প্রকটন করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাঁহারা যে কথার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন স্পষ্টতঃই প্রেমময় তাঁহাদিগকে সে কথাও শুনাইয়া দিয়াছিলেন হে সতী কুমারীগণ! তোমাদের কাত্যায়নী ব্রতসাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন গৃহে যাও আগামী রজনী সমূহে তোমরা আমার সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে।

রামরায় বাস্তবিকই রসিক শেখর পরম করুণ আনন্দলীলারসময় বিগ্রহের এ করুণা নাথাকিলে ভজন সাধন একেবারেই নিষ্ফল হইত। আর ব্রজ বালাদের সাধন একেবারেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ। এই সাধনার মহাফল মহারাসে সম্মিলন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ।

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম,
তাহা কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল
অম্বিকা নগরে যার বাস॥
নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার,
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিলা।
পূরবে সুবল যেন, বশ কৈল রামকানু,
পরতেক এখন রহিলা॥
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই॥
প্রেমে লম্ফঝম্ফ করে, পুলকিত হুহুঙ্কারে,
ক্ষেণেকে রোদন, ক্ষেণে হাস।
তাঁর পদে পদরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥"

ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। "শ্রীশ্রীঅমিয়নিতাই চরিত" প্রসঙ্গে পূর্ব্বে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। পুনশ্চ আমাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে এইস্থানে আলোচনা করিতে হইবে। সুতরাং এইবার আমরা তাঁহার মধুমাখা জীবনী একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া রাখিব।

নিতাইর নিকট সংবাদ পাইয়া শান্তিপুরে ভক্তগণ নিমাইকে দর্শন

করিতে গেলেন। আসিলেন না কেবল গৌরীদাস। নিমাই ভক্তগণকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাই তাঁহার উপর গৌরীদাসের রাগ হইয়াছে। ইহা প্রভুর প্রতি ভক্তের অভিমান। আর প্রেমাভিমানী ভক্তের এ অভিমান বেদস্তুতি হইতেও শ্রীভগবানের নিকট মিষ্ট লাগে।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥" চৈঃ চঃ

এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গৌরীদাসের মনের অবস্থা অন্তর্য্যামী শ্রীগৌর ভগবান অন্তরে বুঝিয়া নিতাইসহ অম্বিকায় আসিয়া উপনীত হইলেন। ("অম্বিকায় উপস্থিত হইয়া প্রভু প্রথমতঃ যে তেঁতুল বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষটী পরবর্ত্তীকালে ক্ষয় হইলে উহার বোয়া বা ঝুরি হইতে আশ্চর্য্য রূপে একটী বৃক্ষ বাহির হইয়াছে।"—শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল *)

* শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট দাদা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ঐতিহাসিক। তাঁহার "দ্বাদশ-গোপাল" অতি উপাদেয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে গোপালগণের চরিত আলোচনা কালে উক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হইব। গত ১৩৩৩ ১০ই পৌষ তারিখে পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলে পরম প্রেমময় শ্রীযুক্ত অমূল্য দাদা তাঁহার "দ্বাদশ গোপাল" ও "বৈষ্ণব-চরিতাভিধান" গ্রন্থ দুই খানি ও কয়েকখানি চিত্রপট উপহার দিয়া এই নগণ্য ব্যক্তিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও উৎসাহ বাণী আমার হৃদয়ে চির জাগরিত থাকিবে। গ্রন্থাগারে তাঁহার বিপুল সংগ্রহ দৃষ্টে যুগপৎ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। (লেখক)

পণ্ডিতের ভাগ্যের অবধি নাই। আরাধ্য দেবতা আজ তাঁহার মধুর ভজনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত। পণ্ডিতের আর অভিমান নাই। তিনি আনন্দে ডগমগ। প্রভু গৌরীদাসকে আলিঙ্গন করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল তাহা প্রাচীন কবির মধুময় ভাষায় শ্রবণ করুন,—

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটী ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িবা গৌরহরি,
তবে জানি পতিত পাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছি যে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ।
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকরি ফুকরি পুনঃ কান্দে।

পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করিলা তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে
ভকত বৎসল তেঁই গায়।"

সন্ন্যাসীর গৃহে থাকিতে নাই। পণ্ডিতকে শান্ত করিবার জন্য প্রভু অন্য উপায় করিলেন। তিনি যে চিরদিন ভক্তের অধীন। শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে বলিলেন,—

"নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্ম্মাণ করিবে॥
অনায়াসে নির্ম্মাণ হইব মূর্ত্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়॥" ভঃ রঃ

নবদ্বীপে যে নিম্ব বৃক্ষমূলে, আঁতুড় ঘরে নিমাই জন্ম গ্রহণ করে সেই বৃক্ষ আনাইয়া গৌরীদাস স্বয়ং শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় নির্ম্মাণ করেন এবং স্বয়ং অচ্যুতানন্দ এই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। (এই বিবরণ অদ্বৈত প্রকাশে আছে।) এই মূর্ত্তিদ্বয়, প্রভু দ্বয়ের মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইয়াছিল।

মহা সমারোহে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রভু, নিতাইকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমূর্ত্তির নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! এই দুই মূর্ত্তি এবং আমরা দুই ভাই, ইহার মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার গৃহে রাখ। আমরা তোমার গৃহে থাকিব।"

"পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঁই খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥
শুনিয়া পণ্ডিত রাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারি জনে ভোজন করিয়া।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া ॥
নানা মতে পরতীত, করি ফিরাইল চিত,
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি,
দোহে গেলা নীলাচল পুরে ॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদে করি আশ,
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস!"

ভক্ত বৎসল গৌর নিতাই দুই ভাই, সর্ব্ব প্রকারে ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত বহু প্রকারে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করেন। আর দুই গৌর ও দুই নিতাই পণ্ডিতের নিকট বসিয়া ভোজন করিলেন। তাহার পর এই অভেদ চারি মূর্ত্তির মধ্যে দুই ভাই বিগ্রহ রূপে অম্বিকায় রহিয়া গেলেন এবং অপর দুই মূর্ত্তি নীলাচলে চলিয়া গেলেন।

"সত্য করি দুই ভাই ঘরেতে রহিল।
প্রকাশ হইয়া দুই নীলাচলে গেল ॥"

(সুবল মঙ্গল)

এই উর্দ্ধবাহু নিতাই গৌরাঙ্গের আদি মূর্ত্তি আজিও অম্বিকা নগর আলোকিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। গৌরভক্তগণের কিবা সৌভাগ্য, আজিও তাঁহারা সে মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। এখন পণ্ডিতের পূর্ণানন্দের পরিচয় এই প্রাচীন গীতটি আমরা আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব।

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে॥
তপ্ত হেম অঙ্গকান্তি প্রাতঃ অরুণ অম্বরে।
পাষণ্ড দম্ভ খর্ব্ব হেতু ধর্ম্ম দণ্ড বিচরে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অম্বিকাতে বিহরে,
গৌরীদাস করত আশ সব্বজীব উদ্ধারে॥

এইবার প্রভুদ্বয়ের প্রেমরঙ্গের কথা বলিব। দুই প্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলে, পর দিবস গৌরীদাস সযত্নে রন্ধন করিয়া দুই ভাইকে খাইতে দিলেন কিন্তু বিগ্রহের নিকট ভোগের দ্রব্য যেমন দিয়াছিলেন তেমনি রহিল, তাঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবং ক্রোধাবেগে কহিতেছেন—

বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাও কি কারণে॥
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌনধরি॥" ভঃ রঃ

গৌরীদাসের সঙ্কল্প—যদি প্রভু দ্বয় না খায়েন তবে তিনিও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন।

ইহাতে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট আবার পরাস্ত হইলেন। তখন—

"হাসিয়া প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি ॥
অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
অন্নাদি করহ বহুপ্রকার ব্যঞ্জন ॥
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্ব্বোপরি ॥ ভঃ রঃ

ইহাতে গৌরীদাস বলিলেন,—বেশ! তবে আর,—

"—ঐছে কভু না করিব।
এক শাক সিদ্ধ পক্ক করি ভুঞ্জাইব ॥ ঐ

তখন—

"পণ্ডিতের কথা শুনি দুই প্রভু হাসে।
করয়ে ভোজন কিছু পরম উল্লাসে ॥ ঐ

ভক্তের সহিত ভগবানের এই লোকপাবনী লীলা যুগে যুগে হইতেছে। আর আমরা তাহা আলোচনা করিতে পারিলাম ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৌরীদাস ছিলেন ব্রজের সেই সুবলখসা।

"সুবল গোপাল কৃষ্ণ প্রিয় সুবিদিত।
এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিত ॥
হেন ভাগ্যবান আর নাহি কোনঠাঁই।
অদ্যাবধি যার গৃহে চৈতন্য নিতাই ॥
সর্ব্ব সমর্পণ কৈল প্রভুর সেবায়।
নিত্যানন্দ প্রভুশাখা বসে অম্বিকায় ॥" (বৈষ্ণবাচারদর্পণ)

নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহে গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় যথা,—গৌর গণোদ্দেশদীপিকা, ভক্তমাল, শ্রীচৈতন্য পারিষদ জন্মনির্ণয়, অনন্তসংহিতা, দ্বাদশপাট নির্ণয়, চৈতন্যসঙ্গীতা, বৃন্দাবন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনা,

দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব বন্দনা, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল (জয়ানন্দ), অদ্বৈত প্রকাশ প্রভৃতি।

সুবলমঙ্গল গ্রন্থে এই সুলচন্দ্রের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

কংশারি মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাহার গর্ভেতে ছয় পুত্র উপজিলা॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট।
সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ॥
তাহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পুরে মনো আশ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এই ছয় ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় করেন প্রেম দানে॥*

এই ছয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ও পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। গৌরীদাস অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। পরে তিনি সাধন ভজনের সুবিধার জন্য নির্জ্জন স্থান—গঙ্গাতীরে অম্বিকায় বাস করেন। আমরা দেখিতে পাই পরবর্ত্তী কালে গৌরীদাসকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিমলা দেবী এবং দুই পুত্র বলরাম ও রঘুনাথ।

গৌরীদাস পণ্ডিত, ঘোষাল বংশ, পোশোর সন্তান বাৎস্যগোত্র।

"মহাপ্রভু প্রদত্ত বৈঠা ইহাঁর অপ্রকটের পর ইহাঁর শিষ্য হৃদয় চৈতন্য (ইনি গৌরীদাসের পুত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন) প্রাপ্ত হন। এই

হৃদয়চৈতন্যের শিষ্যই বিখ্যাত শ্যামানন্দপ্রভু। ইহাঁর দ্বারা উড়িষ্যা প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার হয়।"—(গৌরপদতরঙ্গিনী।)

গৌরীদাস পণ্ডিত বা হৃদয় চৈতন্যের বংশ নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহারা গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য-শাখার বংশ।

শ্রীপাটে নিম্নলিখিত শ্রীবিগ্রহগণ পূজিত হইতেছেন। যথা—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীরামসীতা।

আবির্ভাব ১৪০৭ শক। তিরোভাব বৃন্দাবন ধীর সমীরে, ১৪৮১ শকে শ্রাবণ মাস শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। ধীর সমীর কুঞ্জে তিনি শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪৩০ শকে প্রভুর সহিত অম্বিকাতে মিলন। ১৪৩৯ শকে দণ্ডমহোৎসবে পানিহাটীতে উপস্থিত।

জাহ্নবা দেবী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া, তাঁহার খুল্লতাত গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ভঃ রঃ

অতঃপর আমরা এই স্থানে পতিতপাবন শ্রীনিতাই-পারিষদ গৌরীদাসকে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের ভাষায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি,—

তনুরুচিবিজিত হিরণ্যং হরিদয়িতং হরিণিং হরিবদ্ধসনং।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নানন্দিত বান্ধবং বন্দে॥

গান।

(শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত।)

কিবা হ'ল তাতে বল গৌর যদি গেছে,—
দয়ালের গুরু আমার নিত্যানন্দ আছে!
(দয়ালের গুরু নিতাই গৌর রেখে গেছে।)
লোটায়ে নে দেখি ভাই নিতাই পদরজে,—
যাঁর দয়া হ'লে পাবি রাধা কৃষ্ণ ব্রজে।
হয় নাই হবে-না নিতাইর মত গুরু,—
(যাঁর,) প্রেম ধারা বরিষণে শীতল যত মরু।
কেন নিতাই পদতলে যে না করে বাস,—
শচী বলে জেনে শুনে (তার) হ'ল সর্ব্বনাশ!

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা সম্বন্ধে পত্র।

[এবারে বিগত বৈশাখ মাসের ভক্তিতে বঙ্গবাসী পঞ্জিকা হইতে বৈষ্ণব ব্রততালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া একখানি পত্র শ্রীযুক্ত সদানন্দ শর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, আমরা এবিষয় আলোচনার জন্য পত্রখানি ভক্তিতে মুদ্রিত করিলাম, যদি এসম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে জানাইলে আমরা যথাসময় পত্রিকায় প্রকাশ করিব।]

(সম্পাদক)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "ভক্তি" পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়—

আপনার শ্রীপত্রিকার ১৩৩৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় "বৈষ্ণব-ব্রত তালিকা" ও "সম্পাদকীয় মন্তব্য" পাঠ করিয়া জানিলাম প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের লিখিত বঙ্গবাসী পঞ্জিকা হইতে উক্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তালিকায় শ্রীরামনবমী সম্বন্ধে যে "কলিকাতায় পূর্ব্বদিনে" লিখিত হইয়াছে উহাতে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হওয়ায় আমরা একখানি বঙ্গবাসী পঞ্জিকা আনাইয়া উক্ত প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা পাঠে বিশেষ বিস্মিত হইলাম। যদিও ব্রত হইয়া গিয়াছে যিনি যে মত গ্রহণ করিয়া থাকেন তিনি সেই ভাবে ব্রত করিয়াছেন, তথাপি ভবিষ্যতের জন্য আপনার সংশয় অপনোদন মানসে আমার বক্তব্য পাঠাইলাম আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

ভূমিকা যথা—"এবারকার বক্তব্যের প্রথম হইতেছে শ্রীরামনবমী ব্রত। শ্রীরামনবমীব্রত অষ্টমীবিদ্ধা স্থলে বৈষ্ণবের পক্ষে করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, আবার উক্ত ব্রতে দশমীতে পারণের ব্যবস্থা থাকায় বিদ্ধা নবমীতেও ব্রত করিবার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় যথা—

"দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে
বিদ্ধাপি নবমীগ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্" ॥

এই কারণে এবার কলিকাতায় ৬ই বৈশাখ দশমী না থাকায় ৪ঠা বৈশাখ বুধবার শ্রীরামনবমী ব্রত করিতে হইবে।"

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে রামনবমীব্রতের সঙ্কটস্থলে পরদিন যদ্যপি একাদশী ব্রত হয় সেইস্থলে একাদশীব্রতের অনুরোধে বিদ্ধায় ব্রত হইবে? অথবা পরদিন দশমী তিথির অসদ্ভাবেই বিদ্ধা তিথিতে ব্রত হইবে? এবার সর্ব্বমতেই (বঙ্গবাসী পঞ্জিকাতেও) ৭ই বৈশাখ শনিবার একাদশীব্রত বিহিত হইয়াছে বিশেষতঃ উদয়ে দশমী স্থান বিশেষে থাক বা না থাক অরুণোদয় বিদ্ধা যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্য বৈষ্ণবমাত্রেই অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পরদিন শনিবার শ্রীএকাদশী করিবেন, এরূপ স্থলে ৬ই তারিখ শুক্রবার যখন শ্রীরামনবমীর পারণ দিন পাওয়া যাইতেছে তখন কি কারণে বিদ্ধা ব্রত হইবে তাহা বুঝিলাম না। আশঙ্কা হইতেছে শুদ্ধা একাদশী স্থলে।

পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী রামনবমী ব্রত তিথি নির্ণয় প্রসঙ্গে যে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃ শুদ্ধা একাদশী স্থলে একাদশী ব্রতের অনুরোধেই যে বিদ্ধাব্রত হইবে তাহা দেখাইয়াছেন উক্ত টীকা যথা—"নন্থ বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্ব্বত্র বর্জ্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতম্, অত্রাপি তথৈ-চোক্তং নবমীচাষ্টমীবিদ্ধাত্যাজ্যেতি। তত্রচ নবমীক্ষায়সতি তিথিহ্রাস ক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ উপোষণামিতি তদেবাভিব্যঞ্জ্য

লিখতি দশম্যামিতি নিশ্চহাদ্দশম্যামেবেত্যেব কারতঃ। অন্যথোপবাস দ্বয় প্রসঙ্গাদেি দিক্ ॥"

এখানে দেখিতে হইবে কি কারণে গ্রন্থকার বিদ্ধা তিথিতে ব্রত করিতে বলিতেছেন, প্রথম আশঙ্কাই হইল "একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং ?" অর্থাৎ পরদিন শুদ্ধা একাদশী হইলে কি কর্ত্তব্য ? এই আশঙ্কা স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে, যদি পরদিনে শুদ্ধা একাদশী হয় তাহা হইলে কি করা উচিত তাহা ভাবিবার কথা, কিন্তু পরদিন যদি একাদশী তিথি মাত্র হয় এবং ঐ তিথি উপবাসার্হ না হয়, তাহা হইলে সে স্থলে কোন কথাই নাই বিদ্ধাত্যাগ করিয়া পরদিন ব্রত করিবে। শুদ্ধা হইলে করিবে না, তাহার প্রতি হেতু দেখাইলেন "উপবাস দ্বয়ং প্রসঙ্গাৎ" অর্থাৎ উভয় উপবাসের প্রসক্তি হইয়া পড়ে এই জন্য বিদ্ধাতিথিতে উপবাস করিতে বলিতেছি" "ইতিদিক্" এই পদদ্বারা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং "উপোষণং নবম্যাং বৈদশম্যামেব পারণম্" এই কারিকোক্ত দশমীপদ দশমী তিথি পর হইতে পারে না, উহা উপবাসের পূর্ব্বাহ্ন পর জানিতে হইবে। যদি পারণাহে দশমী তিথির অভাবে বিদ্ধা ব্রত গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে টীকায় লিখিত আশঙ্কার আকার ভিন্ন প্রকার হইত যথা—"নবমীক্ষয়েসতি তিথিহ্রাস ক্রমেণ পরদিনে দশম্যাশ্চাভাবে কিং কর্ত্তব্যং—"অর্থাৎ নবমীক্ষয়ে তিথি হ্রাস ক্রমে যদি পরদিন দশমী না থাকে তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য ? এইরূপ হইত এবং উপবাস দ্বয়ের প্রসঙ্গ—হেতুরূপে উক্ত হইত না।

সুতরাং ইহা হইতে স্থির দেখা যাইতেছে, যেখানে পরদিন একাদশীর ব্রতোপবাসের প্রসঙ্গ হইবে, তদ্রূপ স্থলে বিদ্ধা তিথিতে শ্রীরামনবমী-ব্রত করিয়া পরদিন পারণ এবং তৎপর দিন একাদশী-ব্রত।

যেখানে পরদিন শুদ্ধা (অর্থাৎ ব্রতার্হ) একাদশী হইবে না, সেখানে

অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া পরদিন শুদ্ধা নবমী বা নবমীক্ষয়ে দশমীতে ব্রত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

এবৎসর ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ৪ দণ্ডের উপর নবমী পরদিন ৬ই শুক্রবার ১১ পল দশমী (অথবা মতান্তরে উদয়ের পর দশমী না থাকিলেও) তৎপরে একাদশী তিথি ব্রত-যোগ্যা হইতেছেন না, ৭ই শনিবার একাদশীর উপবাস হইতেছে। তখন ৮ঠা বুধবার বিদ্ধা তিথিতে বৈষ্ণবের ব্রত করা আমার বিবেচনায় কোন ক্রমে সঙ্গত বলিয়া মনে না হওয়ায় আমি প্রকাশ করিলাম। শাস্ত্রার্থদর্শী সুধিগণ এ বিষয় বিবেচনা করিবেন।

শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা

কলিকাতা।

শ্রীশ্রীহরিনাম মহামন্ত্রার্থ।

(ব্রজবাসী শ্রীযুক্ত স্বরূপদাস বাবাজী মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত)

একদিন হরিদাস নির্জ্জনে বসিয়া।
মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
হাসে কান্দে নাচে গায় গর্জ্জে হুহুঙ্কার।
আচার্য্য গোসাঞি আসি করে নমস্কার॥
সঙ্কোচ পাইয়া হইল ভাব সংবরণ।
আচার্য্যে প্রণমি তিঁহো অর্পিল আসন॥
বসিয়া আচার্য্য গোসাঞি করে নিবেদন।
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন॥
কলিযুগ অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
চৈতন্য ভজয়ে যেই সেই জীব ধন্য॥

তুমি হও চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছাড়ি কেনে গাও আন॥
অথবা কি অর্থ জানি প্রেমানন্দে ভাস।
সর্ব্বজীবে হরিনাম কেন উপদেশ।
নিবেদয়ে হরিদাস করি কর যোড়ে
তত্ত্ব-তত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে॥
কিংবা দুর্ল্লভ আচরণ পামর শোধিতে।
নিবেদন করি শুন যাহা প্রেরচিতে॥
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য গুঢ় অবতার।
কোটী সমুদ্র গম্ভীর নাম লীলা যাঁর॥
গুঢ় ভাবে করয়ে তেঁহো আপনি যজনে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিলা সর্ব্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কলিযুগ অবতার।
হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম সার॥
মহামন্ত্রে শ্রীচৈতন্যে ভিন্ন কভু নয়।
নাম নামী ভেদ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
হরে—ভানুসুতা যেই কৃষ্ণ প্রিয়া শিরোমণি।
শ্রীচৈতন্য রূপে এবে হরে করি মানি॥
কৃষ্ণ—নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোসাঞি॥
হরে—ব্রজের সর্ব্বস্ব হরি ন'দে অবতার।
এই হেতু চৈতন্যের হরে নাম সার॥
কৃষ্ণ—জীবহৃদি কর্ষিয়া রোপিলা ভক্তিবীজ।
অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম নিজ॥

কৃষ্ণ—কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় অকৃষ্ণ বরণ।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ নিরূপণ॥
কৃষ্ণ—ন্যাসীবেশে আকর্ষিল পাষণ্ডিরগণ।
এই হেতু কৃষ্ণ নাম তাঁহার গণন॥
হরে—স্বমাধুর্য্যে হরে তিঁহো ভক্তগণ প্রাণ।
হরে নাম চৈতন্যের করয়ে বিধান॥
হরে—স্বভক্ত হরিতে হয় আপনি হরণ।
শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহণ॥
হরে—স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরে কলিযুগে সার॥
রাম—দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রমে অবিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম॥
হরে—হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল।
অতএব হরে নাম সর্ব্ব সুমঙ্গল॥
রাম—স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমণ।
অতএব রামনাম করয়ে বহন॥
রাম—আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠে কাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম॥
রাম—কৌশল্যা নন্দন যিনি ত্রেতায় শ্রীরাম।
সার্ব্বভৌমে দেখাইল ধরে রাম নাম॥
হরে—স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তিঁহো অবতার।
অতএব হরে নাম হইল তাঁহার॥
হরে—স্বভাব হরিয়া চিত্ত কূর্ম্মাকৃতি হইল।
অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল॥

হরি নামের গুঢ় অর্থ করিলাম প্রকাশ।
আগম নিগম যার নাহি জানে আশ ॥
আর এক গুঢ় অর্থ আছয়ে ইহার।
শুনহ শ্রীপাদ সর্ব্ব-অর্থ তত্ত্বসার ॥
মহামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম সার।
তিন নাম হ'তে ষোল নামের বিস্তার ॥
হরে—সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৈল চৈতন্য গোসাঞি।
অতএব হরে এবে তাঁর নাম গাই ॥
রাম—শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার।
তেঁই রাম নাম তাঁর বিদিত সংসার ॥
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ।
তেকারণ কৃষ্ণ নাম বুঝ অনুবন্ধ ॥
মতান্তরে ষোল নামে চারি নাম সার।
চারি নাম হ'তে পঞ্চতত্ত্বের প্রচার ॥
কৃষ্ণ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোসাঞি।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই ॥
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।
অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
রাম—বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেমরসপুর ॥
অথবা যথেষ্ঠ করে স্বপ্রেষ্ঠ রমণ।
নিত্যানন্দ রাম তেঁহো গায় ভক্তগণ ॥
রমা শক্তি শ্রীঅনঙ্গ তাঁর অবতার।
অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার ॥

হরে—অদ্বৈত হরিনাদ্বৈত ভক্তিসংশনে।
অতএব হরে নাম তাঁহার আখ্যানে॥
হরিয়া আনিল দোঁহা নদীয়া নগর।
অতএব হরে নাম হইল তোমার॥
হরে—ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে নাম তাঁর ইহা জগতে বিদিত॥
চারি নামে চতুরমূর্ত্তি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
চতুর্ব্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয়॥
এই যুগে চতুর্ব্ব্যূহ এই চারি জন।
এই সব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন॥
এই চারি ঈশতত্ত্ব আরাধ্য যে জানি।
পঞ্চম যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক মানি॥
আরাধনা হয় কৃষ্ণ সুখের কারণ।
আরাধনা যেই করে ভক্তেতেগণন॥
বিশেষ্য বিশেষণে ভক্তের নাম হয়।
কৃষ্ণকে বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয়॥
যেন কৃষ্ণ নন্দসুত দাস তস্য ভৃত্য।
কৃষ্ণদাস কহি কোন ভক্তে রূঢ়ি অর্থ॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভক্ত নাম জান।
বিশেষ্য বিশেষণে ভক্ত করায় জ্ঞান॥
হরে কৃষ্ণ দুই নাম বিশেষ্য লক্ষণ।
হরেরাম দুই নাম তাঁর বিশেষণ॥
হরে ভানুসুতা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
হরে রাম যাহাতে সে ভক্তেতে গণন॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভক্তকে কহয়।
শুদ্ধভক্ত ভিন্ন কারো অনুভব নয়॥
ভগবানের ভক্তযত শ্রীবাস প্রধান।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম সদা করে গান॥
যেই নামে হাসে তাঁরে ভব্য সকলে।
সেই নাম প্রভু তাঁর প্রকাশে কৌশলে॥
পূর্ব্বে চারি ঈশতত্ত্ব করেছি নির্ণয়।
ভক্ততত্ত্ব মিলি এবে পঞ্চতত্ত্ব হয়॥
চারি নামে পঞ্চতত্ত্ব হ'ল নিরূপণ।
শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে বুঝে সেই জন॥
এত শুনি দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন কৈল।
পরস্পর দোঁহে দোঁহা স্তুতি আরম্ভিল॥
আচার্য্য কহয়ে তুমি ভুবন মঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য তত্ত্ববেত্তা তুমি সে সকল॥
হরিদাস কহে প্রভু তুমি তত্ত্বসার।
বেত্তা আমি স্তুতি নহে সেই অনুসার।

——o——

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীপাট পানিহাটীতে দণ্ড মহোৎসব।—এবার ৫ই আষাঢ় বুধবার উৎসবের দিন হওয়ায় মনে হইয়াছিল বোধহয় ভক্তসমাগম কম হইবে। কিন্তু রঙ্গিয়া প্রভুর লীলার ভঙ্গিই স্বতন্ত্র। এত বেশী ভক্ত সমাগম এবার হইয়াছিল যে, উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করা কষ্টকর হইয়াছিল। পূজনীয় শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় মুর্শিদাবাদ হইতে ভোরের গাড়ীতে পানিহাটিতে উপস্থিত হন। তাঁহার—"প্রেমবন্যায় ভাসে আজি পানিহাটী

গ্রাম" এই কীর্ত্তনের পদের সত্যতা সত্য সত্যই সেদিন সর্ব্বসাধারণে উপলব্ধি করিয়াছে। আমরা বহুস্থানের উৎসব দর্শনের সৌভাগ্য পাই কিন্তু পানিহাটীর এই দণ্ডমহোৎসবে যে কি অভাবনীয় আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করে তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। হবেইবা না কেন? স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

* * * রাঘব ভবনে।
নিত্য মম আবির্ভাব শুন ভক্তগনে॥

তারপর উৎসবের কর্ত্তা স্বয়ং প্রেমদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, উৎসবটি দর্শন করিতে আমরা প্রত্যেককে অনুরোধ করি। উৎসবক্ষেত্রে কলিকাতার ভক্তপ্রবর ফণীভুষণ মিত্র মহাশয় ভক্তগণের জন্য প্রসাদি ঘোলের সরবৎ, মিষ্টান্ন, তাম্বুল ও পাখা প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট দাদা মহাশয় সমাগত ভক্তগণের জন্য প্রচুর প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। বেলা ১১টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত বহু ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিলেন। দাদার ভাব দেখিয়া মনে হয় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরটী যেন ভক্তগণের আর দাদা যেন ভক্তগণের আজ্ঞাকারী দাস।

পুনরায় কার্ত্তিক মাসে পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন মহোৎসব ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী হইবে আমরা দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব রহিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতিকাব্য প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহোদয় উৎসবদিনে রাত্রি তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব মধুর কণ্ঠে গৌরগীতি পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ দান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পানিহাটীর প্রসিদ্ধ দুইটী উৎসবেই গ্রামবাসীর তাদৃশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"দীপ রেখে দেয় অন্ধকার আপনার তলে"

* * * *

রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিগত ১৩৩৫ ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা অবসান" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ

করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা গৌর ভক্ত-গণের বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক। সুখের বিষয় শিক্ষিত জনসাধারণ সেন মহা-শয়ের এই অপসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গেই বহু প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ, প্রবর্ত্তক, গৌড়ীয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী, মর্ম্মবাণী (পূর্ব্বে) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রতিবাদ হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় সেন মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের বিস্তৃত প্রতিবাদ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আগামী ভাদ্র সংখ্যায় আমরা উহা প্রকাশের চেষ্টা করিব।

*   *   *   *

বর্ত্তমানে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলে শ্রীধাম নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। আগামী শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুরীতেই থাকিবেন। পরে কটক ও অন্যান্য স্থান ঘুরিয়া শ্রীঝুলন পূর্ণিমার পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিবেন। এবার বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গদাস ও রজনীদাস দাদা মহাশয়েরা আছেন। শ্রীযুক্ত উদ্ধারণ দাদা ও স্বরূপ দাদাও সঙ্গ ছাড়েন নাই, আমরা কয়েক দিনের জন্য শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে এই মহৎসঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়া ছিলাম, সর্ব্বদাই লীলা প্রসঙ্গ। দাদাদের সঙ্গগুণে প্রকৃতই লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয়।

রথযাত্রার আনন্দ বর্ণনা করা যায় না বিশেষতঃ শ্রীপাদ বাবাজী মহা-শয়ের প্রাচীন লীলা স্মরণোপযোগী অনুষ্ঠান সকলের দর্শন করিলে যথার্থই প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। আমরা শ্রীরথ যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী আগমীতে পাঠকগণকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব।

*   *   *   *

বর্ত্তমান সংখ্যা ভক্তি ২৭শ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ছিলেন। ভাদ্র হইতে ২৮শ বর্ষ আরম্ভ। যাঁহার অপরিসীম করুণায় ভক্তি ভক্তগণের আনন্দ দানে নিয়োজিত আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আজ বর্ষশেষে তাঁহার জয় ঘোষণা করিয়া নববর্ষারম্ভের মঙ্গলাচরণ করি। জয় জয় গৌর বিশ্বম্ভর।

২৭শ বর্ষ সমাপ্ত।